সাইটোলজি

সুহিতা গুহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

মাকে

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় সাম্মানিক স্তরে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের সবে সুরু। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত বাংলা বইয়ের খুবই অভাব, বিশেষ ক'রে কোষতত্ত্ব বা সাইটোলজি সম্বন্ধে লিখিত বাংলা বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। সেজন্য এই বিষয়কে যথাসম্ভব সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে এই বইয়ে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক (অনার্স) পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বইটা লেখা হয়েছে।

বাংলা প্রতিশব্দের বেশীর ভাগই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" অনুযায়ী করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচলিত মূল বৈজ্ঞানিক শব্দগুলিও রাখা হয়েছে কারণ ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব শব্দের সাথে পরিচয় থাকলে তাঁরা আন্তর্জাতিক বই ও গবেষণা নিবন্ধগুলি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

এই বইয়ে মূলতঃ কোষতত্ত্ব বা সাইটোলজি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে তবে যেহেতু কোষতত্ত্ব ও জীনতত্ত্ব নিবিড়ভাবে জড়িত সেজন্য বিভিন্ন প্রসঙ্গে জীনতত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে জীন মিউটেশন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে পলিপ্লয়েডি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে সাইটোলজিয় ও জেনেটিক উভয় পদ্ধতিতে গঠিত ক্রোমোসোমের মানচিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া কোষতত্ত্বের নানা বিষয় সহজে বুঝবার জন্য সপ্তম অধ্যায়ে জনন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

এই বই লিখবার সময় বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নিয়েছি; আমি সেইসব বইয়ের লেখকদের কাছে ঋণী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর হীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় বইটার পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত যত্নের সাথে দেখে দিয়েছেন এবং বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বইটার উৎকর্ষ বাড়াতে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। শ্রীঅঞ্জন চক্রবর্ত্তী এই বইয়ের প্রথম দিকের কিছু ছবি যত্নসহকারে এ'কে দিয়েছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই। শ্রীপার্থ সুবীর গুহ বইটা লেখা ও ছাপার সময় নানাভাবে সাহায্য ক'রে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, যারা এ বই প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন তাঁদের

আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে, জেনারেল প্রিন্টার্সকে, যাঁরা এ বই যত্নসহকারে ছেপেছেন তাঁদের জানাই ধন্যবাদ।

সাম্মানিক স্তরে কোষতত্ত্ব বা সাইটোলজির বাংলা বইয়ের অভাব আশা-করি এই বই অন্ততঃ কিছুটা দূর করতে পারবে। বইটা যদি ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকমণ্ডলীর প্রয়োজন মেটায় তবে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

সুহিতা গুহ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

যে ছোট ছোট অংশ দিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ তৈরী সেই কোষ (সেল) সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানই হ'ল সাইটোলজি (গ্রীক শব্দ *cytos*=ফাঁকা স্থান) বা কোষতত্ত্ব। জীবতত্ত্বের এই বিশেষ শাখাটি উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহের সূক্ষ্ম গঠন ভালভাবে দেখবার আগ্রহ থেকেই জন্মলাভ করেছে।

1665 খৃষ্টাব্দে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইংরাজ বিজ্ঞানী Robert Hooke-এর বোতলের ছিপির কোষ বা *cell* আবিষ্কারই সাইটোলজি (*cytology*) বা কোষতত্ত্বের সূচনা করে। তিনি ছিপির সেকশনে (বা ছেদে) মৌচাকের মত অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর দেখতে পান (চিত্র 1)। প্রতিটি ঘর হ'ল প্রাচীর বেষ্টিত একটা ফাঁকা স্থান। তিনি এইসব ঘরকে
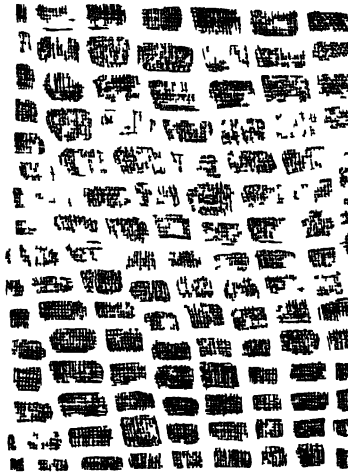
চিত্র—1

ছিপির সেকশন থেকে অঙ্কিত কোষের চিত্র

সেল (ল্যাটিন *cellula*=ছোট ঘর) নাম দেন। সেলকে (*cell*) বাংলায় "কোষ" বলা হয়ে থাকে। Hooke ছিপিতে যে "সেল" দেখেছিলেন তা মৃত ছিল সুতরাং তিনি কেবল কোষ প্রাচীরই দেখতে পেরেছিলেন। ঐ শতাব্দীতেই ইতালীয় বিজ্ঞানী Malpighi এবং ইংরাজ বিজ্ঞানী Grew

স্বাধীনভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের টিস্যু (*tissue* বা কলা) পরীক্ষা করে Hooke-এর গবেষণাকে সমর্থন করেন। তাঁরা দেখেন যে, সব উদ্ভিদের দেহই কোষ দিয়ে তৈরী কিন্তু এইসব বিজ্ঞানীরা কেবল কোষ প্রাচীরের বর্ণনা করেন, কোষের সজীব প্রোটোপ্লাজম সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা ছিল না। 1772 খৃষ্টাব্দে Corti এবং 1781 খৃষ্টাব্দে Fontana কোষের ভিতরে সজীব রসের মত বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু গবেষণার ফলে কোষতত্ত্বের নূতন নূতন তথ্য জানা গিয়েছে এবং এই শতাব্দীকে কোষতত্ত্বের বর্ণনামূলক যুগ বলা হয়। 1802 খৃষ্টাব্দে de Mirble বলেন যে উদ্ভিদ দেহ সূক্ষ্ম কোষ সমষ্টি দিয়ে গঠিত। 1809 খৃষ্টাব্দে Lamarck বললেন যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ কোষ দিয়ে তৈরী। ফরাসী বিজ্ঞানী Dutrochet (1824) এবং পরে Turpin (1826), Meyers (1830) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীতে কোষের উপস্থিতির প্রমাণ পান এবং কোষের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। প্রায় ঐ সময়েই Robert Brown (1831) অর্কিডের পাতার কোষের মাঝখানে গোলাকার বস্তু দেখতে পান ও তিনি এই বস্তুকে নিউক্লীয়াস (*nucleus*) নাম দেন। এর এক বছর পর Dumortier শৈবালে কোষ বিভাগ দেখতে পেয়েছিলেন। Dujardin 1835 খৃষ্টাব্দে নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণীর কোষের ভিতরের সজীব জেলীর মত পদার্থকে "সারকোড" (*sarcode*) নাম দেন।

নিউক্লীয়াসের আবিষ্কারের পরে জার্ম্মান উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানী Schleiden (1838) ও প্রাণী বিজ্ঞানী Schwann (1839) কোষ মতবাদ (*cell theory*) গঠন করেন। এই মতবাদ অনুসারে কোষই হ'ল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব বস্তুর আধার এবং সব সজীব বস্তুই কোষ দিয়ে তৈরী। কোষ মতবাদের সূচনা জীববিজ্ঞানে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। von Mohl-এর গবেষণাও এই মতবাদকে সমর্থন করে। Schleiden ও Schwann-এর মতে কোষ হ'ল দেহ গঠনের একক। ইট দিয়ে যেমন অট্টালিকা তৈরী হয় ঠিক তেমনি অসংখ্য কোষ দিয়ে জীবদেহ গঠিত। বিভিন্ন রকমের কোষের ভিন্ন ভিন্ন কাজের ফলে বহুকোষী জীবদেহের নানা কাজ সাধিত হয়। অনেক ছোট ছোট জীবই এককোষী এবং এই সব জীবদেহের সাথে বহুকোষী জীবের কোষের যথেষ্ট সাদৃশ্য থেকে Schleiden ও Schwann সিদ্ধান্ত করলেন যে বিবর্তনের কোন পর্যায়ে এককোষী জীব দলবদ্ধভাবে বাস করেছিল অর্থাৎ তারা আলগা কলোনী তৈরী করেছিল। এইভাবে সংযুক্ত থাকতে থাকতে প্রতিটি কোষ পরস্পরের উপর

নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; এর ফলে বহুকোষী উচ্চতর জীবের সৃষ্টি হয়েছে। কোষ মতবাদ দিয়ে সিনোসাইটিক (*coenocytic*) দেহের ব্যাখ্যা করা কঠিন। এই রকমের দেহ বহুনিউক্লীয়াসযুক্ত মধ্যপর্দাবিহীন প্রোটোপ্লাজম দিয়ে তৈরী। কোষ মতবাদের কিছু সমর্থকরা বলেন যে সিনোসাইটিক দেহের প্রতিটি নিউক্লীয়াস ও তার চারিদিকের সাইটোপ্লাজম একটা কোষের সমকক্ষ আবার অন্যান্যদের মতে সম্পূর্ণ সিনোসাইটিক দেহটাই একটা কোষ। কিন্তু এই দুই মতের কোনটাই সম্পূর্ণ ঠিক নয়। 1839 খৃষ্টাব্দে Schleiden বললেন যে নূতন কোষ পুরানো কোষের ভিতরের সাইটোব্লাষ্ট (*cytoblast*) অর্থাৎ নিউক্লীয়াস থেকে তৈরী হয়। প্রথমে তাঁর এই মত সমর্থন লাভ করেছিল কিন্তু 1840 - 1860 খৃষ্টাব্দের মধ্যে von Mohl, Nageli এবং Virchow প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে প্রত্যেক কোষ পুরানো কোষের বিভাগের ফলেই গঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষে প্রোটোপ্লাজমের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। 1846 খৃষ্টাব্দে Hugo von Mohl উদ্ভিদ কোষের ভিতরের চটচটে পদার্থকে প্রোটোপ্লাজম (*Protoplasm*; গ্রীক শব্দ *proto* =প্রথম *plasm*=গঠিত) নাম দেন। 1861 খৃষ্টাব্দে Schultz প্রাণী কোষের সারকোড" ও উদ্ভিদ কোষের "প্রোটোপ্লাজমে"র মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন। Schultz-এর প্রোটোপ্লাজম মতবাদ (*protoplasm doctrine*) অনুসারে সব জীবের প্রোটোপ্লাজম একই রকমের। জীব দেহে প্রোটোপ্লাজমের ভূমিকাই মুখ্য এবং কোষ প্রাচীরের ভূমিকা গৌণ। Schultz প্রোটোপ্লাজমের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও Huxley-ই (1868) প্রথম বলেন যে প্রোটোপ্লাজমই হ'ল জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। Huxley-র গবেষণা প্রোটোপ্লাজম মতবাদকে সমর্থন করে। 1880 খৃষ্টাব্দে Hanstein একটা কোষের নিউক্লীয়াসযুক্ত প্রোটোপ্লাজমকে প্রোটোপ্লাষ্ট (*protoplast*) নামে অভিহিত করেন।

de Bary, Sachs ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে কোষ মতবাদের বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করলেন ও তাঁরা একটা নূতন মতবাদ (*organismal theory*) গঠন করলেন। এই মতবাদ অনুসারে বহুকোষী জীব দেহ অবিচ্ছিন্ন প্রোটোপ্লাজম দিয়ে তৈরী এবং প্রোটোপ্লাজম অসম্পূর্ণভাবে ছোট ছোট অংশ বা কোষে বিভক্ত। কোষই হ'ল বিভিন্ন কাজের কেন্দ্রস্থল। অরগ্যানিসম্যাল (*organismal*) মতবাদ অনুসারে কোষকে জীব দেহের একক (*unit*) বলা হয় না, সম্পূর্ণ জীবটাই একটা একক হিসাবে কাজ করে। এই মত অনুসারে সিনোসাইটিক দেহ হ'ল একটা কোষ।

1835-1839 খৃষ্টাব্দের মধ্যে von Mohl কোষ বিভাগ লক্ষ্য করেন। পরে 1858 খৃষ্টাব্দে Virchow বলেন যে প্রত্যেক কোষই মাতৃকোষের বিভাগের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, আবার সেই মাতৃকোষ তার আগের মাতৃ-কোষের বিভাগের ফলে উৎপন্ন হয়েছে। 1882 খৃষ্টাব্দে Flemming বিস্তারিতভাবে দেহ কোষের বিভাগ বর্ণনা করেন ও এই বিভাগকে মাইটোসিস (*mitosis*) নাম দেন। Waldeyer ক্রোমোসোমের প্রথম বর্ণনা দেন এবং পরে (1888) এর ক্রোমোসোম নামকরণ করেন। 1866 খৃষ্টাব্দে Haeckel প্লাষ্টিড দেখতে পান। 1871 খৃষ্টাব্দে Miescher নিউক্লীন (এখনকার নিউক্লীও প্রোটীন) আবিষ্কার করলেন। পরে Flemming (1879) নিউক্লীয়াসের বর্ণগ্রহণকারী অংশকে ক্রোমাটিন নাম দেন। তিনি ক্রোমোসোমের লম্বালম্বি বিভাগও লক্ষ্য করেছিলেন। Hertwing (1876), Strasburger (1884), Weismann (1885) প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ স্বাধীনভাবে কাজ করে বললেন যে ক্রোমাটিনই হ'ল বংশধারার বাহক। Wilson, Von Beneden, Boveri প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণও এই গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে Weismann বংশধারার "ক্রোমোসোমীয় মতবাদ" (*chromosomal theory*) প্রকাশ করেন। 1884 খৃষ্টাব্দে Von Beneden ও Heusen দেখেন যে ক্রোমোসোম-গুলির লম্বালম্বি অর্ধাংশ কোষ বিভাগের সময় অপত্য কোষে যায়। আশীর দশকে Heitzmann, Klein, Flemming, Butschli, Mayer, de Vries, Benda প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণের গবেষণার ফলে ভ্যাকুওল, প্লাষ্টিড, মাইটোক-ন্ড্রিয়া, গলগি বস্তু ইত্যাদির আচরণ সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা গিয়েছে। 1882 খৃষ্টাব্দে Flemming সেন্ট্রোসোমের উৎপত্তি ও ফার্টিলাইজেশনে এদের ভূমিকার উল্লেখ করেন। 1855 খৃষ্টাব্দে Pringsheim শৈবালের স্ত্রী কোষে শুক্রাণুর প্রবেশ লক্ষ্য করেন। এর কিছুদিন আগে Kölleker (1845) দেখেন যে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু হচ্ছে এককোষী। Butschli (1875) ডিম্বাণুর পরিণতি ও ফার্টিলাইজেশন (নিষেক) নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা করেন। Oscar Hertwig সী আর্চিনের (*Sea urchin*) ফার্টিলাইজেশনের সময় ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর নিউক্লীয়াসের মিলন লক্ষ্য করেন ও বংশধারায় নিউ-ক্লীয়াসের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। Strasburger দেখেন যে উদ্ভিদেও ফার্টি লাইজেশনের সময় দুইটা নিউক্লীয়াসের মিলন হয়, যার একটা মাতা থেকে অন্যটা পিতা থেকে আসে। Weismann বলেন যে দুইটা বংশের মধ্যে জনন কোষ সেতু রচনা করে, সুতরাং জনন কোষের মধ্যেই ঐ জীবের সকল চরিত্রের বাহক কোন বস্তু থাকে। Von Beneden (1887) দেখেন যে ফার্টিলাই-

জেশনের সময় ডিম্বাণু ও শুক্রাণু থেকে সমান সংখ্যক ক্রোমোসোম আসে ও এইসব জনন কোষে পিতা বা মাতার দেহ কোষের আর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। 1894 খৃষ্টাব্দে Strasburger দেখেন যে সপুষ্পক উদ্ভিদে গ্যামেট গঠনের সময় ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস পায়। 1903 খৃষ্টাব্দে Flemming, Von Beneden, Bovari, Montgomery ও Sutton মায়োসিসের (*meiosis*) প্রধান পর্যায়গুলির বর্ণনা করেন। পরীক্ষামূলক কোষতত্ত্বের সূচনা হয় 1887 খৃষ্টাব্দে। ঐ সময় O. Hertwig এবং R. Hertwig ফার্টিলাইজেশন সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। পরীক্ষামূলক কোষতত্ত্বের প্রথমদিকে অর্থাৎ 1887—1890 পর্যন্ত কোষতত্ত্ব পরীক্ষামূলক ভ্রূণতত্ত্বের (*Embryology*) সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে কোষতত্ত্ব এই সময়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়, কোষতত্ত্বীয় গবেষণার বিভিন্ন কলা কৌশলেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। 1870-এ মাইক্রোটোমের (*Microtome*) অবিষ্কার একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন টিসুর পর্যায়ক্রমিক সেকশন কাটা যায়। আরো পরে অণুবীক্ষণযন্ত্র ও মাইক্রোটোমের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ও রঞ্জিতকরণ (*staining*), ফিক্সেশন (*fixation*) প্রভৃতি প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে।

1865 খৃষ্টাব্দে Mendel দীর্ঘ গবেষণার উপর ভিত্তি করে একটা নিবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু তখনকার বিজ্ঞানীরা এর তাৎপর্য বুঝতে পারেন নাই। 1900 খৃষ্টাব্দে de Vries, Tschermak এবং Correns প্রত্যেকে আলাদাভাবে Mendel-এর সূত্র আবিষ্কার করেন। এর ফলে জেনেটিক্স (*Genetics*) বা জীনতত্ত্বের সূচনা হয়। জীনতত্ত্বের সাথে কোষতত্ত্ব নিবিড়ভাবে জড়িত কারণ কোষের ক্রোমোসোমের মধ্যেই বংশধারার নিয়ন্ত্রক জীনগুলি অবস্থিত। সুতরাং জীনতত্ত্বের আইন-কানুন বুঝতে হলে কোষতত্ত্বের জ্ঞান অপরিহার্য। প্রথমদিকে এই দুই বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক এত ভাল করে বোঝা যায় নি, কিন্তু যতই গবেষণা হচ্ছে ও কোষতত্ত্ব ও জীনতত্ত্বের নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে যে জীনতত্ত্ব ও কোষতত্ত্ব হ'ল একই বিজ্ঞানের দুইটা দিক। ক্রোমোসোমের আচরণ ও জীনতত্ত্বীয় গবেষণালব্ধ ফলের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গিয়েছে এবং অধিকাংশ গবেষণায় উভয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এই দুই পদ্ধতির একসাথে ব্যবহারের ফলে সংকর বিজ্ঞান সাইটোজেনেটিক্স (*Cytogenatics*) বা কোষ-জীনতত্ত্বের সূচনা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে ক্রমবিকাশের নানা মতবাদ গড়ে উঠেছে। এই সময় জীববিজ্ঞানী

Weismann তার বংশধারার ও বিবর্তনের মতবাদ প্রকাশ করেন। 1896 খৃষ্টাব্দে Wilson বংশধারায় ক্রোমোসোমের ভূমিকার বর্ণনা করেন। পরে Morgan ও তার অনুগামীরা (1910—1926) Wilson-এর মতের সমর্থনে বিভিন্ন তথ্য পেশ করেন।

বিংশ শতাব্দীতে নূতন যন্ত্রপাতি ও উন্নত কলা-কৌশলের ব্যবহারের ফলে কোষতত্ত্বের অনেক উন্নতি হয়েছে। যেমন ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সজীব কোষ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা দৃশ্যমান আলোক ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশী। মাইক্রো-ম্যানিপুলেটার দিয়ে সজীব কোষের ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছে। চলচ্চিত্রের ক্যামেরা দিয়ে সজীব কোষের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার যেমন কোষ বিভাগ ইত্যাদির আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

এই শতাব্দীতে জীনের প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা গিয়েছে ও ক্রোমোসোমে তাদের সরলরেখায় অবস্থান প্রমাণিত হয়েছে। জীনের স্বজনন, মিউটেশনের ক্ষমতা ও চরিত্র নির্ধারণে জীনের গুরুত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। জেনেটিক পদার্থ হিসাবে ডি· এন· এ-র (ডিঅক্সী-রাইবোজ-নিউক্লীক অ্যাসিড) দাবী প্রামাণিত হয়েছে।

1881 খৃষ্টাব্দে Balbiani-র ড্রসোফিলার অতিকায় স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমের আবিষ্কার কোষতত্ত্বের (সাইটোলজির) গবেষণার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এ ক্রোমোসোমের গুরুত্ব অনেক পরে [illegible] দশকে বোঝা গিয়েছিল। প্রায় এই সময় Muller (1927) ও Stadler (1928) স্বতন্ত্রভাবে রঞ্জন-রশ্মির (*X-ray*) প্রয়োগ করে কৃত্রিম মিউটেশন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অস্বাভাবিক ক্রোমোসোমের উপর গবেষণা করে বংশধারার ক্রোমোসোমের ভূমিকা সম্বন্ধে জানা গিয়েছে ও কোষতত্ত্বের নানা জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে। এই সময়ে পলিপ্লয়েডিও আবিষ্কৃত হয়েছে ও জীবের বিবর্তনে পলিপ্লয়েডির গুরুত্ব বোঝা গিয়েছে।

1953 খৃষ্টাব্দে Watson, Crick এবং Wilkins ডি· এন· এ-র গঠন সঠিকভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হন। ডি· এন· এ· অণুর গঠনের সাহায্যে জীনের স্বজনন, মিউটেশন ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা যায়। পরে প্রোটীন উৎপাদনের ডি এন এ এবং আর এন এ-র গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কোষতত্ত্বের (*cytological*) গবেষণার জন্য আজকাল সংখ্যাতত্ত্বের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতির ব্যবহার করে নানা জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়েছে: জীনের কাজ ও ক্রোমোসোমের আচরণ

সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। এই জন্য কোষতত্ত্বের গবেষণায় রাসায়নবিদ্ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদ্দের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। যেহেতু কোষ ও টিস্যুর অস্বাভাবিক আচরণের ফলেই কোন কোন রোগের উৎপত্তি হয় সেজন্য কোষতত্ত্বের সাথে ভেষজ বিজ্ঞানও জড়িত। ক্রোমোসোমের আকৃতির ও সংখ্যার পার্থক্য কখন কখনও একই গাছের বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ এখানে কোষতত্ত্বের সাথে শরীরতত্ত্ব (*Physiology*) ও বাস্তুসংস্থানের (*Ecology*) যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। নিকট প্রজাতি বা গণের (*Species* বা *Genus*) ক্রোমোসোমের আচরণ পরীক্ষা করে তাদের সম্পর্ক বোঝা যায়। উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ ও এদের পরস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্ন আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্রোমোসোমীয় গবেষণার সাহায্যে মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে। কোষতত্ত্বের সাথে শ্রেণীতত্ত্বের (*Taxonomy*) নিবিড় যোগাযোগ লক্ষ্য করা হয়েছে। কোষতত্ত্বের সাহায্যে ট্যাক্সোনোমীর নানা জটিলভাব মীমাংসা করাকে সাইটো-ট্যাক্সোনোমী (*Cyto-taxonomy*) বলা হয়।

সুতরাং জীবতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যতই দিন যাচ্ছে ততই কোষ-জীনতত্ত্ব (*Cyto-genetics*) অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে জড়িয়ে পড়ছে এবং কোষতত্ত্বের গবেষণার জন্য এখন ঐসব বিজ্ঞানের সহায্য একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)

আমরা খালি চোখে খুব ছোট জিনিস দেখতে পাই না। এইসব ছোট ছোট জিনিস দেখবার জন্য প্রথম বিভিন্ন রকমের আতস কাচ (*magnifying glass*) উদ্ভাবিত হয়েছিল, আরও পরে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র, যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (চিত্র 2A, 2B) এবং আধুনিক কালে ইলেকট্রন
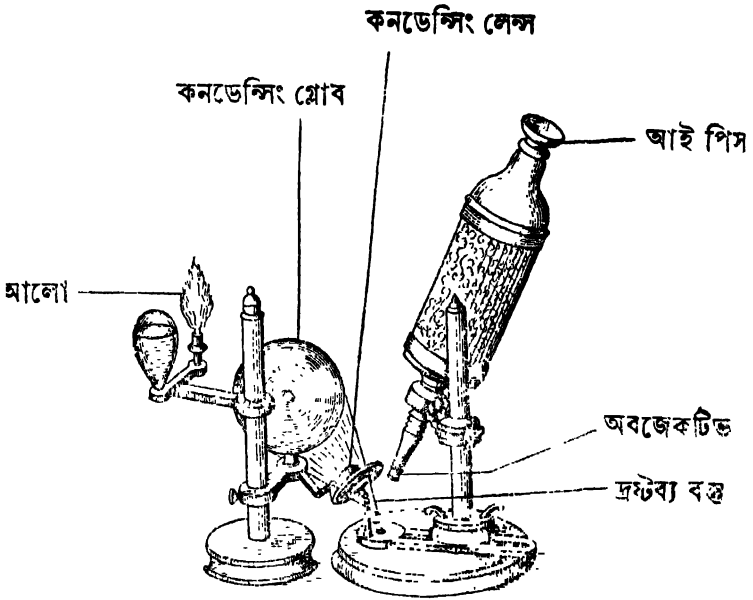
চিত্র—2A
সপ্তদশ শতাব্দীতে Robert Hooke-এর ব্যবহৃত
যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। সাইটোলজির সব পরীক্ষার জন্য যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র অপরিহার্য।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র হ'ল একটা বা কয়েকটা লেন্স (*lens*) দিয়ে তৈরী যন্ত্র যার সাহায্যে আমরা ছোট জিনিসকে বড় করে দেখতে পারি। যৌগিক অণু-

. ক্ষণ যন্ত্র বা *Compound microscope* (চিত্র 2B) দিয়ে কোন বস্তুকে অনেক বড় দেখায়। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দুই সেট লেন্স থাকে—অবজেকটিভ (*objective*) ও আই পিস (*eye piece*)। যে লেন্সটা দ্রষ্টব্য বস্তুর কাছে থাকে তাকে অবজেকটিভ বলে। এই লেন্স দ্রষ্টব্য বস্তুর
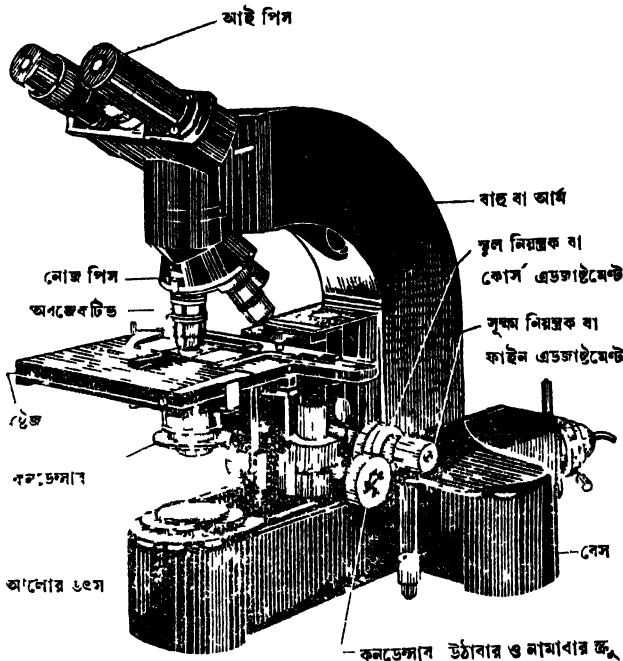
চিত্র—2B
আধুনিক যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

কিছুটা বড় প্রতিবিম্ব (*image*) গঠন করে। অবজেকটিভের ফোকাল দৈর্ঘ্য (*focel length*) কম থাকে ও অ্যাপারচার (*aperture*) ছোট হয়। এক টা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সাধারণতঃ ×10, ×40, 100 ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন অবজেকটিভ থাকে। এর মধ্যে অয়েল ইমারশন লেন্স (*oil immersion lens*) সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন। যে লেন্সটা দিয়ে আমরা দেখি তাকে আই পিস বলে। আই পিস অবজেকটিভ দিয়ে তৈরী কোন বস্তুর প্রতিবিম্বকে আরো বড় করে। আই পিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য বেশী হয় ও অ্যাপারচার বড় হয়। অবজেকটিভের মত আই পিসও বিভিন্ন

(*a*) **ক্রোমাটিক অ্যাবারেশন** (*chromatic aberration*) সাধারণ আলো একটা প্রিজিমের (*prism*) মধ্যে দিয়ে যাবার সময় সাতটা বিভিন্ন বর্ণের অংশে বিভক্ত হয়। এই অংশগুলির প্রত্যেকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (*wave length*) আলাদা। কেবল একটা কাঁচ দিয়ে তৈরী লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় বিভিন্ন বর্ণের আলো ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বেঁকে যায়। বেশী তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লাল আলো সবচেয়ে কম বেঁকে যায় এবং কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নীল আলো বেশী বেঁকে যায় (চিত্র 4)। সেজন্য নীলাভ বেগুনী রশ্মি লেন্সের অক্ষ (*axis*) সবচেয়ে আগে ও লোহিত রশ্মি সবচেয়ে শেষে
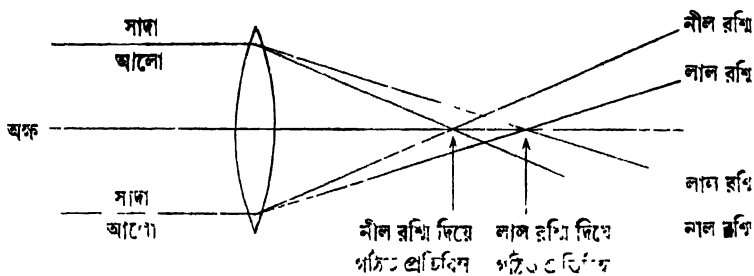
চিত্র –4
ক্রোমাটিক অ্যাবারেশন একটা কাঁচ দিয়ে তৈরী লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় বিভিন্ন বর্ণের আলো ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বেঁকে যায় ও বিভিন্ন স্থানে প্রতিবিম্ব গঠন করে।

পার হয়। এর ফলে কোন বস্তুকে ভাল করে দেখা যায় না এবং ঐ বস্তুর প্রতিবিম্বকে ঘিরে একটা রঙীন বলয়ের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের ত্রুটিকে ক্রোমাটিক অ্যাবারেশন বা বর্ণগত ত্রুটি বলে। একাধিক কাঁচ দিয়ে তৈরী লেন্স ব্যবহার করে এই ত্রুটি দূর করা সম্ভব হয়েছে। 1810 খৃষ্টাব্দে Amici এই ত্রুটি সংশোধন করতে পেরেছিলেন।

(*b*) **স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন** (*spherical aberration*) একটা কাঁচ দিয়ে তৈরী লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলোর রশ্মি যাবার সময় লেন্সের পরিধির দিকের রশ্মি কেন্দ্রের দিকের রশ্মির তুলনায় বেশী বেঁকে যায় (চিত্র 5)। এর ফলে কেন্দ্রের কাছের রশ্মিগুলি পরিধির দিকের রশ্মির তুলনায় কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব দূরে গঠন করে। লেন্সের কোন অংশ দিয়ে আলোর রশ্মিটা যাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে লেন্সের অক্ষের বিভিন্ন

স্থানে প্রতিবিম্ব (*image*) গঠিত হয়। কোন একটা স্থানের প্রতিবিম্বকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ঐ প্রতিবিম্বের চারদিকে একটা আলোকিত বলয় রয়েছে। এইরকম ত্রুটিকে স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন বলে। স্ফেরিক্যাল অ্যাবা-

চিত্র–5
স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন—একটা কাঁচ দিয়ে তৈরী লেন্সের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আলোর রশ্মি বিভিন্ন পরিমাণে বেঁকে যায় ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিবিম্ব গঠন করে।
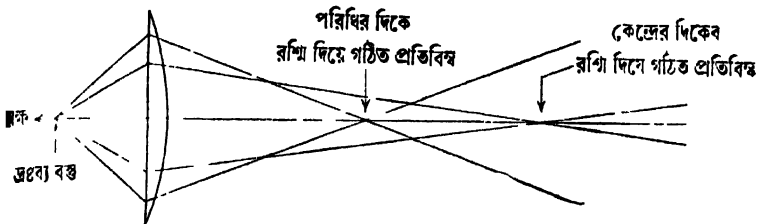
রেশনের ফলে দ্রষ্টব্য বস্তুর কনট্রাস্ট (*contrast*) বা বৈষম্য কমে যায় ও বস্তুটাকে অস্পষ্ট দেখায়। বিভিন্ন ধরনের কাঁচ দিয়ে তৈরী লেন্স ব্যবহার করলে এই ত্রুটি দেখা যায় না।

(*c*) **বিকৃতি** (*distortion*) যখন কোন সোজা বস্তুকে বাঁকা দেখায় তখন এই ত্রুটিকে ডিসটরশন্ বা বিকৃতি বলে। এই ত্রুটি লেন্সের কেন্দ্রে ও পরিধিতে আলাদা আলাদা বিবর্ধনের ক্ষমতার (*magnification*) জন্য হয়।

অবজেকটিভ (*objective*)

অবজেকটিভ দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে যেসব আলোর রশ্মি আসে তা সংগ্রহ করে ও ঐ বস্তুর একটা বড় প্রতিবিম্ব গঠন করে। সাধারণতঃ তিন রকমের অবজেকটিভ দেখতে পাওয়া যায়।

(*a*) **অ্যাক্রোমাটিক লেন্স** (*achromatic lens*) (চিত্র 6a)—এটা সবচেয়ে সস্তা ও সাধারণ লেন্স। কম ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যাক্রোমাটিক অবজেকটিভে ক্রোমাটিক ও স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশনের জন্য সংশোধন থাকে। কিন্তু উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত (*high-power*) অ্যাক্রোমাটিক অবজেকটিভে ঐ ত্রুটি দুইটা দেখা যায়।
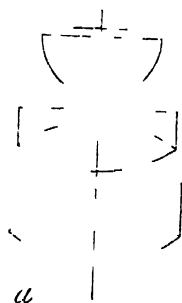
চিত্র 6a
অ্যাক্রোমাটিক লেন্স

(*b*) **সেমি-অ্যাপোক্রোমাটিক** (*semi-apochromatic*) **বা ফ্লুরাইট লেন্স** (*fluorite lens*)

এই ধরনের লেন্স অ্যাক্রোমাটিক লেন্সের চেয়ে ভাল। সেমি-অ্যাপোক্রোমাটিক লেন্স ফ্লুরাইট দিয়ে তৈরী করা হলে একে ফ্লুরাইট লেন্স বলা হয়। কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ায় ফ্লুরাইট দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

(*c*) **অ্যাপোক্রোমাটিক লেন্স** (*apochromatic lens*) (চিত্র 6b) এই লেন্স ব্যবহার করলে কোন রকম অ্যাবারেশন বা ত্রুটি দেখা যায় না।
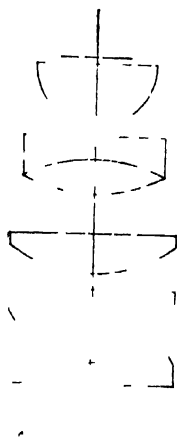
চিত্র—6b
অ্যাপোক্রোমাটিক লেন্স

উৎকৃষ্ট চশমার কাঁচ (*optical glass*) ও ফ্লুরাইট দিয়ে অ্যাপোক্রোমাটিক লেন্স তৈরী করা হয়।

অয়েল ইমারশ্‌ন অবজেকটিভ (*oil immersion objective*)

অয়েল ইমারশ্‌ন অবজেকটিভ সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন। দুইটা বস্তুর মধ্যে ব্যবধান মাত্র 0.25μ হলেও তাদের অয়েল ইমারশ্‌ন অবজেকটিভ দিয়ে আলাদাভাবে দেখা যায়।

সাধারণ অবজেকটিভ ব্যবহার করার সময় দ্রষ্টব্য বস্তুর এবং অবজেকটিভের মাঝখানে বাতাস থাকে। একটা ঘন মাধ্যম (*dense medium*, যেমন—কাঁচ) থেকে হালকা মাধ্যমে (*light medium*, যেমন বাতাস) যাওয়ার সময় যে-সব আলোর রশ্মি ঐ দুই মাধ্যমের সংযোগস্থলে কোনাকুনিভাবে আসে তারা বেঁকে যায় (aa,bb) (চিত্র 7)। যেসব রশ্মি খুব বাঁকাভাবে আসে (*critical angle*) তারা অন্য মাধ্যমে প্রবেশ না করে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত (*reflected*) হয় (cc) (চিত্র 7)। সেজন্য কভার স্লিপ ও বাতাসের সংযোগস্থলে যেসব আলোর রশ্মি *critical angle*-এর চেয়ে বড় কোন তৈরী করে তারা অবজেকটিভে প্রবেশ করতে পারে না। বাতাসের পরিবর্তে কাঁচের সমান রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স (*refractive index*) বা প্রতি-সরাঙ্কযুক্ত সেডার তেল (*ceder wood oil*) কভার স্লিপ ও অবজেকটিভের মাঝখানে দিলে আলোর রশ্মি বেঁকে না গিয়ে সোজা যায় ও অবজেকটিভে প্রবেশ করে। এইজন্য অয়েল ইমারশন অবজেকটিভ দিয়ে খুব ছোট বস্তুকেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

চিত্র - 7
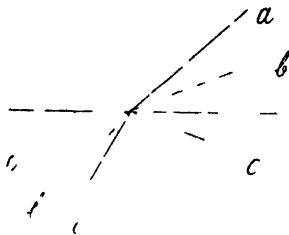
এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় বিভিন্ন আলোর রশ্মি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বেঁকে যায়

আই পিস (*eye piece*)

আই পিস বিভিন্ন রকমের হয়। নীচে কয়েক ধরনের আই পিসেব বর্ণনা দেওয়া হ'ল।
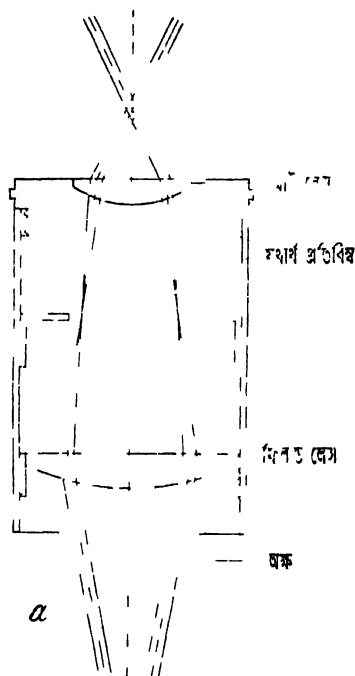
চিত্র—8a
Huygenian আই পিস

(1) *Huygenian* **আই পিস** (চিত্র 8a)

এই আই পিস সবচে'য় বেশী ব্যবহৃত হয় এবং দুইটা প্লেনো-কনভেক্স (*plano-convex*) লেন্স দিয়ে তৈরী। লেন্স দুইটার উত্তল (*convex*) দিকটা নীচের দিকে থাকে। নীচের লেন্সটা দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রাথমিক বা যথার্থ প্রতিবিম্ব (*real image*) যেখানে তৈবী হয় তাব নীচে থাকে ও অবজেকটিভ থেকে যে আলোর রশ্মি আসে সেসব রশ্মিকে অক্ষের (*axis*) দিকে বেঁকিয়ে দেয়। উপরের লেন্সটা নীচের লেন্স থেকে কিছুটা ব্যবধানে

থাকে। এই লেন্সটা আলোর রশ্মিকে সমান্তরাল বা সামান্য বহির্মুখী রশ্মিতে পরিবর্তিত করে।

এই আই পিস নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন (*low power*) অ্যাক্রোমাটিক অবজেকটিভের সাথে ভালভাবে ব্যবহার করা যায়।

নির্দেশক বা পয়েন্টার (*pointer*) **আই পিস**

কোন কোন *Huygenian* আই পিসে একটা নির্দেশক কাঁটা থাকে, যার সাহায্যে স্লাইডের কোন বিশেষ বস্তুকে দেখান যায়। এইরকম আই পিসকে নির্দেশক বা পয়েন্টার আই পিস বলা হয়।

(2) **কমপেনসেটিং বা পরিপূরক আই পিস** (*compensating eye-piece*) (চিত্র 8b)
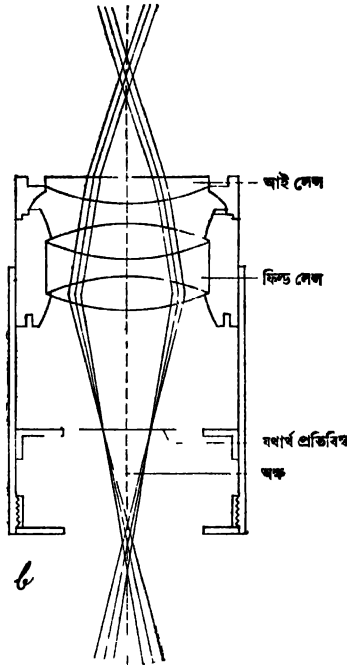
চিত্র—8b
কমপেনসেটিং বা পরিপূরক আই পিস

এই আই পিস সবরকমের অবজেকটিভের সাথে ব্যবহার করা যায়। অবজেকটিভের জন্য বর্ণগত ত্রুটি (বা ক্রোমাটিক অ্যাবারেশন) হ'লে কমপেনসেটিং আই পিস তা সংশোধন করতে পারে।

কনডেন্সার (*condenser*) বা আলোক কেন্দ্রীভূতকারী লেন্স

কনডেন্সার দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুকে সমভাবে আলোকিত করা হয়। কনডেন্সার আয়না ও দ্রষ্টব্য বস্তুর মাঝে থাকে এবং এখানে একটা আইরিস ডায়াফ্র্যাম (*iris diaphragm*) থাকে। আইরিস ডায়াফ্র্যামের রন্ধ্র বা অ্যাপারচার (*aperture*) যত কমান যায় ততই প্রতিবিম্বের বৈষম্য (*contrast*) বাড়ে।

কনডেন্সার বিভিন্ন রকমের হয়। এখানে কয়েকটা বেশী ব্যবহৃত কনডেন্সারের বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

(1) **অ্যাবে কনডেন্সার** (*Abbe condenser*) (চিত্র 9a)

অ্যাবে কনডেন্সার সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় এবং চলনসই ধরনের। এই কনডেন্সার ক্রোমাটিক অ্যাবারেশন (*chromatic aberration* বা বর্ণগত
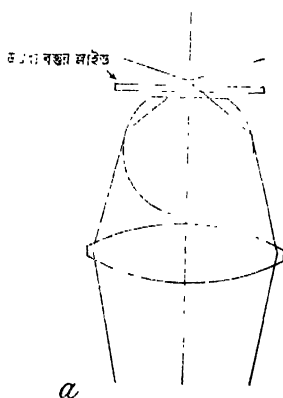
চিত্র—9a
অ্যাবে কনডেন্সার

ত্রুটি) এবং স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন (*spherical aberration*) সংশোধন করতে পারে না। অ্যাবে কনডেন্সার দুইটি প্লেনো-কনভেক্স (*plano. convex*) লেন্স দিয়ে তৈরী।
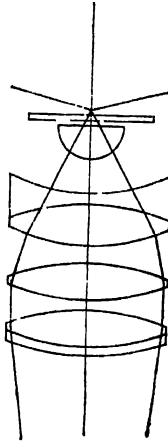
চিত্র—9b
অ্যাক্রোমাটিক কনডেন্সার

(২) **অ্যাক্রোমাটিক কনডেন্সার** (*achromatic condenser*) (চিত্র 9b) কয়েকটা লেন্স দিয়ে এই কনডেন্সার তৈরী করা হয়। অ্যাক্রোমাটিক কন-ডেন্সার ক্রোমাটিক ও স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন সংশোধন করতে পারে। গবেষণার কাজের জন্য ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই কনডেন্সার থাকে।

(3) **কারডয়েড কনডেন্সার** (*cardoid condenser*) (চিত্র 10)

অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই কনডেন্সার ব্যবহৃত হয়। কারডয়েড কনডেন্সার ব্যবহার করলে কোলয়ডীয় দ্রবণ ভাল করে দেখা যায়।

আইরিস ডায়াফ্র্যাম (*iris diaphragm*)

কনডেন্সারে আইরিস ডায়াফ্র্যাম থাকে। আইরিস ডায়াফ্র্যামের রন্ধ্র কমিয়ে বাড়িয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুকে প্রয়োজন অনুসারে আলোকিত করা হয়। আইরিস ডায়াফ্র্যামের রন্ধ্র বা অ্যাপারচার (*aparture*) কমালে পরিধির দিকের আলোর রশ্মি যেতে পারে না এবং কেবল কেন্দ্র ও তার কাছের রশ্মির সাহায্যে দ্রষ্টব্য বস্তুকে দেখা হয়। এর ফলে দ্রষ্টব্য বস্তুর বৈষম্য (*contrast*) বাড়ে কিন্তু কনডেন্সারের N. A. কমে যায়।
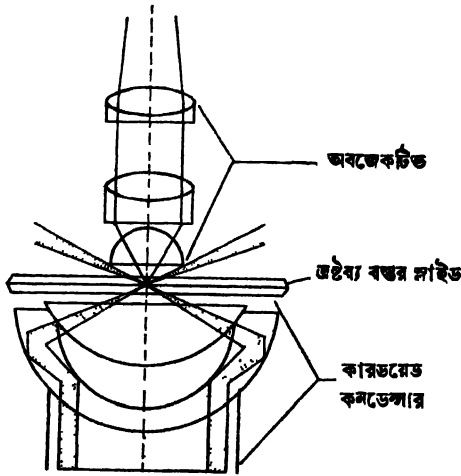
চিত্র—10
কারডয়েড কনডেন্সারের মধ্যে দিয়ে আলোর গতিপথের নক্সা

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

অণুবীক্ষণ যন্ত্র অনেক রকমের হয়। নীচে কয়েক রকমের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

(1) **দৃশ্যমান আলো ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র** (*Bright field microscope*)

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। এখানে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রকে (*field*) উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করা হয়। আয়না ও কনডেন্সারের সাহায্যে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর আলো ফেলা হয়। ঐ আলোর রশ্মি দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে গিয়ে অবজেকটিভে প্রবেশ করে। অবজেকটিভ বস্তুটার একটা বড় প্রতিবিম্ব (*image*) তৈরী করে এবং আই পিস এই প্রতিবিম্বকে আরো বড় ক'রে (চিত্র 11)। এইরকম অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোন বস্তুকে হাজারগুণ বড দেখায়, তবে উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত লেন্স ব্যবহার করলে কোন বস্তুকে দুই, তিন হাজারগুণও বড় দেখায়। দৃশ্যমান আলোক ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা মোটামুটি 2000 A°।
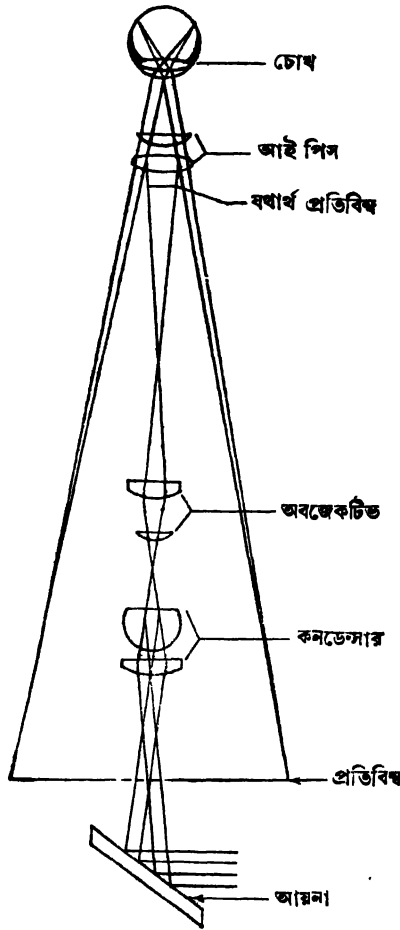
চিত্র—11

উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আলোর গতিপথের এবং কোন বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠনের নক্সা

(2) **অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র** (*dark field microscope*) এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বিশেষ ধরনের কনডেন্সার (যেমন কারডয়েড কনডেন্সার, চিত্র 10) ব্যবহার করা হয়। কারডয়েড কনডেন্সার প্রত্যক্ষ আলোর রশ্মিকে রোধ করে এবং দ্রষ্টব্য বস্তুকে তির্যক রশ্মি দিয়ে আলোকিত করে অর্থাৎ দ্রষ্টব্য বস্তুকে প্রতিফলিত বা বিচ্ছুরিত আলোর

সাহায্যে দেখা হয়। এখানে কালো পশ্চাৎপটের (*background*) উপর দ্রষ্টব্য বস্তুকে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত দেখায়। অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র বর্ণহীন জীবাণু, সেন্ট্রোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, নিউক্লীয়াস, ভ্যাকুওল, স্পিণ্ডল ইত্যাদি দেখবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

(3) **অতিবেগুনী আলোক ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র** (*ultra violet microscope*)

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অতিবেগুনী রশ্মি ও কোয়ার্টজ (*quartz*) লেন্স ব্যবহার করা হয়। কোয়ার্টজ লেন্সের মধ্যে দিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মি যেতে পারে। সাধারণ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে অতিবেগুনী রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোন বস্তুকে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তুলনায় দুই তিন গুণ বড় দেখায়। যেহেতু অতিবেগুনী রশ্মি দেখা যায় না সেজন্য দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিবিম্বকে একটা পর্দার উপর ফেলে আলোক চিত্র তোলা হয়।

ক্রোমোসোমীয় গবেষণার জন্য অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র উপযোগী কারণ সাইটোপ্লাজমের তুলনায় ক্রোমোসোম অতিবেগুনী রশ্মি বেশী শোষণ করে ও আলোকচিত্রে ক্রোমোসোমগুলি পরিষ্কার দেখা যায়।

(4) **প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরেসেন্স অণুবীক্ষণ যন্ত্র** (*fluorescence microscope*) (চিত্র 12)

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহার করা হয়। কিছু রাসায়নিক পদার্থ অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে বেশী তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দৃশ্যমান আলো বের করতে পারে। এইসব বস্তুকে প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরেসেন্ট (*fluorescent*) পদার্থ এবং এই প্রক্রিয়াকে প্রতিপ্রভা বা ফ্লুরেসেন্স বলে। ক্লোরোফিল, রাইবোফ্লেভিন প্রভৃতি পদার্থ ফ্লুরেসেন্ট বা প্রতিপ্রভ। এইসব পদার্থ প্রতিপ্রভ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাল করে দেখা যায়। কোন কোন বিশেষ রঙের সাহায্যে ফ্লুরেসেন্ট নয় এমন পদার্থে ফ্লুরেসেন্স বা প্রতিপ্রভা দেখা যায়। এইসব রঙকে (*stain*) ফ্লুবোক্রোম (*fluorochrome*) বা প্রতিপ্রভাকারী বর্ণ বলে। অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ (*acridine orange*), অ্যানালিন ব্লু (*analine blue*), অরামিন (*auramine*), থিয়োফ্লেভিন (*thioflavin*) ইত্যাদি হ'ল ফ্লুরোক্রোম। কোন বস্তুর ফ্লুরেসেন্স ঐ বস্তুর রাসায়নিক গঠনের উপর নির্ভর করে। এইজন্য বিশেষ ধরনের ফ্লুরেসেন্সের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি থেকে কোন বস্তুর রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ফ্লুরোক্রোম বর্ণ কোষের কোন ক্ষতি করে না

চিত্র--12
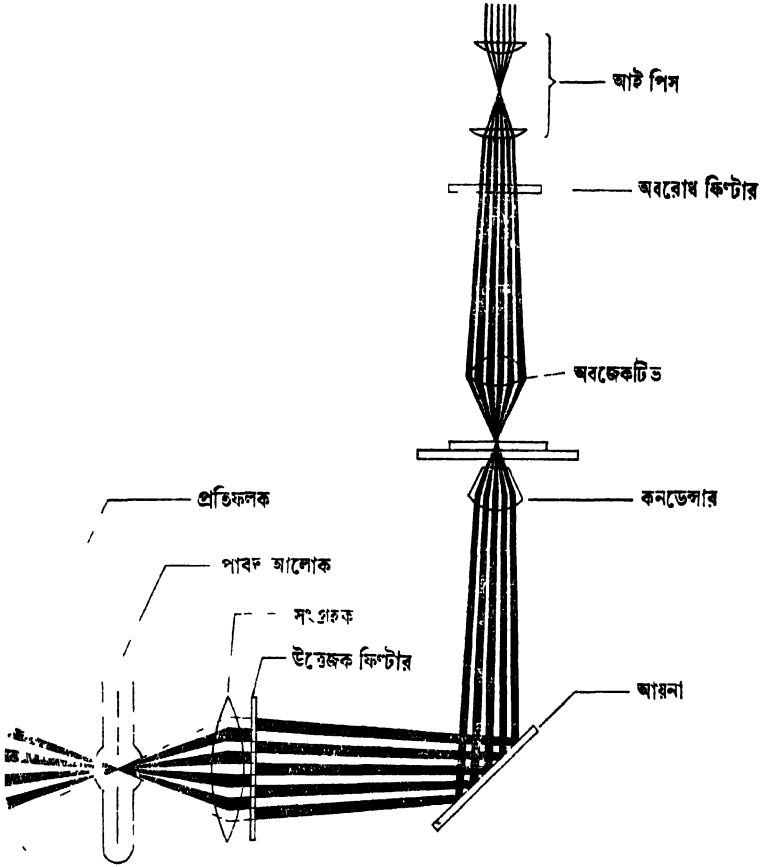
প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরেসেন্স অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আলোর গতিপথের নক্সা

ফলে এই রঙ ব্যবহার করার প'রেও কোষটা সজীব ও কর্মক্ষম থাকে। অতি-বেগুনী আলোর কেবল একটা অংশ প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরেসেন্ট হয় ব'লে এই রকমের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে জোরা'লো অতিবেগুনী আলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

চিত্র—13
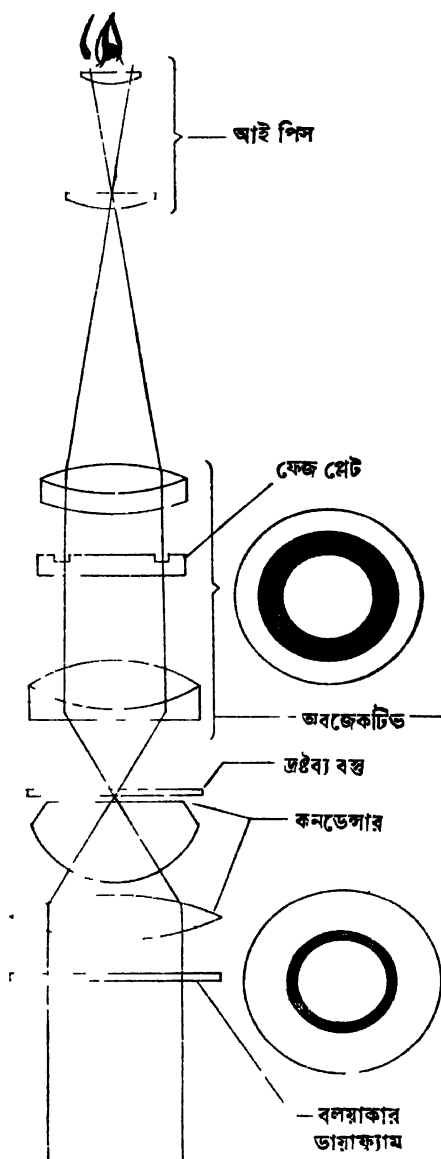
ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন লেন্স, বলয়াকার ডায়াফ্রাম ও ফেজ প্লেটের মধ্যে দিয়ে আলোর গতিপথের নক্সা

(5) **ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র** (*phase contrast microscope*) (চিত্র 13)

এই যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণহীন সজীব কোষ দেখা যায়। দৃশ্যমান আলো ব্যবহৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সজীব কোষ স্বচ্ছ দেখায় এবং কোষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্থূলতার এবং প্রতিসরাঙ্কের (*refractive index*) সামান্য তারতম্য বোঝা যায় না। কিন্তু ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোষের বিভিন্ন অংশের প্রতিসরাঙ্কের পার্থক্য বোঝা যায় কারণ এখানে বিভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোর গতি ও পথকে পরিবর্তিত করে। বেশী প্রতিসরাঙ্কের বস্তুর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আলোর গতি বেশী হ্রাস পায় ফলে বিভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোকিত হয় অর্থাৎ তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতার তারতম্য হয়। ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বিশেষ ধরনের অবজেকটিভ ও কনডেন্সারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত আলো ব্যবহার করা হয়। কনডেন্সারের নীচে একটা বলয়াকার পর্দা (*annular diaphragm*) থাকে যার সাহায্যে দ্রষ্টব্য বস্তুকে যথাযথভাবে আলোকিত করা যায়। অবজেকটিভের ভিতরে বা উপরে ডিফ্র্যাকশন প্লেট (*defraction plate*) বা ফেজ প্লেট থাকে। কোষের বিভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের অংশ আলোর রশ্মিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিসরিত (*refract*) করে। ফেজ প্লেটটা দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে আসা প্রতিসরিত ও অপ্রতিসরিত আলোকে আলাদা করে। এই প্লেটের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিসরিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে যায়। ফেজ কনট্রাস্ট দুই রকমের হয়। পজেটিভ (*positive*) ফেজ কনট্রাস্টে দ্রষ্টব্য বস্তুকে পাশের স্থানের চেয়ে গাঢ় দেখায়। নেগেটিভ (*negative*) ফেজ কনট্রাস্টে কোন বস্তুকে পার্শ্ববর্তী স্থানের চেয়ে উজ্জ্বল দেখায়।

(6) **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র** (*electron microscope*) (চিত্র 14)

বিজ্ঞানী Ruska 1934 খৃষ্টাব্দে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র দিয়ে ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, প্রোটীন অণু ও কোষের সূক্ষ্ম অভ্যন্তরীন গঠন স্পষ্ট দেখা যায়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা অন্যান্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতার চেয়ে অনেকগুণ বেশী কারণ এখানে আলোর পরিবর্তে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (0.05 A°) উচ্চ বেগসম্পন্ন (*high velocity*) ইলেকট্রন ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা 5A°।

এই যন্ত্রে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে ইলেকট্রনগুলি ফোকাস

করা হয়। ইলেকট্রন রশ্মি কেবল বায়ুশূন্য স্থানের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট দূরত্বে যেতে পারে সেইজন্য ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে বায়ুশূন্য স্থানে আবদ্ধ রাখা হয়। একটা ক্যাথোড ফিলামেণ্ট (*cathode filament*) থেকে ইলেকট্রন রশ্মি বেরিয়ে আসার পর ঐ রশ্মিকে তড়িৎ-চৌম্বক (*electro magnetic*) কনডেন্সার দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত করা হয়।
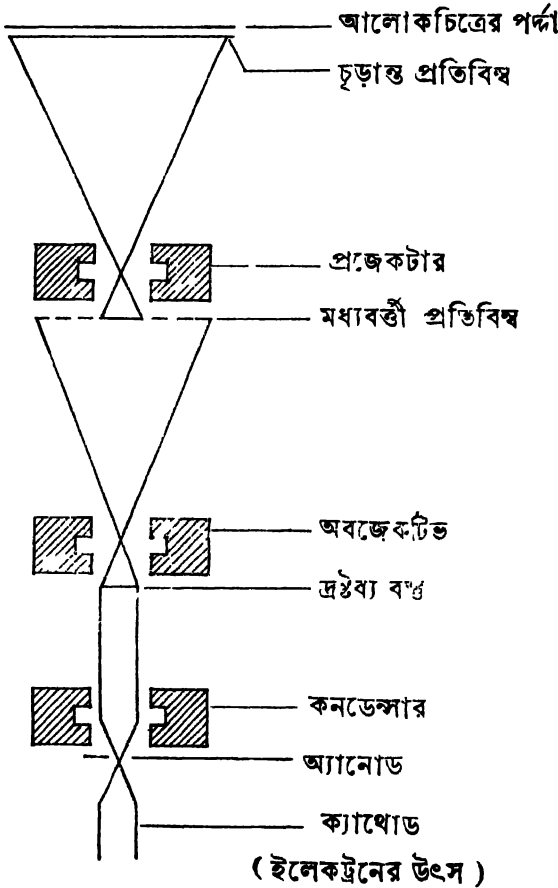
চিত্র– 14
ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইলেট্রনের গতিপথের এবং কোন বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠনের নক্সা

দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর ইলেকট্রন তড়িৎ-চৌম্বক অবজেকটিভ দিয়ে সংগৃহীত হয় এবং অবজেকটিভ দ্রষ্টব্য বস্তুর কিছুটা বড় প্রতিবিম্ব গঠন করে। তড়িৎ-চৌম্বক প্রজেকটার লেন্স বা আই পিস ঐ প্রতিবিম্বকে আরো বিবর্ধিত করে। যেহেতু ইলেকট্রন দেখা যায় না সেইজন্য এই রশ্মিকে একটা প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরেসেন্ট পর্দার উপর ফেলা হয়। ঐ পর্দার উপর দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরী হয়। এখানে আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। প্রজেকটার লেন্সের তড়িৎ-প্রবাহ কমিয়ে বাড়িয়ে বিবর্ধনের (*magnification*) মাত্রার তারতম্য করা হয়। অবজেকটিভের চৌম্বক ক্ষেত্রের (*magnetic field*) পরিবর্তন করে 1000× থেকে 60000× পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রার ম্যাগনিফিকেশন পাওয়া যায়।

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কিছু অসুবিধা আছে, যেমন—

(a) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সজীব কোষ দেখা যায় না কারণ দ্রষ্টব্য বস্তুটা সম্পূর্ণ শুষ্ক হওয়া দরকার। এই শুষ্কতার ফলে কোষের গঠন পরিবর্তিত হতে পারে।

(b) দ্রষ্টব্য বস্তুর রাসায়নিক গঠনের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

(c) সেকশনটা খুব পাতলা (0.1 μ বা কম) হওয়া প্রয়োজন।

ক্যামেরা লুসিডা (*camera lucida*) (চিত্র 15)

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা বস্তুকে যথাযথভাবে আঁকবার জন্য *camera*
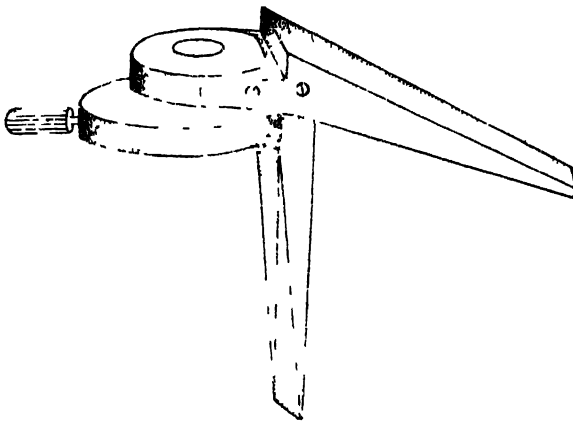
চিত্র—15
ক্যামেরা লুসিডা

lucida-র দরকার হয়। এটা প্রিসিম (*prism*) ও আয়না দিয়ে তৈরী। ক্যামেরা লুসিডাটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আই পিসের উপর লাগান হলে পাশে রাখা আঁকার কাগজের ও পেন্সিলের ছায়াটা আই পিসের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। এর ফলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা কোন বস্তুর যথাযথ চিত্র ক্যামেরা লুসিডার মাধ্যমে আঁকা সম্ভব। অঙ্কিত চিত্রের বিবর্ধনের মাত্রা (*magnification*) জানবার জন্য *stage micrometer*-এর প্রয়োজন। স্টেজ মাইক্রোমিটার হ'ল একটা স্লাইড যার উপর 1-2mm-এর একটা স্কেল থাকে। এই স্কেলে 100-200টা ভাগ থাকে। যে অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি আঁকা হয়েছে সেই একই অবস্থায় মাইক্রোমিটারের স্কেলের একটা অংশ ক্যামেরা লুসিডার সাহায্যে কাগজে আঁকা হয় ও এর থেকে বিবর্ধনের পরিমাণ জানা যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা কোন বস্তুর পরিমাপ করবার জন্য *micrometer eye piece* ব্যবহৃত হয়। এখানেও একটা স্কেল থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

সাইটোলজিয় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখবার জন্য বিভিন্ন উপায়ে কোষের প্রস্তুতিকরণকে "মাইক্রোটেকনিক" (*microtechnique*) বলে। সাইটোলজিয় পরীক্ষার জন্য কোষকে সাধারণতঃ ফিক্স (*fix*) করে তারপর রঞ্জিত করা (*stain*) হয়। স্মিয়ার (*smear*) করে, স্কোয়াশ (*squash*) করে, কিম্বা সেকশন (ছেদ) কেটে কোন বস্তুর স্লাইড (*slide*) তৈরী করা যায়।

ফিক্সেশন (*fixation*) বা স্থায়ীকরণ

কোষের বিভিন্ন অংশের স্বাভাবিক বা প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় সংরক্ষণকে ফিক্সেশন বা স্থায়ীকরণ বলে। বিভিন্ন কারণে ফিক্স করা হয়। সজীব কোষে যে সব বস্তু প্রায় অদৃশ্য থাকে তাদের ভাল করে দেখবার জন্য ও নরম কোন গঠনকে দৃঢ় করবার জন্য কোষগুলিকে ফিক্স করা হয়। এছাড়া এই প্রক্রিয়া কোষকে ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, অটোলাইসিস (*autolysis*) থেকে রক্ষা করে এবং কোষকে রঞ্জিত করার উপযোগী করে। ভাল ফিক্সেটিভ (*fixative*) কোষের সঙ্কোচন ও বিকৃতি রোধ করে।

সাধারণতঃ ফিক্সেটিভ কোষের প্রোটীনকে অদ্রবনীয় করে এবং এর ফলে রঞ্জিত করার সময় কোষ বিকৃত হয় না। কোষের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য ফিক্সেটিভের কোষে দ্রুত প্রবেশ করা দরকার। কোষের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষার জন্য আলাদা আলাদা ফিক্সেটিভ ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ দুই বা তিনটা পদার্থ একসাথে মিশিয়ে ফিক্সেটিভ তৈরী করা হয়। ফিক্সেটিভ তৈরী করার সময় বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। যেমন কোন পদার্থ সাইটোপ্লাজমের সংকোচন ঘটালে অন্য আরেকটা পদার্থ যা সাইটোপ্লাজমকে স্ফীত করে তার সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। কোষের কোন অংশ পরীক্ষা করা হবে তার উপর নির্ভর করে ফিক্সেটিভ নির্বাচিত করা হয়। ক্রোমোসোমের ফিক্সেশনের জন্য অ্যাসিটিক অ্যালকোহল (*acetic alcohol*) বা নাভাসিন দ্রবণ বা কার্ণয় দ্রবণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অ্যাসিটিক অ্যাসিডযুক্ত অ্যালকোহলীয় ফিক্সে-টিভ কোষ প্রাচীরকে নরম করে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড কোষে দ্রুত প্রবেশ

করে তবে এটা প্রোটোপ্লাজমকে সামান্য স্ফীত করে। অ্যালকোহল কোষের বিভিন্ন বস্তুকে শক্ত করে এবং ক্রোমোসোমকে যথাযথ অবস্থায় রাখে।

কার্ণয় দ্রবণ—(*Carnoy solution*) যেসব পদার্থ মিশিয়ে কার্ণয় দ্রবণ তৈরী করা হয় সেগুলি হচ্ছে—

(a)	অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল (*absolute alcohol*)	—	30 সিঃ সিঃ
(b)	গ্ল্যাসিয়েল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (*glacial acetic acid*)	—	5 " "
(c)	ক্লোরোফর্ম (*chloroform*)	—	15 " "

কার্ণয় দ্রবণ খুব তাড়াতাড়ি কোষে প্রবেশ করতে পারে। এই দ্রবণের ক্লোরোফর্ম স্নেহ পদার্থকে (*fat*) দ্রবীভূত করে।

Belling-**এর পরিবর্তিত নাভাসিন দ্রবণ** (*Navaschin solution*) Navaschin 1910 খৃষ্টাব্দে এই দ্রবণ প্রথম তৈরী করেন। পরে Belling এর কিছু পরিবর্তন করেন।

নাভাসিন A

ক্রোমিক অ্যাসিডের কেলাস (*crystal*)		5 গ্রাম
গ্ল্যাসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড	—	50 সিঃ সিঃ
পরিশুদ্ধ জল (*distilled water*)	-	320 সিঃ সিঃ

নাভাসিন B

ফরমালিন	-	200 সিঃ সিঃ
পরিশুদ্ধ জল	--	175 সিঃ সিঃ

মেটাফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি দেখবার জন্য অনেক সময় নাভাসিন 'B'র উপাদানগুলির কিছু পরিবর্তন করা হয়। এসব ক্ষেত্রে ফরমালিন 100 সিঃ সিঃ ও পরিশুদ্ধ জল 275 সিঃ সিঃ মিশিয়ে নাভাসিন 'B' তৈরী করা হয়।

নাভাসিন 'A' ও 'B' স্মিয়ার করবার ঠিক আগেই সম-পরিমাণে মেশান হয়। নাভাসিন দ্রবণ 'A'-তে জারক (*oxidising*) দ্রব্য ও 'B'-তে বিজারক (*reducing*) দ্রব্য থাকায় ঐ দুইটা দ্রবণ ব্যবহারের আগে পর্যন্ত আলাদা রাখা হয়।

কখন কখনও পরীক্ষণীয় বস্তুকে তরল নাইট্রোজেনের সাহায্যে তাড়াতাড়ি খুব ঠান্ডা করে এবং পরে জলহীন (*dehydrate*) করে ফিক্স

করা হয়। এই পদ্ধতিতে ফিক্স করার জন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় না বলে এবং দ্রুত ঠান্ডা করার ফলে কোষগুলি খুব কম বিকৃত হয়।

স্মিয়ার করার পদ্ধতি (*smearing*)

সেকশন না কেটে স্মিয়ার (*smear*) বা স্কোয়াশ (*squash*) পদ্ধতিতে তাড়াতাড়ি স্লাইড তৈরী করা যায়। যে সব কোষ পরস্পরের সাথে যুক্ত নয় অর্থাৎ যেখানে মধ্যপর্দা (*middle lamella*) নাই সেখানে স্মিয়ার পদ্ধতি উপযোগী। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের পরাগরেণু মাতৃকোষগুলির (*pollen mother cell*) বিভাগ দেখবার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। স্মিয়ার পদ্ধতির সাহয্যে কোষগুলিকে স্লাইডের উপর এক স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে এদের ভালভাবে ফিক্স করা সম্ভব। স্মিয়ার করার পর কোষগুলি স্লাইডের সাথে আটকে থাকে ও এদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে রঙ করা যায়।

যে স্লাইডে স্মিয়ার করা হবে তা খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার। স্লাইড-গুলিকে সালফিউরিক অ্যাসিড ও পটাশিয়াম বাইক্রোমেটের দ্রবণে অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়। এরপর এগুলি সামান্য অ্যামোনিয়া মিশ্রিত অ্যালকোহল রেখে আবার জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ভালভাবে মুছে নিলেই স্লাইডগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়।

পরাগরেণু মাতৃকোষগুলি নীচের পদ্ধতি অনুসারে স্মিয়ার করা হয়। স্মিয়ার করার পর ফিক্স করবার জন্য আগেই ফিক্সেটিভ প্রস্তত রাখা দরকার। মুকুল থেকে পরাগধানী (*anther*) বের ক'র স্লাইডে রাখা হয়। পরাগধানী যথেষ্ট বড় হলে তাকে ছুরি দিয়ে কয়েকটা টুকরা করা হয় বা পরাগধানীর দুই প্রান্ত কেটে ফেলা হয়। একটা পরিষ্কার ছুরি দিয়ে তাড়াতাড়ি ও সমানভাবে পরাগধানীগুলিকে চাপ দিয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যার ফলে কোষগুলি একস্তরে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্লাইডটাকে নাভাসিন দ্রবণে ডুবিয়ে দেওয়া হয় যাতে সব স্মিয়ার করা কোষ-গুলি ঐ তরল পদার্থের সংস্পর্শে থাকে। পরাগধানীগুলিকে স্মিয়ার করা ও তরল পদার্থে ডুবাবার মধ্যে সময়ের ব্যবধান চার সেকেন্ডের বেশী হওয়া উচিত নয়। স্লাইডটাকে ঐ দ্রবণে দেড় ঘণ্টা রাখা যেতে পারে ও পরে স্লাইডটাকে আধ ঘণ্টা প্রবহণশীল জলে ধুয়ে ফেলা হয়। স্লাইডে পরাগধানীর যেসব অপ্রয়োজনীয় অংশ থাকে তা ফরসেপ (*forcep*) দিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে খারাপ স্লাইড

বাদ দেওয়ার পর ভাল স্লাইড বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে রঙ করা হয়। এই অধ্যায়ের শেষে কতকগুলি প্রচলিত পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

স্কোয়াশ (*squash*) **করার পদ্ধতি**

এই পদ্ধতি Schneider প্রথম ব্যবহার করেন। পরে Belling 1921 খৃষ্টাব্দে ক্রোমোসোম দেখবার জন্য এর ব্যবহার করেন। স্কোয়াশ করার জন্য কোষগুলি সরাসরি ফিক্সেটিভে দেওয়া হয়। পরাগরেণু মাতৃকোষ দেখবার জন্য কারমিন ব্যবহৃত কয়েকটা পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হ'ল।

A. **আয়রণ অ্যাসিটো কারমিন** (*non-aceto-carmine*) **পদ্ধতি**

Belling 1926 খৃষ্টাব্দে আয়রণ অ্যাসিটো কারমিন পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। এই পদ্ধতি খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। পরে Johanson Bellingএর আয়রণ অ্যাসিটো কারমিন পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করেছেন।

কারমিন তৈরী করার পদ্ধতি

একটা ফ্লাস্কে 100 সিঃ সিঃ 45 শতাংশ অ্যাসিটিক অ্যাসিড নিয়ে ফুটান হয়। তারপর এটা আগুণ থেকে সারিয়ে সাথে সাথে এক গ্রাম কারমিন (*carmine*) আস্তে ঢেলে দেওয়া হয়। মিশ্রণ ঠান্ডা হয়ে গেলে ফিলটার করা হয়। কারমিনের মিশ্রণে কয়েক ফোঁটা ফেরিক অ্যাসিটেটের (*ferric acetate*) জলীয় দ্রবণ যোগ করা হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা গাঢ় লাল হয়। তবে বেশী ফেরিক অ্যাসিটেট যোগ ক'রলে কারমিনের তলানি প'ড়ে যায়। ফেরিক অ্যাসিটেট কারমিনের জন্য মরড্যান্ট হিসাবে কাজ করে এবং এর ব্যবহারের ফলে ক্রোমোসোমগুলি গাঢ় রঙ নেয়।

অ্যাসিটো কারমিন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়। এখানে সাধারণতঃ যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তার বর্ণনা করা হ'ল।

স্লাইডে কয়েক ফোঁটা অ্যাসিটো কারমিন (*aceto-carmine*) দিয়ে তার মধ্যে কয়েকটা ছোট পরাগধানী (*anther*) কিম্বা পরাগধানী বড় হলে তার কয়েকটা অংশ রাখা হয়। একটা ছুরি দিয়ে পরাগধানীর উপর চাপ দিয়ে পরাগরেণুগুলি বের করা হয়। পরাগধানীর প্রাচীর ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অংশ সরিয়ে ফেলে একটা কভার স্লিপ দিয়ে চাপা দিয়ে স্লাইডটাকে 4-5 বার এক সেকেন্ড গরম ক'রলে কোষগুলি চ্যাপটা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তবে কারমিন যেন ফুটে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। অতিরিক্ত কারমিন মুছে ফেলা হয় ও মোম দিয়ে কভার স্লিপের ধারগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ক্রোমোসোমগুলি ভাল করে রঙ না নিলে স্লাইডটাকে ঐ অবস্থায় রঙ ধরবার জন্য কয়েকদিন রেখে দেওয়া হয়।

কারমিনের স্লাইড দেখবার সময় সবুজ ফিলটার ব্যবহার করলে ক্রোমো-সোমগুলি কুচকুচে কাল দেখায়।

ক্রোমোসোম ও নিউক্লীয়াস দেখবার জন্য কখন কখনও অ্যাসিটো কারমিনে ক্লোরাল হাইড্রেটের অল্প কয়েকটা কেলাস যোগ করা হয়। এর ফলে পরাগরেণুগুলি স্বচ্ছ দেখায়।

B. McClintock-এর স্থায়ী অ্যাসিটো কারমিন পদ্ধতি

সদ্য সংগৃহীত বা সংরক্ষিত মুকুল থেকে পরাগরেণুগুলিকে এই পদ্ধতিতে রঙ করা যায়। [সংরক্ষণের পদ্ধতি হ'ল—গ্ল্যাসিয়েল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল (1:2 বা 1:3) একটা ছোট শিশিতে নিয়ে তার মধ্যে পরাগধানীগুলি ডুবিয়ে দেওয়া হয়। চব্বিশ ঘণ্টা বাদে ঐ পরাগধানীগুলিকে সত্তর শতাংশ অ্যালকোহলে রাখা হয়। এইভাবে পরাগ-ধানীগুলি অনির্দিষ্ট কাল সংরক্ষিত রাখা যায়।]

পরাগধানী কারমিনে স্কোয়াশ (*squash*) করে স্লাইড তৈরী করা হয়। স্লাইডটাকে স্থায়ী করবার জন্য সাবধানে কভার স্লিপের (*cover slip*) ধারের মোম ব্লেড দিয়ে চেঁছে ফেলা হয়। কভার স্লিপটা যাতে সরে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

(1) এরপর একটা পেট্রিডিসে 45 শতাংশ অ্যাসিটিক অ্যাসিডে ঐ স্লাইড-টাকে উল্টে রাখা হয়। কিছুক্ষণ বাদে কভার স্লিপটা স্লাইড থেকে আলাদা হয়ে যায়। স্লাইড ও কভার স্লিপে কোষগুলি আটকে থাকে। এই অবস্থায় স্লাইড ও কভার স্লিপ পাঁচ মিনিট রাখা হয় ও এরপর নীচের দ্রবণগুলির প্রত্যেকটাতে পাঁচ মিনিট করে রাখা হয়।

(2) অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল 1:1 অনুপাতে
(3) " " " " 1:3 "
(4) " " " " 1:9 "
(5) অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল ও জাইলল (*xylol*) 1:1 "
(6) জাইলল (বিশুদ্ধ)

(7) জাইলল থেকে স্লাইডটা তুলে নিয়ে কোষগুলির উপর কানাডা বালসাম (*canada balsam*) দেওয়া হয় ও নূতন কভার স্লিপ দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। একইভাবে একটা পরিষ্কার স্লাইডে এক ফোঁটা কানাডা বালসাম নিয়ে তার উপর কোষ যুক্ত কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয়ে থাকে। সদ্য তৈরী করা স্লাইড ঐ দিনই স্থায়ী করলে বিশুদ্ধ জাইলল ব্যবহার করা হয় না কারণ এর ব্যবহারের ফলে রেণুমাতৃকোষগুলি বিকৃত দেখায়।

C. McCallam-এর আয়রণ প্রোপিয়োনো কারমিন (*iron-propiono carmine*) পদ্ধতি

অ্যাসিটিক অ্যাসিডের তুলনায় প্রোপিয়োনো কারমিনে অনেক বেশী ভালভাবে স্থায়ীকরণ (*fixation*) ও রঞ্জিতকরণ (*staining*) সম্ভব। বিভিন্ন উদ্ভিদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার প্রোপিয়োনো কারমিন ব্যবহার করা হয়। অ্যাসিটো কারমিনের মত একই পদ্ধতিতে প্রোপিয়োনো কারমিন তৈরী করা হয় কেবল এখানে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের পরিবর্তে প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড (*propionic acid*) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রোপিয়োনিক অ্যাসিডে কারমিন বেশী দ্রবীভূত হয় ও এর ব্যবহারের ফলে সাইটোপ্লাজম আরও স্বচ্ছ দেখায়।

1:2 প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড ও অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলের মিশ্রণে পরাগধানীকে ফিক্স করার পর আয়রণ প্রোপিয়োনো কারমিনে 2-3 মিনিট রাখা হয়। স্লাইডে এক ফোঁটা প্রোপিয়োনো কারমিন দিয়ে তার মধ্যে পরাগধানীগুলি স্মিয়ার করা হয়। স্মিয়ার করতে অসুবিধা হলে স্লাইডটা সামান্য গরম করা দরকার। 50 শতাংশ প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড কভার স্লিপের একটা ধারে দিয়ে অন্য পাশে ব্লটিং দিয়ে প্রোপিয়োনো কারমিনটা শুষে নিয়ে রঙটা প্রয়োজন অনুযায়ী কমান যায়।

স্লাইডটাকে নীচের পদ্ধতিতে স্থায়ী করা যায়।

(a) 50% জলীয় প্রোপিয়োনিক অ্যাসিডে স্লাইডটা উল্টে রাখা হয়। কভার স্লিপটা (*cover slip*) স্লাইড থেকে আলাদা হয়ে গেলে পর পাঁচ মিনিট রাখা হয়। এর পর স্লাইড ও কভার স্লিপ নীচের দ্রবণগুলিতে নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়।

(b) টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল, (*tartiary butyl alcohol*) প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড ও জলের মিশ্রণ (1:2:1 অনুপাতে) } —5 মিনিট

(c) টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল, প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড (1:1 অনুপাতে) } —5 মিনিট

(d) টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল ও প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড (3:1 অনুপাতে) } —5 মিনিট

(e) টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল ও প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড (9:1 অনুপাতে) } —5 মিনিট

(f) বিশুদ্ধ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল —5 মিনিট

(g) স্লাইডে ইউপারল (*euparol*) দিয়ে কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয়।

সেকশনিং (*sectioning*) বা ছেদন

ফুলের মুকুল কিম্বা মূলের অগ্রভাগ বিশেষ পদ্ধতিতে মোমের ভিতর রেখে মাইক্রোটোমের (*microtome*) সাহায্যে পাতলা সেকশন বা ছেদ তৈরী করা হয়। অ্যাসিটো কারমিন পদ্ধতিতে স্কোয়াশ করে যথাযথ আয়তনের মুকুল নির্বাচিত করার পর মুকুলের বৃতি (*calyx*) ও দলমণ্ডল (*corolla*) বাদ দিয়ে কার্ণয় দ্রবণে 1-2 সেকেন্ড রাখা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ মুকুলটা এক মিনিট জলে ধুয়ে *Navaschin* দ্রবণে ফিক্স করা হয়। মূলের ক্ষেত্রে *Lewitsky*-র মিশ্রণ ফিক্সেটিভ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক শতাংশ ক্রোমিক অ্যাসিড ও দশ শতাংশ ফরমালিন ফিক্স করার ঠিক আগে সমপরিমাণে মিশিয়ে *Lewitsky*-র মিশ্রণ তৈরী হয়। মুকুল ও মূল সারারাত্রি ফিক্স করার পর একদিন প্রবহণশীল জলে ধুতে হয়। এরপর এগুলি বিভিন্ন অ্যালকোহলের মধ্যে রেখে জলহীন করে (*dehydrate*) পরে মোমের ভিতর রাখা হয়। জলহীন করবার পদ্ধতির (*dehydration*) বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

(1) ক্লোরোফর্মের সাহায্যে

মুকুল বা মূলগুলি যথাক্রমে অ্যালকোহল ক্লোরোফর্ম মোম ইত্যাদিতে নীচের বর্ণনা অনুযায়ী রাখা হয়।

(a)	30 শতাংশ অ্যালকোহলে	—	1 ঘণ্টা
(b)	50 " "	—	1 "
(c)	70 " "	—	সারারাত্রি
(d)	80 " "	—	1 ঘণ্টা
(e)	90 " "	—	1 "
(f)	95 " "	—	1 "
(g)	অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল I এ	—	সারারাত্রি
(h)	" " II এ	—	10 মিনিট
(i)	অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল ও ক্লোরোফর্মে (3:1)	—	2 ঘণ্টা
(j)	" " " (1:1)	—	2 "
(k)	" " " (1:3)	—	2 "
(l)	ক্লোরোফর্ম I এ	—	10 মিনিট
(m)	ক্লোরোফর্ম II এ	—	48 ঘণ্টা

দ্বিতীয়বার ক্লোরোফর্ম দেবার পর শিশিতে মোমের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে 35—38°C তাপমাত্রার হট প্লেটে *(hot plate)* অন্তত 48 ঘণ্টা রাখা হয়। এরপর শিশির ছিপি খুলে 45°C তাপমাত্রার ওভেনে সারারাত্রি রাখার পর শিশিটা 56—60°C তাপমাত্রার ওভেনে স্থানান্তরিত করা হয়, যাতে কোন ক্লোরোফর্ম না থাকে। এবার মোমটা ঢেলে ফেলে নূতন মোম দেওয়া হয়। এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর আরো দুইবার মোম বদল করা হয়। ওভেনের তাপমাত্রা যাতে অত্যাধিক বেড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

মুকুল বা মূলগুলি মোমে নিহিত করার জন্য শীতকালে 49—52°C ও গ্রীষ্মকালে 56—60°C গলনাঙ্কের *(melting point)* মোম ব্যবহার করা উচিত।

(2). টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহলের *(tertiary butyl alcohol)* সাহায্যে

মুকুল বা মূলগুলি বিভিন্ন তরল পদার্থে নীচের তালিকা অনুযায়ী রাখা হয়।

(a)	20 শতাংশ অ্যালকোহলে	2 ঘণ্টা
(b)	30 শতাংশ অ্যালকোহলে	2 ”
(c)	50 শতাংশ অ্যালকোহলে জল—50ভাগ ইথাইল অ্যালকোহল—40 ভাগ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল—10 ভাগ	2 ”
(d)	70 শতাংশ অ্যালকোহলে জল—30 ভাগ ইথাইল অ্যালকোহল—50 ভাগ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল—20 ভাগ	সারারাত্রি
(e)	85 শতাংশ অ্যালকোহলে জল—15 ভাগ ইথাইল অ্যালকোহল—50 ভাগ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল—35 ভাগ	1 ঘণ্টা

(f) 95 শতাংশ অ্যালকোহলে

জল—5 ভাগ ইথাইল অ্যালকোহল—40 ভাগ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল—55 ভাগ	1 ঘণ্টা

(g) 100শতাংশ অ্যালকোহলে

ইথাইল অ্যালকোহল—25 ভাগ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল—75 ভাগ	1 "

100% অ্যালকোহলে সামান্য এরিথ্রোসিন দিলে পরীক্ষণীয় বস্তুগুলি লাল রঙের দেখায় ও মোমের মধ্যে এগুলি সাজাতে সুবিধা হয়।

(h) তিনবার বিশুদ্ধ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহলে রাখা হয়। এরমধ্যে একবার সারারাত্রি বিশুদ্ধ টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহলে রাখা হয়।

(i) সমপরিমাণ প্যারাফিন্ অয়েল (*paraffin oil*) ও টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহলের মিশ্রণে এক ঘণ্টা রাখা হয়।

(j) এবার একটা শিশিতে মোম দিয়ে তারপর মুকুল বা মূলগুলি রেখে অল্প প্যারাফিন্ অয়েল দিয়ে ঢেকে শিশিটা ওভেনে রাখা হয়। আস্তে আস্তে মুকুল বা মূলগুলি শিশির তলায় ডুবে যায়।

(k) এক ঘণ্টা পর ঐ শিশি থেকে মোম ঢেলে ফেলে নূতন মোম দিয়ে আবার শিশিটা ওভেনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। দুইবার এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা হয়।

সাইটোলজিয় পরীক্ষার জন্য টারসিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহলের পদ্ধতিই বেশী উপযোগী।

মুকুল বা মূলের অগ্রভাগ মোমের মধ্যে স্থাপিত করার পদ্ধতির বর্ণনা করা হ'ল। প্রথমে মোম সমেত মুকুল বা মূলগুলি শিশি থেকে একটা পাত্রে ঢেলে সাজিয়ে ফেলা হয়। সাধারণতঃ কাগজ ভাঁজ করে পাত্রটা তৈরী করা হয়ে থাকে।

এবার মোমে মুকুল বা মূল স্থাপিত করবার জন্য কাগজের পাত্রটা ওভেনের (*oven*) কাছে রাখা হয়। একটা বুনসেন বার্ণার কাছেই রাখা হয় যাতে নিডিলটা প্রয়োজন মত গরম করা যায়। ওভেন থেকে শিশিটা বের করে ঝেঁকে নিয়ে কাগজের পাত্রে মোম ও মুকুল বা মূলগুলি তাড়াতাড়ি ঢেলে দেওয়ার পর প্রয়োজন মত অন্য পাত্র থেকে তরল মোম ঢেলে দেওয়া হয় যাতে বস্তুগুলি ঢাকা থাকে। এবার গরম নিডিল দিয়ে বস্তুগুলিকে যথাযথভাবে

সাজিয়ে ফেলা হয়। মূলের অগ্রভাগ বা ছোট মুকুল কয়েকটা একসাথে সাজান হয়। একটু বাদে পাত্রটা আস্তে আস্তে তুলে ঠাণ্ডা জলের পাত্রে রাখা হয়। শক্ত না হওয়া পর্যন্ত কাগজের পাত্রটা জলের উপর ভাসতে দেওয়া হয়। এরপর পাত্রটা জলের তলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। একটু পরে কাগজের পাত্রটা তুলে নেওয়া হয়। মোমের খণ্ডটা যথাযথভাবে চিহ্নিত করে রেখে দেওয়া হয়।

মাইক্রোটোমের সাহায্যে মোমের মধ্যে নিহিত বস্তুর সূক্ষ্ম সেকশন কাটা হয় (চিত্র 16)। একটা ছুরি দিয়ে মোমটাকে এমনভাবে কাটা হয় যার ফলে প্রত্যেক খণ্ডে একটা কিম্বা একগুচ্ছ মুকুল বা মূলের অগ্রভাগ থাকে। পাশের অতিরিক্ত মোম চেঁছে ফেলা হয়। বস্তুটার চারিদিকে অন্ততঃ তিন মিলিমিটার এবং নীচে অন্ততঃ পাঁচ মিলিমিটার পুরু মোম থাকা প্রয়োজন। এবার এই মোম খণ্ডটাকে মাইক্রোটোমের গোল ধাতব হোল্ডারের (*holder*) সাথে লাগান হয়। তরল মোমের মধ্যে ডুবিয়ে ধাতব হোল্ডারের উপরে একটা মোমের স্তরের সৃষ্টি করা হয়। খানিকটা অর্ধ-তরল মোম হোল্ডারের ঠিক মাঝখানে দেওয়া হয়। একটা ছুরি গরম করে একবার হোল্ডারের মাঝখানের মোমে ও আরেকবার মোমখণ্ডের নীচের দিকে স্পর্শ করা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে মোমখণ্ডটা হোল্ডারের মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হয়। আবার ছুরিটা গরম করে সংযোগ-স্থলে সাবধানে ধরা হয় যাতে মোমেরখণ্ডটা ও হোল্ডারের মোম এক-সাথে মিশে যায়। মোমের খণ্ড থেকে মোম ধীরে ধীরে চেঁছে ফেলে (চিত্র 16a) ঐ খণ্ডটা চারকোনা করা হয়। মোমের খণ্ডটা
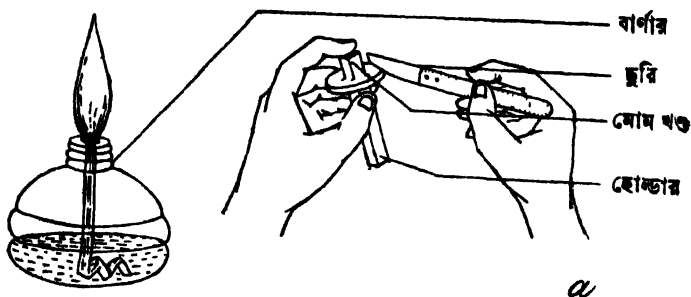
চিত্র—16a
মাইক্রোটোমের ধাতব হোল্ডারের উপর 'প্যারাফিন ব্লক' (মোমখণ্ড) বসাবার পদ্ধতি

হোল্ডারের উপর সোজাভাবে বসান উচিত এবং এর বিপরীত পাশগুলি সমান্তরাল হওয়া প্রয়োজন। এবার হোল্ডারটা মাইক্রোটোমের ক্ল্যাম্পের (*clamp*) মধ্যে ঢুকিয়ে স্ক্রুটা (*screu*) আঁট করে দেওয়া হয়। মোমের খণ্ডের উপরের দিকটা ক্ষুরের সাথে সমান্তরালভাবে থাকা দরকার। কতখানি মোটা সেকশন কাটতে হবে তা মাইক্রন্ স্কেলে (*micron scale*) ঠিক করে নেওয়া হয়। সেকশন কাটার জন্য মাইক্রোটোমের চাকা সমানভাবে ঘোরান হয়। রোটারী মাইক্রোটোমের সেকশনগুলি পরস্পর যুক্ত হ'য়ে একটা ফিতার সৃষ্টি করে। মোম খণ্ডটা ক্ষুরকে স্পর্শ করলে সামান্য উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপের ফলে একটা সেকশন অন্য সেকশনের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। একটা নিডিল দিযে ফিতাটাকে আলগা কবে ধরে
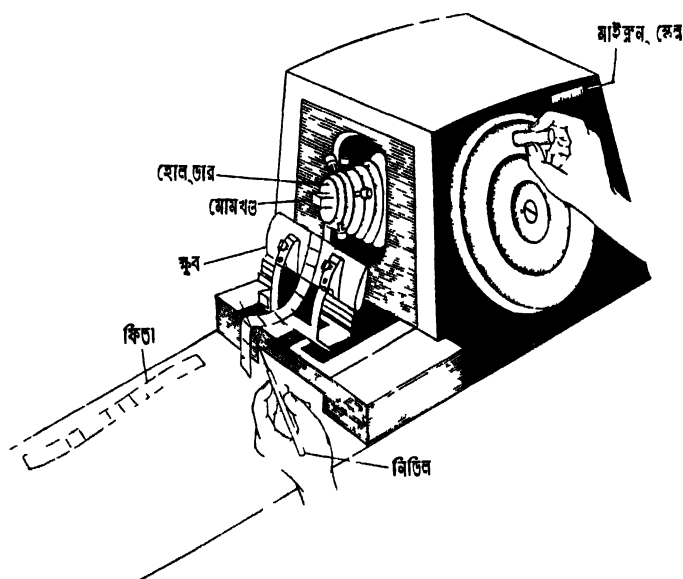
চিত্র—16b

মাইক্রোটোমের সাহায্যে সেকশন কাটার পদ্ধতি

রাখতে হয় যাতে ক্ষুরের সাথে ফিতাটা জড়িয়ে না যায় (চিত্র 16b)। ভালভাবে সেকশন কাটা হলে ফিতাটা সোজা হয়। কিন্তু অনেক সময় বাঁকা ফিতা দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হ'ল মোম খণ্ডের দুই পাশটা সমান্তরাল নয়। বস্তুটা অসমান ঘনত্বযুক্ত হ'লে কিম্বা মোম সমানভাবে না জমলেও বাঁকা ফিতার সৃষ্টি হতে পারে।

ফিতাগুলি একটা কাগজ বা কার্ডবোর্ডে রাখা হয়। ফিতাটাকে মাপ অনুযায়ী ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয় (চিত্র 16c)। পরিষ্কার স্লাইডে
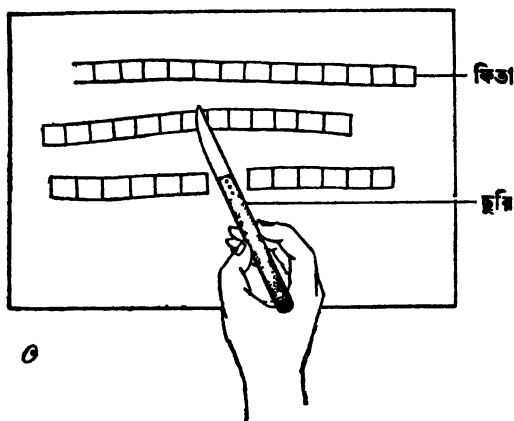
চিত্র—16c
ফিতাটাকে মাপ অনুযায়ী ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হচ্ছে

এক ফোঁটা *Mayer*-এর আঠা (*adhesive*) নিয়ে ঘষে সমস্ত স্লাইডে আঠাটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। স্লাইডে যথেষ্ট জল দেওয়ার পর এক
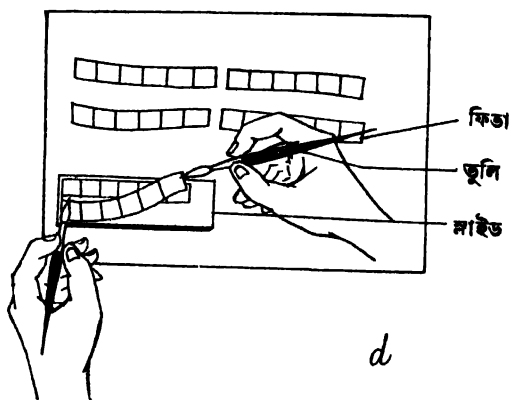
চিত্র—16d
স্লাইডে ফিতা রাখার পদ্ধতি

বা একাধিক ফিতা ঐ স্লাইডে রাখা হয় (চিত্র 16d, e)। স্লাইডটা জল সমেত একটা হট প্লেটের উপর অল্পক্ষণ রাখলে ফিতার কোঁচকান অংশ সোজা হয়ে যায়। এবার স্লাইডটা বাঁকা করে অতিরিক্ত জল ফেলে দেওয়া হয়।
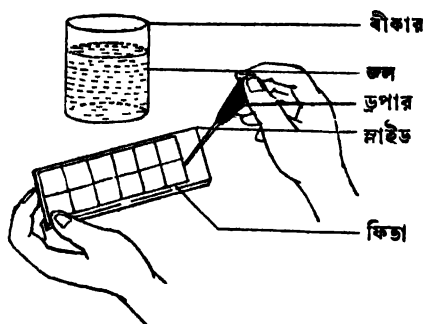
চিত্র—16e
স্লাইডে ফিতার অংশগুলি যথাযথভাবে সাজান হচ্ছে

মাইক্রোটোমের স্লাইড রঞ্জিত করার আগে জাইলল দিয়ে মোম সরিয়ে ফেলা দরকার। মোম সরাবার জন্য স্লাইডগুলি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থে নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়।

(a)	জাইলল (*xylol*) I এ	—	30 মিনিট
(b)	জাইলল II এ	—	15 ”
(c)	জাইলল-অ্যালকোহলে (1:1)	—	15 ”
(d)	অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলে (*absolute alcohol*)	—	15 ”
(e)	95 শতাংশ অ্যালকোহলে	—	15 ”
(f)	80 ” ”	—	5 ”
(g)	70 ” ”	—	15 ”
(h)	50 ” ”	—	5 ”
(i)	30 ” ”	—	5 ”
(j)	জল	—	5 ”

অ্যালকোহলে দ্রবীভূত রঞ্জক পদার্থ (*stain*) ব্যবহার করলে 70% অ্যাল-কোহল থেকেই স্লাইডটা ঐ রঞ্জক পদার্থে ডুবান হয়। জলীয় রঞ্জক পদার্থ

হেমাটোক্সিলিন (*hematoxylin*)

হেমাটোক্সিলিন *Hematoxylin campechianum* (*Leguminosae* গোত্রের উদ্ভিদ) থেকে পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদ প্রধানতঃ মেক্সিকো ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে পাওয়া যায়। *Hematoxylin campechianum*-এর কাঠের টুকরা জলে সেদ্ধ করার পর বাষ্পীভবন করে জলটা শুকিয়ে ফেলা হয়। শুষ্ক তলানিতে জল দিয়ে তলানি দ্রবীভূত করা হয়। এই তরল পদার্থকে ফিল্টার করে রেখে দিলে জলীয় দ্রবণ থেকে কেলাসগুলি আলাদা হয়ে যায়। হেমাটোক্সিলিনের রঙ করবার ক্ষমতা নাই। হেমাটোক্সিলিন অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হলে হেমাটিনে (*hematin*) পরিবর্তিত হয়। হেমাটিনের রঙ লালচে হলুদ ও এটা মরড্যান্টের সাথে রঙ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। হেমাটোক্সিলিনকে হেমাটিনে পরিবর্তিত করবার জন্য মাসাধিক কাল বাতাসের সংস্পর্শে রেখে দিতে হয়। তবে সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড বা সোডিয়াম আয়োডেট যোগ করলে এই পরিবর্তন দ্রুততর হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড (H_2O_2) যোগ করলে বেশী জারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। Johanson (1940) ও Emig (1941) ক্রোমোসোম রঙ করবার জন্য হেমাটোক্সিলিন ব্যবহার করেছিলেন। তারা ফেরিক অ্যালুমিনিয়াম সালফেট (*ferric aluminium sulphate*) মরড্যান্ট (*mordant*) হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়া পটাশ্ অ্যালামও (*potash alum*) মরড্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 1892 খৃষ্টাব্দে ক্রোমোসোম রঙ করবার জন্য Heidenhein প্রথম আয়রণ হেমাটোক্সিলিন প্রয়োগ করেছিলেন। এই রঙ দিয়ে রঞ্জিত নিউক্লীয়াস কাল দেখায়।

বেসিক ফুকসিন (*Basic fuchsin*)

ফুকসিন ট্রাইফিনাইল মিথেন (*triphenyl methane*) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হালকা লাল রঙ। প্যারারোসানিলিন (*pararosaniline*), রোসানিলিন (*rosaniline*) ও ম্যাজেন্টা II (*magenta II*) মিলিত হয়ে বেসিক ফুকসিন তৈরী করে। এই তিনটা পদার্থই স্নেহ দ্রব্যে (*fat*) দ্রবীভূত হয়। প্যারারোসানিলিন, রোসানিলিন ও মেজেন্টা দুইয়ের আনবিক ওজন যথাক্রমে হ'ল 328.815, 337.841 এবং 365.893। বেসিক ফুকসিনের সাথে সালফিউরাস অ্যাসিড মিশালে বর্ণহীন ফালগেন রঙ (*feulgen stain*) তৈরী হয়। কয়েক সিঃ সিঃ অ্যানিলিনের সাথে প্যারাটোলুডিনের (*paratoludin*) কয়েকটা ক্রিস্ট্যাল (কেলাস) ও মার-

কিউরাস ক্লোরাইড যোগ করে ঐ মিশ্রণকে ফুটিয়ে তারপর 70% অ্যালকোহলে ঢেলে বেসিক ফুকসিন তৈরী করা হয়।

মরড্যান্ট (*mordant*)

মরড্যান্ট রঙের সাথে মিলিত হয়ে একটা অদ্রবণীয় পদার্থ গঠন করে ও কোষে রঙকে স্থায়ী করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন পদার্থ মরড্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট (*crystal violet*), মিথাইল ভায়োলেট (*methyl violet*) ইত্যাদির জন্য আয়োডিন (*iodine*) ও পিকরিক অ্যাসিড (*picric acid*) মরড্যান্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কতকগুলি মরড্যান্ট হ'ল— 4% অ্যামোনিয়াম ক্রোমেট (*ammonium chromate*), 3% অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট (*ammonium dichromate*), 3—4% অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (*aluminium hydroxide*) বা অ্যালুমিনিয়াম পটাশিয়াম সালফেট (*aluminium potassium sulphate*), 1% পটাশিয়াম পারমাঙ্গেনেট (*potassium permanganate*), ট্যানিক অ্যাসিড (*tannic acid*) ইত্যাদি। এইসব মরড্যান্ট সাধারণতঃ 5—10 মিনিট ধরে ব্যবহার করা হয়। পরে অতিরিক্ত মরড্যান্ট জলে ধুয়ে ফেলা হয়। বেসিক বা ক্ষারধর্মযুক্ত রঙের জন্য অম্ল-ধর্মযুক্ত মরড্যান্ট এবং বেশীরভাগ অম্লধর্মযুক্ত রঙের জন্য সামান্য বেসিক বা ক্ষারধর্মযুক্ত মরড্যান্ট ব্যবহার করা হয়। অম্লধর্মযুক্ত রঙের জন্য 2%—4% বেরিয়াম ক্লোরাইড (*barium chloride*) ও ক্ষারমর্ধযুক্ত রঙের জন্য 4% সিলিকোটাঙগস্টিক অ্যাসিড (*silicotangstic acid*) ব্যবহৃত হয়।

রঞ্জিতকরণ (*staining*)

কোন বস্তুকে রঙের সাহায্যে রঞ্জিত করাকে রঞ্জিতকরণ বলে। কেবল একটা রঙের সাহায্যে কোন বস্তুকে রঙ করাকে সাধারণ রঞ্জিতকরণ এবং একাধিক রঙ ব্যবহার করে রঞ্জিত করাকে পার্থক্যমূলক রঞ্জিতকরণ (*differential staining*) বলে। এখানে রঞ্জিতকরণের কতকগুলি পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হ'ল।

1. ফালগেন পদ্ধতি (*Feulgen technique*)

Feulgen ও Rossenbeck (1924) এই পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করে-ছিলেন। ফালগেন রঙ দিয়ে কেবল ডি· এন· এ·কে রঞ্জিত করা যায়। সেজন্য কোথাও ডি· এন· এ·র উপস্থিতি জানবার জন্য ফালগেন রঙের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ফালগেন দ্রবণের প্রস্তুতিকরণ

[ফুটন্ত 100 সিঃ সিঃ পরিশুদ্ধ (*distilled*) জলে আস্তে আস্তে 0.5 গ্রাম বেসিক ফুকসিন (*basic fuchsin*) ঢেলে আগুন থেকে পাত্রটা সরিয়ে ফেলা হয়। দ্রবণটা 58°C তাপমাত্রায় ফিল্টার করে রিফ্রিজ্যারেটারে রেখে দেওয়া হয় এবং এটা ঠাণ্ডা হয়ে 26°C তাপমাত্রায় আসলে 10 সিঃ সিঃ N HCl যোগ করা হয়। পরে 0.5 গ্রাম পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট (*potassium metabisulphite*) দেওয়া হয়। এবার এই দ্রবণযুক্ত ফ্লাক্সটা ভাল করে বন্ধ করে মোম দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। ফ্লাক্সটা কাল কাগজ দিয়ে মুড়ে ঠাণ্ডা শুকনো জায়গায় সারারাত্রি রেখে দেওয়ার পরের দিন সামান্য পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট দিলে ফুকসিন রঙটা সালফার ডাই-অক্সাইডের (*sulpher dioxide*) প্রভাবে বর্ণহীন ফুকসিন সালফিউরাস অ্যাসিড বা ফালগেন দ্রবণে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু পটাসিয়াম মেটাবাই-সালফাইড দিয়েও দ্রবণটা বর্ণহীন না হলে 1 গ্রাম অ্যাকটিভেটেড চারকোল (*activated charcoal*) দিয়ে ভাল করে ঝেঁকে ফিলটার বা পরিস্রুত করলেই দ্রবণটা বর্ণহীন হয়ে যায়।]

ফালগেন দ্রবণ ব্যবহার করে ক্রোমোসোমকে রঞ্জিত করার পদ্ধতি

নূতন মূলের আগাগুলি অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইথাইল অ্যালকোহল মিশ্রণে (1:2) 30 থেকে 45 মিনিট ফিক্স করা হয়। এরপর 45% অ্যাসি-টিক অ্যাসিডে 5—10 মিনিট রাখা হয়। N HCl-এ 56°C তাপমাত্রায় 12 মিনিট রেখে হাইড্রোলাইসিস (*hydrolysis*) করার পর জলে ধুয়ে ফেলা হয়। তারপর ফালগেন দ্রবণে আধা থেকে দেড় ঘণ্টা রাখা হয়।

মূলতত্ত্ব

ফালগেন দ্রবণ দিয়ে রঞ্জিতকরণ অ্যালডিহাইডের (*aldehyde*) শিফের বিক্রিয়ার (*Schiff's reaction*) উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলগুলি N HCl (নরম্যাল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) দিয়ে হাইড্রোলাইসিস করলে পিউরিন বেসগুলি (*purine base*) শর্করা থেকে আলাদা হয়ে যায় ও এর ফলে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (CHO) মুক্ত হয়। এই অ্যালডিহাইড ও ফুকসিন সালফিউরাস অ্যাসিডের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে রঙের সৃষ্টি হয়। Lea ও Stacy (1949) বলেন যে এইভাবে বিক্রিয়া হয় না। প্রাণীতে তাঁরা দেখতে পান যে কম সময় ধরে হাইড্রোলাইসিস করলে ক্রোমোসোমগুলি রঙ নিলেও কোন মুক্ত বেস পাওয়া যায় না। কিন্তু বেশী সময় ধরে হাইড্রো-লাইসিস করলে ক্রোমোসোমগুলি গাঢ় রঙ নেয় ও মুক্ত বেস পাওয়া যায়। Lea ও Stacy বলেন যে ফালগেন বিক্রিয়া দুইটা ধাপে হয়। প্রথম ধাপে

নিউক্লীওটাইডের মধ্যবর্তী সংযোগ ভেঙে যায় এবং শর্করার অ্যালডিহাইড গ্রুপ ও ফালগেন রঙের মধ্যে বিক্রিয়া হয়। দ্বিতীয় ধাপে অনেকক্ষণ হাইড্রোলাইসিসের ফলে বেসগুলি মুক্ত হয়। আরও অ্যালডিহাইড গ্রুপ ও ফালগেনের মধ্যে বিক্রিয়া হয় ও রঙটা গাঢ় দেখায়। সুতরাং Lea ও Stacy-র মতে ফালগেন দ্রবণ দিয়ে রঞ্জিতকরণের মৌলিক তথ্য বেশ জটিল। Stedman ও Stedman বলেন যে হাইড্রোলাইসিসের পর ফালগেন দ্রবণ যোগ করলে নিউক্লীওপ্লাজমে বিক্রিয়া হয়। এই বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট রঞ্জক পদার্থ ক্রোমোসোমের ত্বকে সঞ্চিত হয়। কিন্তু পরে Danielli বলেন যে ফালগেন বিক্রিয়া যথাযথভাবে হলে কেবল ক্রোমোসোমই রঞ্জিত হয় এবং অন্যান্য অংশ সম্পূর্ণভাবে বর্ণহীন থাকে। এর থেকেই ফালগেন পরীক্ষার বৈধতা প্রমাণিত হয়। হাইড্রোলাইসিস কম সময় ধরে করলে সাইটোপ্লাজমটা কিছু পরিমাণে রঞ্জিত দেখায় কারণ কম সময় হাইড্রোলাইসিস করে সাইটোপ্লাজমের সব মুক্ত অ্যালডিহাইড দূর করা যায় না। আবার বেশীক্ষণ ধরে হাইড্রোলাইসিস করলে সাইটোপ্লাজমটা রঞ্জিত দেখায় কারণ এরফলে সম্পূর্ণ নিউক্লীওটাইড প্রোটীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই মুক্ত নিউক্লীওটাইড সাইটোপ্লাজমে আসে ও ঐখানে ফালগেন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া হয়।

2. অরসিনের সাহায্যে ক্রোমোসোমকে রঞ্জিত করার পদ্ধতি

নূতন, সতেজ মূলের আগাগুলি কেটে জলে ধুয়ে প্রি-ট্রিটমেন্ট (*pre-treatment*) করা হয়। বিভিন্ন পদার্থ যেমন প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন (P.D.B.), এসকুলিন (*aesculine*), অক্সিকুইনোলিন (*oxyquinoline*), কলচিসিন (*colchicine*) ইত্যাদি প্রি-ট্রিটম্যান্ট করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কোন উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে প্রি-ট্রিটম্যান্টের জন্য কোন পদার্থ ব্যবহার করা হবে তা নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া কত ডিগ্রী তাপমাত্রায় ও কতক্ষণ ধরে প্রি-ট্রিটম্যান্ট করা হবে তা নির্দিষ্ট উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। এইজন্য বারবার পরীক্ষা করে কোন উদ্ভিদের জন্য যথাযথ প্রি-ট্রিটম্যান্ট করবার পদার্থ নির্বাচিত করতে হয়। অনেক সময় ক্রোমোসোম খুব ছোট ও অসংখ্য হ'লে ছড়ান মেটাফেজ প্লেট (*plate*) পাওয়া যায় না, সেজন্য কখনো কখনো 0.01% কলচিসিনে মূলের অগ্রভাগ তিন ঘণ্টার চেয়ে কম সময় রাখা হয়। এছাড়া হঠাৎ ঠাণ্ডা প্রয়োগ করেও মেটাফেজে ক্রোমোসোমগুলি ছড়ান অবস্থায় দেখা যায়। পাতায় বেশী হারে মেটাফেজ প্লেট পাওয়ার জন্য অনেক সময় অগ্র মুকুল কেটে 0.2% কলচিসিনে 1—2 ঘণ্টা আলোতে রাখা হয় (Meyer 1943)।

প্রি-ট্রিটম্যান্টের পর মূলগুলি জলে ধুয়ে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের মিশ্রণে (1:2) ফিক্স করা হয়ে থাকে। এরপর মূলগুলি অরসিন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে (2% অ্যাসিটো অরসিন* ও নরম্যাল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড 9:1 অনুপাতে) 5 থেকে 10 সেকেন্ড সামান্য গরম করা হয়। এই মিশ্রণে মূলগুলি এক ঘণ্টা বা বেশী সময় রেখে 45 শতাংশ অ্যাসিটিক অ্যাসিডে স্কোয়াশ করা হয়।

[*অ্যাসিটো অরসিন তৈরী করার পদ্ধতি—100 সিঃ সিঃ 45 শতাংশ অ্যাসিটিক অ্যাসিডে 2 গ্রাম অরসিন দ্রবীভূত করে ঐ দ্রবণকে ফিলটার করে 2% অ্যাসিটো অরসিন তৈরী করা হয়।]

মাইক্রোটোমের সাহায্যে কাটা সেকশন বিভিন্ন পদ্ধতিতে রঙ করা হয়।

3. ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট (*crystal violet*) পদ্ধতি

Newton (1927) এই পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

একগ্রাম ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট 100 সিঃ সিঃ পরিশুদ্ধ গরম জলে ঢেলে তারপর ফিলটার করে ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট তৈরী করা হয়। মরড্যান্ট হিসাবে পটাশিয়াম আয়োডাইড ও আযোডিন ব্যবহার করা হয়। 80% অ্যালকোহলে একগ্রাম পটাশিয়াম আয়োডাইড (KI) এবং একগ্রাম আয়োডিন দ্রবীভূত করে মরড্যান্ট তৈরী করা হয়। ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট পদ্ধতিতে রঙ করলে ক্রোমোসোমগুলি রঙ নেয় এবং সাইটোপ্লাজম স্বচ্ছ দেখায়। স্লাইডগুলিকে মোম সরাবার পর জল থেকে তুলে নীচের বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন তরল পদার্থে নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়।

(a) ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেট দ্রবণ — 20 মিনিট বা বেশী
(b) জলে ধোয়া হয়
(c) পটাশিয়াম আয়োডাইড আয়োডিন দ্রবণ — 45 সেকেন্ড
(d) অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল I — 3—4 বার ডুবান হয়
(e) " " II — " "
(f) " " III — " "
(g) ক্লোভ অয়েল দিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে স্লাইডগুলি বাছা হয়।
(h) ক্লোভ অয়েল II — 5 মিনিট
(i) জাইলল I — 20—30 মিনিট
(j) জাইলল II — 30 মিনিট
(k) জাইলল III — 30 মিনিট
(l) কানাডা বালসাম দিয়ে কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয়।

কানাডা বালসাম মাধ্যম অম্ল হওয়ায় ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেটে রঞ্জিত ক্রোমোসোমের রঙ কিছুদিন রাখলে হালকা হয়ে যায়। Smith-এর (1934) মতে রঙ করার পর স্লাইডটা অ্যালকোহলে সংপৃক্ত (*saturated*) পিকরিক অ্যাসিডে ডুবালে ক্রিস্ট্যাল ভায়োলেটের রঙ স্থায়ী হয়।

4. Kautmann-এর **আয়রণ—হেমাটোক্সিলিন পদ্ধতি**

স্মিয়ার করার পর নাভাসিন (*Navaschin*) দ্রবণ বা ক্রোমো-অসমো-অ্যাসিটিক অ্যাসিডে ফিক্স করা হয়। স্লাইডগুলি জলে ধোয়ার পর নীচের তরল পদার্থগুলিতে নির্দিষ্ট সময় রেখে রঞ্জিত করা হয়।

(a) 2% ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেটে এক ঘণ্টা রাখা হয়।
(b) প্রবহণশীল জলে ধোয়া হয়।
(c) 0.5% হেমাটোক্সিলিনে এক ঘণ্টা বা তারচেয়ে বেশী সময় রঙ করা হয়।
(d) জলে ধোয়া হয়।
(e) 2% ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেটে অতিরিক্ত রঙটা ধুয়ে ফেলা হয়।
(f) প্রবহণশীল জলে দেড় ঘণ্টা ধোয়া হয়।

(g)	30% অ্যালকোহলে	—	2—3 মিনিট রাখা হয়।
(h)	50% "	—	5 " " "
(i)	70% "	—	5 " " "
(j)	80% "	—	5 " " "
(k)	90% "	—	5 " " "
(l)	অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলে	—	5 " " "
(m)	অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল, জাইললে (3.1)	—	5 " " "
(n)	" " " (1:1)	—	5 " " "
(o)	" " " (1:3)	—	5 " " "
(p)	বিশুদ্ধ জাইললে	—	5—10 " " "

(q) কানাডা বালসাম দিয়ে কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয়।

5. **লাইট গ্রীনের** (*light green*) **সাথে ফালগেন পদ্ধতি**

ফালগেন দ্রবণে 45 মিনিট থেকে 1 ঘণ্টা রঙ করার পর নীচের বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন পদার্থে রাখা হয়।

(a)	30 শতাংশ অ্যালকোহলে	—	5 মিনিট রাখা হয়।
(b)	50 " "	—	5 " " "
(c)	70 " "	—	5 " " "
(d)	80 " "	—	5 " " "

চতুর্থ অধ্যায়

কোষ (Cell)

সব জীবদেহই কোষ দিয়ে গঠিত। যেসব উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহে কেবল একটা কোষ থাকে তাদের এককোষী (*unicellular*) জীব বলে। অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে তৈরী বলে এদের বহু-কোষী (*multicellular*) জীব বলে।

কোষের আকার বিভিন্ন ধরণের হয়। এককোষী জীবের কোষ সাধারণতঃ গোল বা ডিম্বাকৃতির হয়। তবে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটিরিয়ায় লম্বাটে বা সর্পিল আকারের কোষ দেখা যায়। অ্যামিবায় কোষের আকৃতি বারবার পরিবর্তিত হয়। *Acetabularia*-র (এককোষী শৈবাল) কোষটা
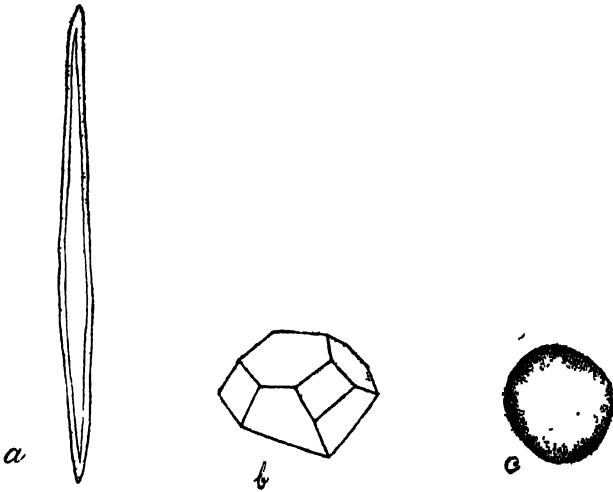
চিত্র 17a—c

বিভিন্ন আকৃতির কোষ a—লম্বাটে; b—বহুতলক এবং c—গোলাকার

একটা সবৃন্তক টুপির মত (চিত্র 17d)। ঐ বৃন্তের নীচের দিকে একটা রাইজয়েড (*rhizoid*) থাকে। বহুকোষী জীবের দেহে নানা রকমের কোষ থাকে। বহুকোষী প্রাণীর স্নায়ু কোষে শাখা-প্রশাখা দেখা যায়। সাধারণতঃ বহু-কোষী উদ্ভিদের কোষ ঘনক (*cubical*), লম্বাটে বা বহুতলক (*poly-hedral*) (চিত্র 17a, b) হয়। এর মাঝামাঝি অনেক রকম আকৃতির কোষ

দেখা যায়, যেমন গোলাকার (চিত্র 17c), সূচ্যকার, উপবৃত্তাকার, ডিম্বাকার, চাকতির বা পিপার আকারের ইত্যাদি। কোষের আকার প্রধানতঃ এর কাজের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া পাশের কোষের চাপে অনেক সময় কোষ বহুতলক হয়।

কোষের আয়তন বিভিন্ন রকমের হয়। কোষের আকারের সাথে আয়তনের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। কোন কোন ব্যাকটিরিয়ার কোষ ও ভাইরাসের আয়তন 0.1μ থেকে 1μ পর্যন্ত হয়। তবে উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে এত ছোট কোষ দেখা যায় না। বহুতলক কোষের ব্যাস গড়ে 10μ থেকে 100μ হয়। তবে এর চাইতে বড় বা ছোট কোষও দেখতে পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর
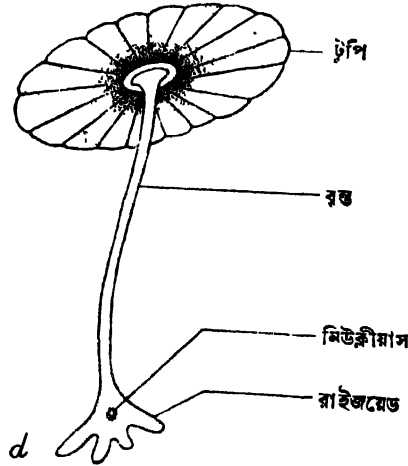
চিত্র 17d
এককোষী শৈবাল *Acetabularia*

উদ্ভিদের আঁশ বা তন্তু (*fibre*) সচরাচর 1–8 মিঃ মিঃ লম্বা হয়। কিন্তু কোন কোন উদ্ভিদের যেমন আরটিকেসী (*Urticaceae*) গোত্রের তন্তু বা আঁশ 550 মিঃ মিঃ পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রাণীর ডিম (কয়েক ইঞ্চি পর্যন্ত ব্যাসযুক্ত) জীব জগতের অন্যান্য কোষের তুলনায় বেশ বড়। প্রত্যেক উদ্ভিদ কোষে সজীব প্রোটোপ্লাস্টের চারিদিকে একটা কোষ প্রাচীর থাকে (চিত্র 18)। কোষ প্রাচীরের তুলনায় প্রোটোপ্লাজমের গুরুত্ব অনেক বেশী কারণ এখানেই কোষের সবরকম প্রয়োজনীয় কাজ হয়। নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজমকে একসাথে প্রোটোপ্লাজম (*protoplasm*) বলা হয়।
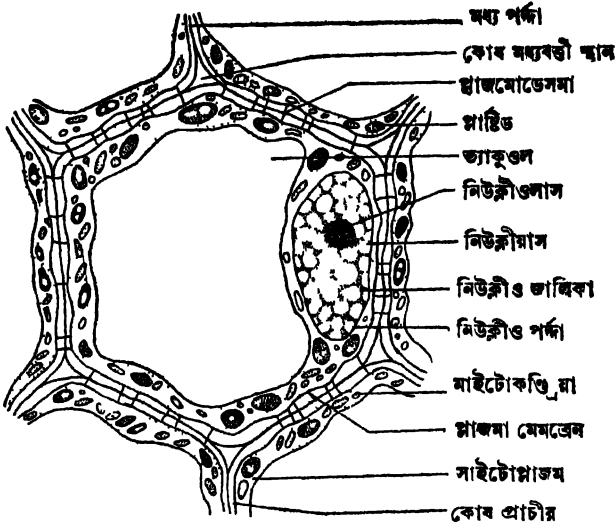
চিত্র 18
উজ্জ্বলক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা উদ্ভিদ কোষের গঠন

নিম্নশ্রেণীর কোন কোন উদ্ভিদে, উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের জনন কোষে এবং প্রাণীর কোষে কোন কোষ প্রাচীর থাকে না। ভাইরাসে কোন প্রকৃত কোষ নেই। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের পরিণত সীভ (*seive*) নালীতে নিউক্লীয়াস থাকে না। আবার সিনোসাইটিক (*cenocytic*) দেহযুক্ত কিছু শৈবাল ও ছত্রাকে অসংখ্য নিউক্লীয়াস থাকে। ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবালে (*blue-green algae*) অন্য জীবের মত সুগঠিত নিউক্লীয়াস থাকে না (চিত্র 19)। এইসব কোষকে প্রোক্যারিওট (*prokaryote*) কোষ বলে। প্রোক্যারিওট কোষে সুগঠিত নিউক্লীয়াস না থাকলেও এখানে নিউক্লীও পদার্থ (ডি এন এ·) থাকে। নীলাভ সবুজ শৈবালে নিউক্লীয়াসের বদলে 'সেন্ট্রাল বডি' (*central body*) দেখা যায়। ব্যাকটিরিয়ার কোষে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও মাইটোকণ্ড্রিয়া নাই। প্রোক্যারিওট কোষে নিউক্লীয়ার মেমব্রেন না থাকায় নিউক্লীও পদার্থের সাথে সাইটোপ্লাজমের প্রত্যক্ষ যোগ থাকে। ইউক্যারিওট কোষে রাইবোসোমগুলি সাধারণতঃ এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে যুক্ত থাকে। কিন্তু প্রোক্যারিওট কোষে এগুলি সাইটোপ্লাজমে মুক্তভাবে থাকে। ইউক্যারিওট কোষে ডি· এন· এ· বেসিক প্রোটীন হিস্টোনের সাথে যুক্ত থাকে, কিন্তু প্রোক্যারিওট কোষে হিস্টোন পাওয়া যায় না।
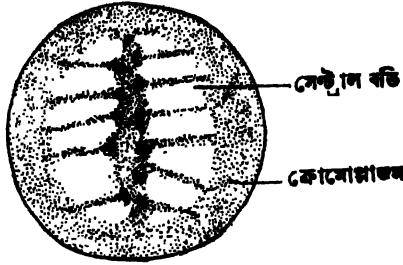
চিত্র 19
নীলাভ সবুজ শৈবালের (*blue green algae*) কোষ

কোষ প্রাচীর

সব উদ্ভিদ কোষে প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরের দিকে কোষ প্রাচীর থাকে। তবে নিম্নশ্রেণীর কোন কোন উদ্ভিদে এবং উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের জনন কোষে কোষ প্রাচীর থাকে না। কোষ প্রাচীর সাইটোপ্লাজম থেকে তৈরী, কিন্তু এটা সজীব নয়। কোষ প্রাচীর প্রোটোপ্লাস্টকে রক্ষা করে এবং কোষকে দৃঢ় করে। কোষের নির্দিষ্ট আকার কোষ প্রাচীরের জন্যই সম্ভব। কোষ প্রাচীর সূক্ষ্ম বা স্থূল, মসৃন কিম্বা অমসৃন হয়। এই প্রাচীর সাধারণতঃ সেলুলোজ দিয়ে তৈরী। তবে এখানে লিগনিন, পেক্‌টিন, সুবারিন, মিউ-সিলেজ, মোম কিম্বা বিভিন্ন ধরণের লবণ থাকতে পারে।

একটা পরিণত কোষের প্রাচীরে দুইটা অংশ থাকে—প্রাইমারী বা প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী বা পরবর্তী কোষ প্রাচীর। দুইটা পাশাপাশি কোষ মিডিল ল্যামেলা বা মধ্যপর্দার সাহায্যে পরস্পর যুক্ত থাকে। সেকেন্ডারী কোষ প্রাচীর গঠনের সময় কোন কোন জায়গায় ঐ প্রাচীর তৈরী হয় না। ঐসব অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্ম প্রোটোপ্লাজমীয় সূত্র এক কোষ থেকে অন্য কোষে যায়। এই সব সূত্রকে প্লাজমোডেসমাটা (*plasmodesmata*) বলে। প্লাজমোডেসমাটা বিভিন্ন কোষের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে।

প্লাজমা মেমব্রেন (*plasma membrane*)

প্রোটোপ্লাজমের বাইরের সীমানা নির্দেশকারী পর্দাকে প্লাজমা মেমব্রেন বলে। উদ্ভিদের কোষে এই পর্দা কোষপ্রাচীরের ভিতরের দিকে থাকে, কিন্তু প্রাণী কোষে কোন কোষপ্রাচীর না থাকায় প্লাজমা মেমব্রেনই কোষের আকার নিয়ন্ত্রণ করে। 1855 খৃষ্টাব্দে Nageli প্রথম প্লাজমা মেমব্রেন

নামকরণ করেন। এই পর্দাকে কোষ পর্দা বা প্লাজমালেমাও (*plasma-lemma*) বলা হয়। প্লাজমা মেমব্রেন সজীব কোষের কার্যকরী অংশ ও এটা কোষের (প্রাণী কোষের) আকার নিয়ন্ত্রণ করে, কোষকে রক্ষা করে, কোষের সারফেস টেনশন (*surface tension*) বা পৃষ্ঠ টান বাড়ায়, কোষে
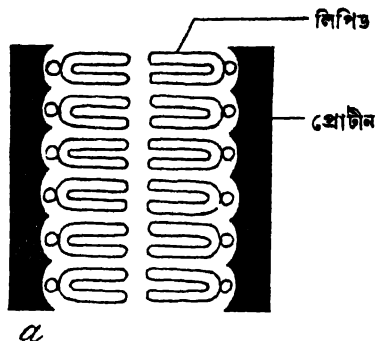
চিত্র 20a
প্লাজমা মেমব্রেনের গঠন

কোন বস্তুর প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। প্লাজমা পর্দার নির্বাচিত ভেদ্যতা (*selective-permeability*) দেখা যায়, অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে নির্বাচিত বস্তু কোষে প্রবেশ করতে পারে। এই পর্দার প্রস্থ 75Å- 150Å ও এটা লিপিড ও প্রোটীন দিয়ে তৈরী। প্রোটীন অংশ পর্দাটাকে স্থিতিস্থাপক (*elastic*) করে। প্লাজমা মেমব্রেনে লিপিডের দ্বি-আনবিক স্তরের (*bimolecular layer*) চারিদিকে প্রোটীনের আবরণ থাকে। এখানে প্রোটীনের চেয়ে লিপিডের পরিমাণ কম থাকে। Robertson ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্লাজমা মেমব্রেনে তিনটি স্তর দেখতে পান (চিত্র 20a)। দুই পাশের স্তর দুইটা অস্বচ্ছ ও প্রোটীন দিয়ে তৈরী। মাঝের স্তরটা মোটামুটি স্বচ্ছ ও লিপিড দিয়ে গঠিত। প্রোটীনের প্রত্যেক স্তর 20Å ও লিপিডের স্তর 35Å চওড়া। কোষের অভ্যন্তরের বিভিন্ন পর্দার গঠন মূলতঃ প্লাজমা পর্দারই মত, অর্থাৎ এগুলিও প্রোটীন-লিপিড-প্রোটীন দিয়ে তৈরী। সে-জন্য এই পর্দাকে Robertson (1959) ইউনিট মেমব্রেন (*unit membrane*) নাম দিয়েছেন। অসমোটিক চাপ (*osmotic pressure*) সম্বন্ধে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন যে প্লাজমা মেমব্রেনে কিছু খুব ছোট ছোট (80Å ব্যাসযুক্ত) ছিদ্র (*pore*) থাকে। অনেক সময় এই পর্দা কোন কোন স্থানে ভাঁজ হয়ে থাকে। এই ভাঁজকে

মাইক্রোভিলাই (*microvilli*) বলে (চিত্র 20b)। ভাঁজ অংশগুলি সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ঝুলে থাকে ও শোষণের মাত্রা বাড়ায়।
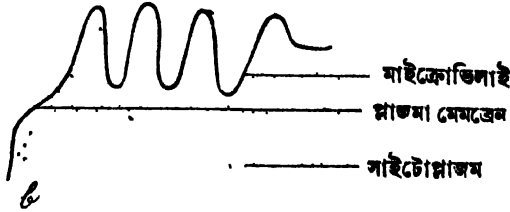
চিত্র 20b
প্লাজমা মেমব্রেনের কোন কোন জায়গায় ভাঁজ হওয়ার ফলে মাইক্রোভিলাই-এর সৃষ্টি হয়েছে

প্রোটোপ্লাজম (*protoplasm*)

কোষ প্রাচীর ছাড়া কোষের বাকী সব অংশকে একসাথে প্রোটোপ্লাজম বলে। তবে ভ্যাকুওলকে এর মধ্যে ধরা হয় না। প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক গঠন জটিল। সাধারণতঃ প্রোটোপ্লাজমে 75 শতাংশ জল থাকে। কিন্তু জলজ উদ্ভিদে এই পরিমাণ 95 শতাংশ পর্যন্ত হয়। রেণু ও সুপ্ত বীজে (*dormant seed*) জলের পরিমাণ মাত্র 10—15%। প্রোটোপ্লাজমের শুষ্ক ওজনের 90% জৈব পদার্থ ও 10% অজৈব পদার্থ। জৈব পদার্থের মধ্যে প্রোটীন, লিপিড (স্নেহ পদার্থ), কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এইসব উপাদানের মধ্যে প্রোটীনই প্রধান। প্রোটোপ্লাজমে বিভিন্ন রকমের অজৈব লবণ (যেমন ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির ক্লোরাইড, সালফেট, ফসফেট, কার্বোনেট) থাকে।

প্রোটোপ্লাজম স্বচ্ছ, দানাদার, স্থিতিস্থাপক, জেলীর মত কোলয়ডীয় পদার্থ। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব (*specific gravity*) জলের চেয়ে কিছু বেশী। উত্তাপ, বিদ্যুৎ প্রবাহ ও বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ করলে প্রোটোপ্লাজমে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়াকে ইরিটেবিলিটি (*irritability*) বলে। কোন কোন সময় প্রোটোপ্লাজমে বিভিন্ন রকমের প্রবাহ দেখা যায়, যেমন—প্রবাহ গতি, আবর্তন গতি ইত্যাদি।

প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লীয়াস বাদ দিলে যে অংশটা থাকে তাকে সাইটোপ্লাজম (*cytoplasm*) বলে। অপরিণত কোষের বেশীর ভাগ অংশলেই সাইটোপ্লাজম থাকে। উদ্ভিদ কোষ বড় হবার সময় অনেক ছোট ছোট সাইটোপ্লাজমবিহীন অঞ্চল (ভ্যাকুওল) দেখা দেয় যা পরে মিলিত হয়ে কোষের
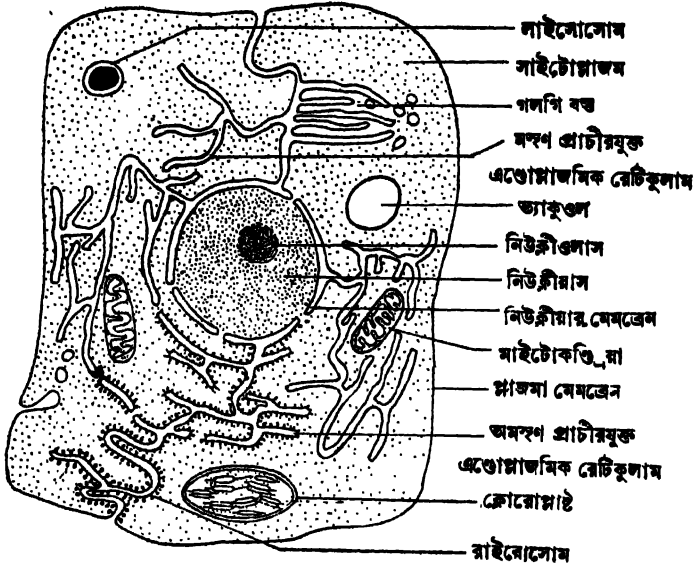
চিত্র 21
ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা একটা আদর্শ কোষের গঠন

মাঝখানে একটা বড় ভ্যাকুওল (*vacuole*) গঠন করে। কোষের ভিতর জালের আকারে অনেক সূক্ষ্ম নালিকা ছড়ানো থাকে। এই জালিকাকার নালিকা-গুলিকে (*canals*) এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (*endoplasmic reticulum*) বলা হয়। Porter (1947) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন। এছাড়া সাইটো-প্লাজমে বিভিন্ন বস্তু যেমন মাইটোকণ্ড্রিয়া, রাইবোসোম, প্লাষ্টিড, গলগি বস্তু ইত্যাদি পাওয়া যায় (চিত্র 18, 21)।

ভ্যাকুওল (*vacuole*)

সব উদ্ভিদের কোষেই ভ্যাকুওল দেখা যায়। ভ্যাকুওল বিভিন্ন আয়তনের হয়। দ্রুত বিভাজনশীল কোষে ভ্যাকুওলগুলি ছোট থাকে। সাধারণতঃ পরিণত উদ্ভিদ কোষে বেশীরভাগ স্থান জুড়ে বড় ভ্যাকুওল (চিত্র 18) দেখা যায়। ভ্যাকুওলের মধ্যের কোষ রসে বিভিন্ন পদার্থ থাকে। এইসব পদার্থ-গুলি হ'ল—জৈব অ্যাসিড (*organic acid*), শর্করা, বিভিন্ন ধরণের রঞ্জক পদার্থ, অজৈব লবণ ইত্যাদি। ভ্যাকুওলে নানা রকমের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকে, তাছাড়া কোষের অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থগুলিও (*excretory*

substance) ভ্যাকুওলে জমা হয়। ফুল, ফল, পাতা কিম্বা কখনও কখনও কাণ্ডের রঙ ভ্যাকুওলের রঞ্জক পদার্থের জন্য হয়ে থাকে। জলে দ্রবণীয় অ্যান্থোসায়ানিন (*anthocyanin*) এই রঞ্জক পদার্থের অন্যতম। কোষের pH-এর উপর নির্ভর করে অ্যান্থোসায়ানিন লাল, বেগুনী কিম্বা নীল রঙের সৃষ্টি করে।

ভ্যাকুওল কোষের রসস্ফীতি (*turgor*) বজায় রাখে ও ছোট ছোট গাছকে সোজা থাকতে সাহায্য করে।

কোন কোন নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীতে সঙ্কোচক বা কন্ট্রাকটাইল ভ্যাকুওল (*contractile vacuole*) থাকে। এই ভ্যাকুওলগুলি পর্যায়-ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় ও এইভাবে কোষের বর্জ্য পদার্থগুলিকে কোষ থেকে বের করে দেয়।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (*endoplasmic reticulum*)

Porter ও তাঁর সহকর্মীরা (1945 ও 1947) সাইটোপ্লাজমে কিছু জালিকাকার নালিকা (*canals*) দেখতে পান এবং তাঁরা এর এন্ডো-প্লাজমিক রেটিকুলাম (চিত্র 21) নাম দেন। এইসব নালিকা দ্বিস্তরযুক্ত ইউনিট মেমব্রেন বা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। বিভিন্ন নালিকাগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে সাধারণতঃ একটা অবিচ্ছিন্ন জালের সৃষ্টি করে। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সাইটোপ্লাজমের দুইটা *phase* বা অবস্থাকে আলাদা করে রাখে। এই দুইটা অবস্থা হ'ল— (a) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের নালিকার ভিতরের পদার্থ, (b) নালিকাগুলির বাইরে সাইটোপ্লাজমীয় ম্যাট্রিক্স। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেন লিপিড ও প্রোটীন দিয়ে তৈরী। লিপিড অণুর দুইটা স্তরের দুই পাশে প্রোটীনের স্তর থাকে। এই মেমব্রেন 50—60μ চওড়া হয়।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তিন রকমের (চিত্র 22a, b, c) হয়, যেমন— (1) ল্যামেলা বা সিস্টারনা (*lamella* বা *cisterna*); (2) ভেসিকেল (*vesicle*); (3) টিউবিউল (*tubule*)। ল্যামেলাগুলি লম্বা ও চ্যাপ্টা হয় ও পর পর সমান্তরালভাবে সাজান থাকে। এরা 50—40 mμ পুরু হয়। ভেসিকেলগুলি মোটামুটি গোল ও এদের ব্যাস 25—500 mμ। টিউবিউলের আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয় ও এদের ব্যাস 50—100 mμ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোন কোষে এই তিন ধরনের এন্ডোপ্লাজমিক রেটি-কুলাম (ল্যামেলা, ভেসিকেল, টিউবিউল) একই সাথে দেখা যেতে পারে কিম্বা এরা কোষের পরিণতির ভিন্ন ভিন্ন সময় দেখা যায়। কোন কোন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেনের বহির্গাত্রে কিছু
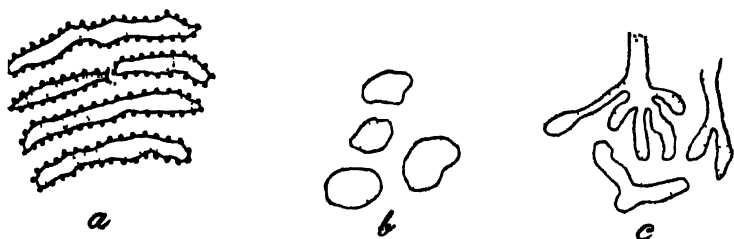
চিত্র 22
এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের বিভিন্ন উপাদান।
a-ল্যামেলা বা সিস্টারনা, b-ভেসিকেল, c-টিউবিউল।

খুব ছোট ছোট দানার (*granule*) মত বস্তু থাকে। এই বস্তুগুলিকে রাইবোসোম (*ribosome*) বলা হয়। রাইবোসোমে প্রচুর পরিমাণে R. N. A. থাকে এবং প্রোটীন উৎপাদনে এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এদের ব্যাস 100—150Å। সাধারণতঃ এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সিস্টারনা বা ল্যামেলার বহির্গাত্রেই রাইবোসোম থাকে। রাইবোসোম থাকায় এদের বহির্গাত্র অমসৃন হয় ও এদের অমসৃন প্রাচীরযুক্ত এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে। যেসব কোষ প্রোটীন উৎপাদনে সক্রিয় অংশ নেয় সেখানে অমসৃন প্রাচীরযুক্ত এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেখা যায়। যেসব এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেনের সাথে রাইবোসোম যুক্ত থাকে না তাদের মসৃন প্রাচীরযুক্ত এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে। সাধারণতঃ টিউবিউলের প্রাচীর মসৃন হয়। গ্রন্থির (*gland*) কোষ, স্নায়ু কোষ ইত্যাদিতে মসৃন প্রাচীরযুক্ত এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেখা যায়।

প্রোটীন উৎপাদনে অমসৃন প্রাচীরযুক্ত এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেনের সাথে বিভিন্ন এনজাইম যুক্ত থাকে এবং এইসব এনজাইমগুলি কোষের বিভিন্ন বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। সেইজন্য এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেন অঞ্চলেই কোষের নানা রকম মেটাবলিক (*metabolic*) কাজ সাধিত হয়। এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকলামের নালিকার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষরিত (*secretory*) বস্তু সঞ্চিত হয়ে থাকে। এইসব নালিকার মধ্যে দিয়ে কোষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিম্বা কোষ থেকে কোষের বাইরে বিভিন্ন পদার্থ যেতে পারে। মনে করা হয় যে স্নায়ু ও পেশীর কোষে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম উত্তেজনা (*impulse*) চলাচলে সাহায্য করে। নিউক্লীয়ার মেমব্রেন গঠনে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের বিশেষ ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে। কোষ

বিভাগের প্রফেজের শেষে নিউক্লীয়ার মেমব্রেন ভেঙ্গে গিয়ে ছোট ছোট ল্যামেলা ও ভেসিকেল তৈরী করে। এদের তখন এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে আলাদা করে চেনা যায় না, এগুলি তখন কোষের ধারের দিকে চলে যায়। টেলোফেজে যখন ক্রোমোসোমগুলি মেরুতে এসে জমা হয় তখন এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কিছু উপাদান মেরুতে আসে ও নিউ-

চিত্র 23
এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে নিউক্লীয়ার মেমব্রেনের সৃষ্টি
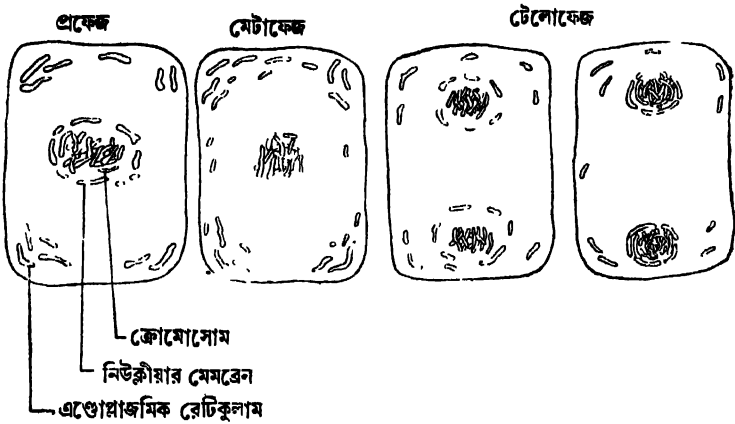
ক্লীয়ার মেমব্রেন গঠন করে (চিত্র 23)। আগের নিউক্লীয়ার মেমব্রেনের ভাঙ্গা অংশগুলি নূতন মেমব্রেন গঠনের সময় কখনও কখনও অংশ নেয়। এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও নিউক্লীয়ার মেমব্রেনের সাদৃশ্য এবং আপাত অবিচ্ছিন্নতা থেকে মনে করা হয় যে নিউক্লীয়ার মেমব্রেন এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের পরিবর্তিত অবস্থা কিম্বা এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কোন কোন উপাদানের উৎপত্তি নিউক্লীয়ার মেমব্রেন থেকেই হয়েছে। উভচর প্রাণীর ভ্রূণের উপর পরীক্ষা থেকে মনে করা হয় যে অপরিণত কোষে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নিউক্লীয়ার মেমব্রেন থেকেই সৃষ্টি হয়।

লাইসোসোম (*lysosome*)

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যকৃতের কোষে কিছু গোলাকার ঘন অন্তস্থলযুক্ত বস্তু (*dense body*) দেখা গিয়েছিল এবং এদের প্রথমে 'পেরিক্যানালিকিউলার ডেন্স বডিজ' (*pericanalicular dense bodies*)

নাম দেওয়া হয়েছিল কারণ এগুলি পিওনালিকার পরিসীমায় থাকে। deDuve-এ 1955 খৃষ্টাব্দে এদের লাইসোসোম (অর্থাৎ *digestive body* বা পরিপাককারী অঙ্গ) নাম দেন কারণ এখানে পরিপাক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নানা রকম এনজাইম থাকে। যকৃত ছাড়া কিডনী (বৃক্ক), মস্তিষ্ক, থাইরয়েড গ্রন্থির কোষে, প্রোটোজোয়ায় এবং ইষ্ট প্রভৃতি কোন কোন উদ্ভিদে লাইসোসোম পাওয়া গিয়েছে। যেসব কোষে পরিপাক কাজ সম্পন্ন হয় সেখানে অনেক লাইসোসোম দেখা যায়। লাইসোসোম সাধারণতঃ গোলাকার, কিন্তু এদের আকৃতির যথেষ্ট তারতম্য হয়। এদের ব্যাস 0.25μ —0.8μ হয়। তবে কিডনীর কোষে 5μ ব্যাসযুক্ত লাইসোসোম পাওয়া গিয়েছে। লাইসোসোমে রাইবোনিউক্লীয়েজ, ডিঅক্সিরাইবো-নিউক্লীয়েজ, ফসফাটেজ, গ্লাইকোসাইডেজ, সালফাটেজ, ক্যাথেপসিনস্ (*cathepsins*) প্রভৃতি নানা রকমের এনজাইম থাকে। লাইসোসোমের বাইরে দিকে একটা মেমব্রেন বা পর্দা থাকে। এদের অভ্যন্তরীন গঠনের তারতম্য দেখা যায়। কোন কোনটার ভিতরটা ঘন কোনটার বা পাশটা ঘন ও মাঝখানটা তুলনামূলকভাবে কম ঘন, আবার কতকগুলির ভিতরে ভ্যাকুওল দেখা যায়। লাইসোসোমের গঠনের এই তারতম্য এদের বিভিন্ন কাজের উপর নির্ভর করে।

লাইসোসোমের প্রধান কাজগুলি হ'লঃ

(1) কোষের ভিতরে যেসব বস্তু প্রবেশ করে তা পরিপাক করা,
(2) কোষ মধ্যস্থ কোন পদার্থের পরিপাক করা,
(3) কোষের পরিপাক,
(4) কোষের বাইরের কোন পদার্থের পরিপাক।

ফ্যাগোসাইটোসিস (*phagocytosis*) প্রক্রিয়ার কোন বস্তু কোষে প্রবেশ করে। প্লাজমা মেমব্রেন প্রথম ঐ বস্তুটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে ও কোষের মধ্যে নিয়ে আসে। পরে মেমব্রেন ঘেরা অবস্থায় বস্তুটা প্লাজমা মেমব্রেন থেকে আলাদা হয়ে যায় ও সাইটোপ্লাজমে থাকে। মেমব্রেন দিয়ে আবদ্ধ বস্তুটাকে ফ্যাগোসোম (*phagosome*) বলে। ফ্যাগোসোম লাইসোসোমের সংস্পর্শে আসলে মধ্যবর্তী প্রাচীর নষ্ট হয়ে যায় ও লাইসোসোমের এনজাইমগুলি ঐ পদার্থকে পরিপাক করে। ফ্যাগোসোম ও লাইসোসোমের মিলনের ফলে সৃষ্ট ভ্যাকুওলকে পরিপাককারী ভ্যাকুওল (*digestive vacuole*) বলা হয়। যেসব পদার্থ পরিপাক হয় না তা ঐ ভ্যাকুওলে থাকে। পরে ভ্যাকুওলটা কোষ প্রাচীরের দিকে যায় ও বিপরীত ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বর্জ্য পদার্থগুলিকে কোষ থেকে বের করে দেয়

(চিত্র 24)। খাদ্যের অভাব হ'লে লাইসোসোম কোষের কিছু অংশ পরিপাক করতে পারে। কখনও কখনও লাইসোসোমের মেমব্রেনটা
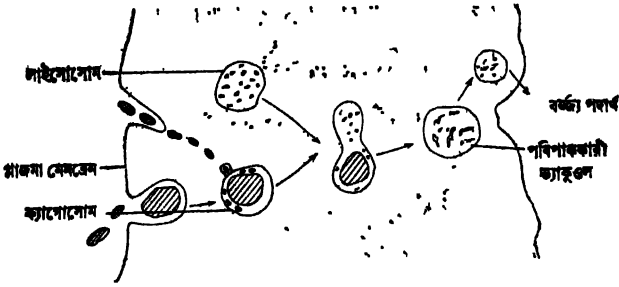
চিত্র 24
লাইসোসোমের সাহায্যে কোন বস্তুর পরিপাক

ভেঙ্গে গিয়ে এনজাইমগুলি বেব হয়ে আসে ও সম্পূর্ণ কোষটাকেই পরিপাক করে। দেহের কোন অংশে কোষেব মৃত্যু ঘটলে কিছু আবর্জনা অপসারনকারী কোষ ঐ স্থানে যায় ও মৃত কোষকে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় নিজের দেহের মধ্যে নিয়ে আসে। এর পর ঐসব কোষের লাইসোসোমগুলি মৃত কোষকে পরিপাক করে ফেলে।

গলগি বস্তু (*Golgi body*)

ইতালীয় বিজ্ঞানী Camilo Golgi 1898 খৃষ্টাব্দে স্নায়ু কোষকে (*nerve cell*) সিলভার নাইট্রেট (*silver nitrate*) ও অসমিয়াম টেট্রাঅক্সাইড (*osmium tetraoxide*) দিয়ে রঞ্জিত করে কতকগুলি জালিকাকার বস্তু দেখতে পান। এইসব বস্তুকে আবিষ্কারকের নামানুসারে গলগি বস্তু বলা হয়। প্রাণী কোষে গলগি বস্তু পাওয়া যায়। গলগি বস্তুর (*golgi body*) বিভিন্ন নাম আছে, যেমন— গলগি অ্যাপারেটাস (*golgi apparatus*), গলগি কমপ্লেক্স (*golgi complex*), ডিকটিওসোম (*dictyosome*), লাইপোকণ্ড্রিয়া (*lipochondria*), ইডিওসোম (*idiosome*) ইত্যাদি।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা গলগি বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের মতে কোষকে স্থায়ী (*fix*) ও রঞ্জিত করবার সময় বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে গলগি বস্তুর আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে গলগি বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়েছে।

গলগি বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই সব বিতর্কের মূলে ছিল অনুন্নত কলা-কৌশল ও শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভাব। এই বিতর্কের প্রধান কারণগুলি হ'ল— (a) বিভিন্ন প্রাণীতে বা একই প্রাণীর বিভিন্ন কোষে গলগি বস্তুর আয়তন ও চেহারার তারতম্য। (b) সজীব কোষে গলগি বস্তুর সমতুল্য কোন বস্তু দেখা যায় নাই। সেজন্য তখনকার দিনের কিছু বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে সাইটোপ্লাজমের লিপিড অংশ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে গলগি বস্তুর মত দেখায়। (c) কোন কোন বিজ্ঞানীরা মনে করতেন মাইটোকণ্ড্রিয়ার পরিবর্তিত অবস্থা হ'ল গলগি বস্তু। (d) অন্যদের মতে মসৃন এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সমষ্টিই গলগি বস্তু। (e) জনন কোষে গলগি বস্তু থাকে কিন্তু দেহ কোষে এদের দেখা যায় না।

কিন্তু এখন গলগি বস্তুর অস্তিত্বের সপক্ষে নানা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। (a) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে গলগি বস্তু দেখা গিয়েছে। এই গলগি বস্তু এবং এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিম্বা মাইটোকণ্ড্রিয়া এক নয়। (b) দেহ কোষেও জনন কোষের মত গলগি বস্তু দেখা গিয়েছে। (c) ফেজ কনট্রাস্ট (*phase contrast*) অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সজীব কোষে যে গলগি বস্তু দেখা গিয়েছে তাদের গঠন রঞ্জিত কোষের গলগি বস্তুরই মতন। (d) সেন্ট্রিফিউজ (*centrifuge*) করে গলগি বস্তুকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন কোষের কিম্বা একই কোষের গলগি বস্তুর আকৃতির তারতম্য হয়। মূলতঃ গলগি বস্তুর কাজের উপরই তাদের আকৃতি নির্ভর করে।

গলগি বস্তুর আয়তনেরও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। স্নায়ু ও গ্রন্থির কোষে গলগি বস্তু বড় হয় ও পেশীর কোষে ছোট হয়। ব্যস্ত কোষে গলগি বস্তুগুলি সুগঠিত হয়, কিন্তু নিষ্ক্রিয় কিম্বা তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় কোষে এগুলি সুগঠিত হয় না। পুরনো কোষে গলগি বস্তুগুলি ক্রমশঃ ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গলগি বস্তু কোষের সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকতে পারে কিম্বা নির্দিষ্ট স্থানে থাকে। এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থির (*endocrine gland*) কোষে গলগি বস্তু নিউক্লীয়াসের পাশে থাকে।

গলগি বস্তুর গঠন কোন ধরণের কোষে এটা অবস্থান করছে এবং এর নিজস্ব কাজের উপর নির্ভরশীল। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে এই বস্তুর তিনটা উপাদান (চিত্র 25) দেখা যায়। এই উপাদানগুলি হ'ল— (a) চ্যাপটা থলি (*flattened sac*), (b) বড় ভ্যাকুওল (*large vacuole*), (c) ছোট ছোট ভেসিকেলের (*vesicle*) সমষ্টি। চ্যাপটা

চিত্র 25
গলগি বস্তুর গঠন
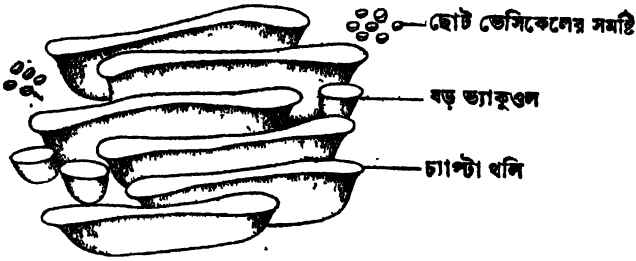
থলিগুলি পরপর সাজান থাকে। এগুলি মসৃন এণ্ডোপ্লাজমিক রেটি-কুলামের মত। এই থলিগুলির প্রাচীর 60—70Å চওড়া। দুই দিকের প্রাচীরের মাঝের ব্যবধান হল 50—60Å। দুইটা থলির মাঝের ব্যবধান হ'ল 130Å। বড় ভ্যাকুওলগুলি চ্যাপটা থলির থেকেই তৈরী হয় এবং ছোট ছোট ভেসিকেলগুলিও ঐ থলির প্রান্ত থেকে মুকুলোদ্গম প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়।

গলগি বস্তু লিপিড ও প্রোটীন দিয়ে তৈরী। এখানে প্রায় সমপরিমাণ প্রোটীন ও ফসফোলিপিড থাকে। গলগি অঞ্চলে ভিটামিন 'c' সঞ্চিত হয়।

গ্রন্থির কোষে সুগঠিত গলগি বস্তুর উপস্থিতি ঐসব কোষের ক্ষরণে (*secretion*) গলগি বস্তুর গুরুত্ব প্রমাণ করে। তবে সাধারণতঃ ক্ষরিত (*secretory*) পদার্থ উৎপাদনে গলগি বস্তু অংশ নেয় না। ক্ষরিত পদার্থ তৈরী হওয়ার পর গলগি বস্তু ঐসব পদার্থকে ঘনীভূত করে ক্ষরিত দানায় (*granule*) পরিবর্তিত করে। এই ক্ষরিত দানা প্লাজমা মেমব্রেনের দিকে যায় এবং পরে কোষ থেকে বের হয়ে যায়। বিশেষ ধরণের কোন কোন কোষে (যেমন অ্যাক্রোসোম) গলগি বস্তু ক্ষরিত পদার্থ উৎপাদনে অংশ নেয়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, গলগি অঞ্চলেই কার্ব্বোহাইড্রেট প্রোটীনের সাথে যুক্ত হয়।

গলগি বস্তুর সাথে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সামঞ্জস্য থেকে মনে করা হয় যে এই বস্তুগুলি এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকেই তৈরী হয়েছে।

মাইটোকণ্ড্রিয়া (*mitochondria*) **বা কণ্ড্রিয়োসোম** (*chondriosome*)

উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষের সাইটোপ্লাজমে সুতার মত কিম্বা লম্বাটে বা গোলাকার কতকগুলি বস্তু দেখা যায়। এইসব বস্তুকে Benda মাইটো-

কণ্ড্রিয়া নাম দিয়েছেন। সূত্রাকার মাইটোকণ্ড্রিয়া ভেঙ্গে গিয়ে লম্বাটে বা গোলাকার মাইটোকণ্ড্রিয়ার সৃষ্টি করে। কখনও কখনও সূত্রাকার মাইটো-কণ্ড্রিয়া পরস্পর যুক্ত হয়ে জালের সৃষ্টি করে। তবে এইরকম মাইটো-কণ্ড্রিয়া বিরল। অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (*dark field microscope*) ও ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র (*phase contrast microscope*) দিয়ে সজীব কোষের মাইটোকণ্ড্রিয়া দেখা যায়। এছাড়া রঞ্জিত কোষে এদের উপস্থিতি উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (*bright field microscope*) দিয়ে দেখা যায়।

মাইটোকণ্ড্রিয়ার আকার ও আয়তন অনেক রকমের হয়। গোলাকার মাইটোকণ্ড্রিয়ার ব্যাস $0.2—2\mu$ বা তার চেয়ে বেশী হয়। সূত্রাকার মাইটো-কণ্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্য $3—7\mu$ হয়ে থাকে। লম্বাটে (*rod*) মাইটোকণ্ড্রিয়ার ব্যাস 0.5μ এবং দৈর্ঘ্য 1.5μ হয়। কোন বিশেষ কোষে মাইটোকণ্ড্রিয়ার আকৃতি সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু কোষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের পরি-বর্তন হলে তার প্রভাব মাইটোকণ্ড্রিয়ার উপরও পড়ে।

বিভিন্ন কোষে মাইটোকণ্ড্রিয়ার সংখ্যার তারতম্য হয়। এই সংখ্যা কোষের ধরণ ও কাজের উপর নির্ভর করে। যকৃতের (*liver*) কোষে মাইটোকণ্ড্রিয়ার সংখ্যা সাধারণতঃ 1,400 হয়, তবে এখানে 2,500 পর্যন্ত মাইটোকণ্ড্রিয়া থাকতে পারে। সী আর্চিনের (*sea urchin*) ডিম্বাণুতে (*egg*) এই সংখ্যা 14,000—1,50,000 পর্যন্ত হয়।

সাধারণতঃ মাইটোকণ্ড্রিয়াগুলি কোষের সব জায়গায় ছড়ান থাকে। কিন্তু কোন কোন বিশেষ কোষে এরা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। অনেক সময় মাইটোকণ্ড্রিয়াগুলি সেন্ট্রোসোমের (*centrosome*) কাছে অবস্থান করে। শুক্রাণুতে (*sperm*) ফ্ল্যাজেলার কাছে মাইটোকণ্ড্রিয়াগুলি অবস্থান করে। *Paramecium*-এর কোষের পরিধির কাছে এদের দেখা যায়। মাইটো-কণ্ড্রিয়ার এইরকম বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থানের কারণ হ'ল যে ঐসব জায়গায় বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি মাইটোকণ্ড্রিয়াই সরবরাহ করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের মাইটোকণ্ড্রিয়ার গঠন একই রকম। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মাইটোকণ্ড্রিয়ার অভ্যন্তরীণ গঠন (চিত্র 26a, b) দেখা গিয়েছে। প্রত্যেক মাইটোকণ্ড্রিয়ার চারিদিকে দুইটা পর্দা (*unit membrane*) থাকে। বাইরের ও ভিতরের পর্দা দুইটাই 40—75Å চওড়া। এই দুইটা পর্দার মধ্যে ব্যবধান 20—60Å। ভিতরের পর্দাটা স্থানে স্থানে ভাঁজ হয়ে ভিতরের দিকে ঝুলে থাকে। এই ভাঁজ অংশগুলিকে ক্রিস্টি (*cristae*)
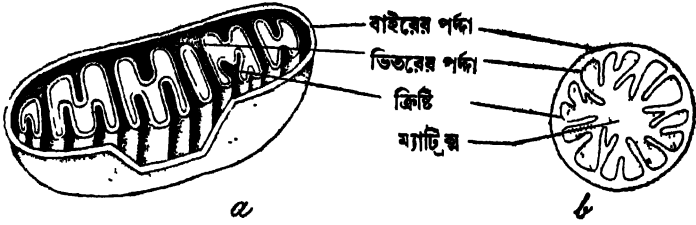
চিত্র 26
মাইটোকণ্ড্রিয়ার ছেদ (সেকশন)।
অভ্যন্তরীণ গঠনের (*a*) ত্রিমাত্রিক (*three dimensional*) এবং
(*b*) দ্বিমাত্রিক (*two dimensional*) চিত্র

বলে। ক্রিস্টিগুলি শাখাযুক্ত বা শাখাবিহীন হয়। এগুলি মাইটোকণ্ড্রিয়ার লম্বালম্বি অক্ষের সমকোণে থাকে, তবে কোন কোন সময় সমান্তরাল ভাবেও থাকতে পারে। ভিতরের পর্দার নীচে মাইটোকণ্ড্রিয়ার কেন্দ্রের ফাঁকা স্থানকে ম্যাট্রিক্স (*matrix*) বলা হয়। এই ম্যাট্রিক্সে বিভিন্ন আয়তনের ছোট ছোট অস্বচ্ছ দানা থাকে। ভাজক কলার (*meristemetic tissue*) মাইটোকণ্ড্রিয়ায় খুব কম সংখ্যক ক্রিস্টি থাকে ও ম্যাট্রিক্সের পরিমাণ বেশী হয়। সালোকসংশ্লেষকারী কোষের (*photosynthetic cell*) মাইটো-কণ্ড্রিয়ায় ক্রিস্টির সংখ্যা বেশী থাকে।

David Green দেখেন যে মাইটোকণ্ড্রিয়ার বাইরের পর্দার বাইরের দিকে ও ভিতরের পর্দার ভিতরের দিকে খুব ছোট ছোট দানা থাকে (চিত্র 27a) বাইরের দানাগুলি গোলাকার ও এদের ব্যাস 90—100Å। এই দানাগুলি কাছাকাছি থাকায় বাইরের পর্দার বাইরের দিকটা অমসৃন হয়। ভিতরের পর্দার দানাগুলির গঠন (চিত্র 27b) একটু অন্য রকমের। একটা বৃন্তের উপর গোলাকার মাথা নিয়ে এই দানাগুলি তৈরী। বৃন্তের নীচে পদ বা *base* থাকে। বৃন্তের দৈর্ঘ্য 35—50Å ও প্রস্থ 30—35Å। বৃন্তের পদ ও মাথার ব্যাস 75—90Å। দুইটা দানার মধ্যে ব্যবধান 20Å। সম্পূর্ণ দানার দৈর্ঘ্য মোটামুটি 160Å হয়। একটা দানার কেন্দ্র থেকে পাশের দানার কেন্দ্রের ব্যবধান 100Å।

মাইটোকণ্ড্রিয়ার পর্দাগুলি লিপিড ও প্রোটীন দিয়ে তৈরী। এখানে 65—70 শতাংশ প্রোটীন এবং 30—35 শতাংশ লিপিড থাকে। এই লিপিডের দুই তৃতীয়াংশ বা তারচেয়ে বেশী (90%) হ'ল ফসফোলিপিড (*phospholipid*)। মাইটোকণ্ড্রিয়ায় সামান্য লোহা, তামা, গন্ধক ও ভিটামিন পাওয়া যায়। মাইটোকণ্ড্রিয়ায় বিভিন্ন রকমের এনজাইম ও কো-

এনজাইম (*co-enzyme*) পাওয়া যায়। Lehninger-এর (1960) মতে প্রত্যেক মাইটোকণ্ড্রিয়ায় 500 থেকে 10,000 এনজাইম থাকে। এগুলি সম্ভবতঃ ক্রিস্টির উপর সমানভাবে ছড়ান থাকে। শ্বাসকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক এনজাইম মাইটোকণ্ড্রিয়ায় পাওয়া যায় ও এখানে প্রচুর ATP (*adinosine tri-phosphate*) উৎপন্ন হয়। এই ATP-ই কোষের নানা রকম কাজে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। মাইটোকণ্ড্রিয়ার বাইরের পর্দার দানায় জারণের (*oxidation*) জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলি থাকে। অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফাটেস্ (*adinosine tri-phosphatase*) ও ফসফেট সংযুক্তিকরণের (*phosphorylation*) এনজাইমগুলি ভিতরের পর্দায় থাকে। সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বা *Krebs cycle*-এর এনজাইমগুলি এবং প্রোটীন ও লিপিড উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলি ম্যাট্রিক্সে থাকে। মাইটোকণ্ড্রিয়ায় বিভিন্ন এনজাইমের যথাযথ অবস্থান সজীব কোষে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার (*reaction*) সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু গঠনেও মাইটোকণ্ড্রিয়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
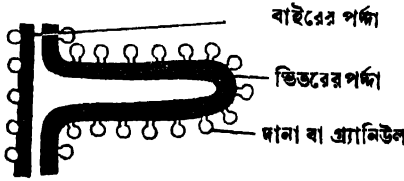
চিত্র 27a
মাইটোকণ্ড্রিয়ার একটা অংশ বড় করে দেখান হয়েছে
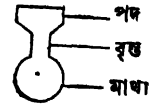
চিত্র 27b
মাইটোকণ্ড্রিয়ার ভিতরের পর্দার একটা দানা (গ্রানিউল) বড় করে দেখান হয়েছে

উৎপত্তি—

মাইটোকণ্ড্রিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আছে। প্রধান দুইটা মতবাদ হ'ল—

(1) পুরাতন মাইটোকণ্ড্রিয়ার থেকে উৎপত্তি,

(2) কোষের অন্য বস্তু থেকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি।

(1) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মাইটোকণ্ড্রিয়ার বিভাগ দেখা গিয়েছে। নূতন মাইটোকণ্ড্রিয়া পুরাতন মাইটোকণ্ড্রিয়া থেকে মুকুলোদ্গম (*budding*) বা ফিশন (*fission*) পদ্ধতিতে গঠিত হয়। মাইটোকণ্ড্রিয়া বিভাগের প্রাথমিক অবস্থায় এর ভিতরের বস্তু অভ্যন্তরীন

পর্দা দিয়ে দুই বা তারচেয়ে বেশী অংশে বিভক্ত হয়। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে এইরকম মাইটোকণ্ড্রিয়া দুইটা বা তারচেয়ে বেশী মাইটোকণ্ড্রিয়ার মিলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। ব্যস্ত কোষে অনেক মাইটোকণ্ড্রিয়া পরস্পর যুক্ত অবস্থায় থাকে। ফার্নের কোষেও এইরকমের মাইটোকণ্ড্রিয়া দেখা গিয়েছে। মনে করা হয় ফিশনের প্রাথমিক অবস্থার জন্যই মাইটোকণ্ড্রিয়াগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে।

(2) Robertson (1959) বলেন যে কোষের বিভিন্ন পর্দা বা মেমব্রেন (যেমন প্লাজমা মেমব্রেন) থেকে মুকুলোদ্গম পদ্ধতিতে মাইটোকণ্ড্রিয়া তৈরী হয়। সী আর্চিনের (*sea urchin*) ডিম্বাণুকে সেন্ট্রিফিউজ (*centrifuge*) করে প্রথম মাইটোকণ্ড্রিয়া শূন্য করা হয়। পরে দেখা গিয়েছে যে ঐ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে মাইটোকণ্ড্রিয়া তৈরী হয়েছে (Nevicoff, 1961)। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে সেন্ট্রিফিউজ করে সাইটোপ্লাজমকে মাইটোকণ্ড্রিয়া মুক্ত করা যায় না।

সেন্ট্রোসোম (*centrosome*)

অনেক প্রাণী ও কোন কোন নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে (ছত্রাক ও শৈবাল) নিউক্লীয়াসের ঠিক বাইরে সাইটোপ্লাজমে সেন্ট্রোসোম দেখা যায়। সেন্ট্রোসোম অঞ্চল স্বচ্ছ থাকে এবং স্বচ্ছ স্থানের কেন্দ্রে একটা ছোট গাঢ় বর্ণযুক্ত দানা থাকে (চিত্র 28)। এই দানাকে সেন্ট্রিওল (*centriole*)
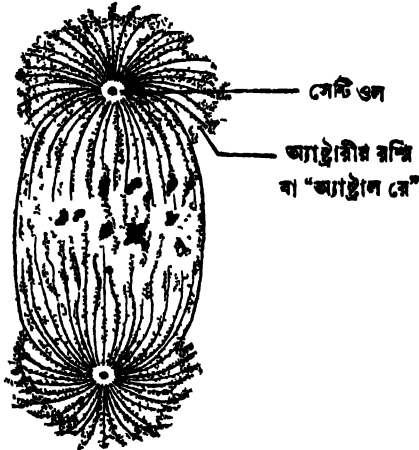
চিত্র 28
দুই মেরুতে দুইটা সেন্ট্রোসোম দেখা যাচ্ছে

এবং স্বচ্ছ পদার্থকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার (*centrosphere*) বলে। তবে সব সময় সেন্ট্রোসোমে সেন্ট্রিওল থাকে না। কোষ বিভাগের আগেই সাধারণতঃ সেন্ট্রোসোমটা বিভক্ত হয়ে নিউক্লীয়াসের দুই মেরুতে অবস্থান করে ও স্পিণ্ডিল গঠনে সাহায্য করে। কোষ বিভাগের কোন কোন অবস্থায় সেন্ট্রোসোম থেকে কতকগুলি রশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের *astral ray* বা অ্যাষ্টারীয় রশ্মি (চিত্র 28) বলে। ফ্ল্যাজেলা উৎপাদনে সেন্ট্রোসোমের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কিছু প্রাচীন মস, ফার্ন, *Cycas*, *Ginkgo* ইত্যাদিতে পুং গ্যামেট উৎপাদনের সময় সেন্ট্রোসোম দেখা গিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ বিভাগের সময় সেন্ট্রোসোম দেখা যায় এবং কোষ বিভাগের পরে এরা অদৃশ্য হয়ে যায়।

রাইবোসোম (*ribosome*)

সাইটোপ্লাজমে কতকগুলি ছোট ছোট দানার মত বস্তুর মধ্যে প্রচুর RNA পাওয়া যায়। এইসব বস্তুকে Robert (1958) রাইবোসোম নামে অভিহিত করেছিলেন। 1955 খৃষ্টাব্দে Palade রাইবোসোম দেখেছিলেন। এরও আগে 1941 খৃষ্টাব্দে Claude এইসব বস্তুকে মাইক্রোসোম (*microsome*) নাম দিয়েছিলেন। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে রাইবোসোম এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামেরই অংশ।

ব্যাকটিরিয়া, ইষ্ট (*yeast*), উদ্ভিদের ভাজক কলায় (*meristematic tissue*), স্নায়ু কোষে এবং যকৃতের কোষে রাইবোসোম দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য কোষেও রাইবোসোম থাকে বিভিন্ন কোষে রাইবোসোমের গঠন ও আয়তন মোটামুটি এক। সাধারণতঃ রাইবোসোম গোল কিম্বা উভয়-প্রান্ত একটু চাপা হয়। এদের ব্যাস 100—230Å।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়েছে যে প্রত্যেক রাইবো-সোমে দুইটা অংশ (*subunit* বা উপএকক) থাকে। একটা অংশ বড় ও অন্যটা ছোট (চিত্র 29a)। *Escherichia coli*-তে বড় অংশটা পেয়ালাব বা গম্বুজের আকৃতির, ছোট অংশটা টুপির মত ও বড় অংশটার সোজা দিকে আটকান থাকে। উচ্চতর উদ্ভিদ ও প্রাণীতে এণ্ডোপ্লাজমিক রেটি-কুলামের সাথে রাইবোসোমের বড় অংশটা সংযুক্ত থাকে।

অ্যালট্রা-সেন্ট্রিফিউজ (*ultra-centrifuge*) করে দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন রাইবোসোম বা রাইবোসোমের অংশ ভিন্ন ভিন্ন হারে থিতিয়ে (*sedimentation rate*) পড়ে। এর উপর ভিত্তি করে রাইবোসোম গুলিকে দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। (a) ব্যাকটিরিয়ার রাইবো-

সোমের থিতানর গুণাঙ্ক *(sedimentation coefficient)* 70 S ($S = Svedberg$ একক)। এদের আনবিক ওজন সাধারণতঃ 2.7×10^6 হয়। (b) ইউক্যারিওট কোষের রাইবোসোমের থিতানর গুণাঙ্ক 80 S এবং এদের আনবিক ওজন মোটামুটি 4×10^6।

রাইবোসোমের অংশগুলি ম্যাগনেসিয়ামের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। ম্যাগনেসিয়ামের অনুপস্থিতিতে রাইবোসোমের বড় অংশটা আরো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন, 70 S রাইবোসোম 50 S ও 30 S উপএককে *(subunit)* আলাদা হয়ে যায়। 80 S রাইবোসোম 60 S ও 40 S উপএককে বিভক্ত হয়। এইসব 50 S, 60 S ইত্যাদি উপএককগুলিও আরো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হতে পারে। রাইবোসোমের এইসব ছোট ছোট অংশ-গুলি প্রোটীন উৎপাদন করতে পারে না। কেবল 70 S ও 80 S রাইবো-সোম প্রোটীন উৎপাদনে সক্ষম।

যেসব রাইবোসোম কোন পর্দার সাথে যুক্ত থাকে সেগুলি কোন পর্দাব সাথে যুক্ত নয় এমন রাইবোসোমেব চেযে প্রোটীন উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক সক্রিয়।

অনেক সময় কতকগুলি রাইবোসোম একসাথে থাকে, এদের পলিসোম *(polysome)* বা পলিরাইবোসোম *(polyribosome)* বলা হয় (চিত্র 29b)।
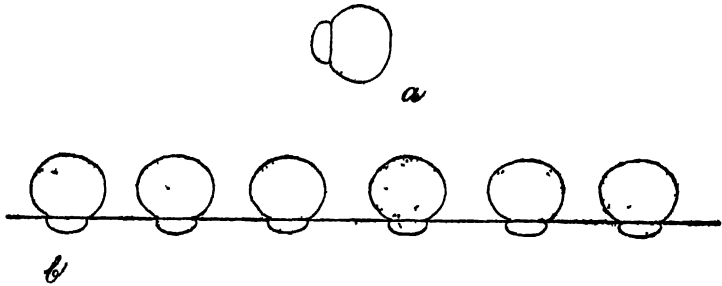
চিত্র 29
রাইবোসোম।
a. দুইটা অংশ দিয়ে গঠিত একটা রাইবোসোম
b. পলিরাইবোসোম

এই রাইবোসোমগুলি খুব সূক্ষ্ম (10—15Å) RNA সূত্র দিয়ে যুক্ত থাকে। পলিরাইবোসোমের রাইবোসোম অংশগুলি একসাথে কাজ করে। প্রজাতির উপর নির্ভর করে পলিরাইবোসোমে রাইবোসোমের সংখ্যা

বিভিন্ন হয়। কোন কোনটায় তিনটা আবার কোনটায় সত্তরটা পর্যন্ত রাইবোসোম থাকে। একটা রাইবোসোম থেকে অন্য রাইবোসোমের দূরত্ব 50—150Å হয়।

রাইবোসোমে 60 শতাংশ RNA এবং 40 শতাংশ প্রোটীন থাকে। ইঁদুরের যকৃতের (*liver*) রাইবোসোমে ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া সামান্য পরিমাণ ক্রোমিয়াম (*chromium*), ম্যাঙ্গানিজ (*manganese*) নিকেল (*nickel*), লোহা, ক্যালসিয়ামও (*calcium*) রাইবোসোমে থাকতে পারে।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ নিউক্লীওলাস ও রাইবোসোমের মধ্যে একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা ও অন্যান্য গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে রাইবোসোম গঠনের জন্য নিউক্লীওলাসের একান্ত প্রয়োজন। 1962 খৃষ্টাব্দে Rich ও Warner-এর গবেষণা থেকে প্রোটীন উৎপাদনে পলিরাইবোসোমের গুরুত্ব উপলব্ধি করা গিয়েছে। রাইবোসোম অণুগুলেই প্রোটীন তৈরী হয়। বার্তাবহ (*massenger*) আর·এন·এ· ডি·এন·এ·র প্রোটীন উৎপাদনের বার্তা সাইটোপ্লাজমে নিয়ে আসে। Rich-এর (1963) মতে একটা রাইবোসোমকে যদি কোন m-RNA-র এই বার্তা জানতে হয় তবে ঐ রাইবোসোমকে m-RNA সূত্রের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হবে। রাইবোসোম যখন m-RNA-র একপ্রান্ত থেকে চলতে থাকে তখন এটা নির্দেশ অনুসারে একটার পর একটা অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত করে পলিপেপটাইড চেন (*polypeptide chain*) গঠন করে (চিত্র 30)। m-RNA (মেসেঞ্জার আর· এন· এ) সূত্রের সব নির্দিষ্ট স্থানে t-RNA নির্বাচিত অ্যামিনো অ্যাসিডকে নিয়ে আসে। এইভাবে যখন পলিপেপটাইড চেন অর্থাৎ প্রোটীন অণুর গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন রাইবোসোম ঐ
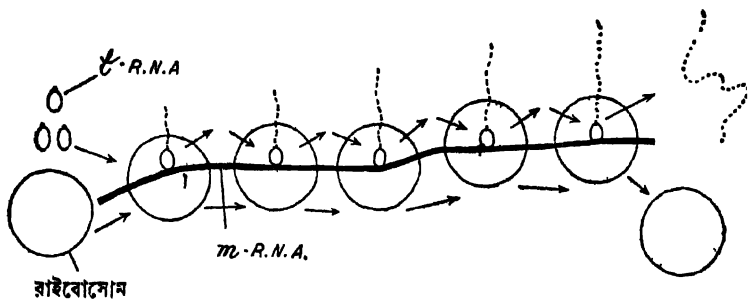
চিত্র 30
প্রোটীন উৎপাদনে রাইবোসোমের ভূমিকা

পলিপেপটাইড চেনকে মুক্ত করে দেয় এবং নিজেও ঐ m-RNA সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঠিক ঐ সময় আরেকটা রাইবোসোম m-RNA-র অন্য প্রান্তে যুক্ত হয়ে নূতন পলিপেপটাইড চেন বা প্রোটীন অণু গঠন করতে আরম্ভ করে। একটা m-RNA-র সাথে 1—20টা রাইবোসোম যুক্ত থাকতে পারে। এঁইসব রাইবোসোম m-RNA-র একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাবার সময় প্রত্যেকে একটা করে প্রোটীন অণু গঠন করে। ব্যাকটিরিয়ায় রাইবোসোমের একটা প্রোটীন অণু তৈরী করতে মাত্র 10 সেকেণ্ড সময় লাগে।

প্লাষ্টিড (*Plastid*)

উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন ধরণের প্লাষ্টিড দেখা যায়। তবে কিছু নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে (যেমন ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি) প্লাষ্টিড থাকে না। প্রাণীতে প্লাষ্টিড পাওয়া যায় না। তবে এককোষী জীব
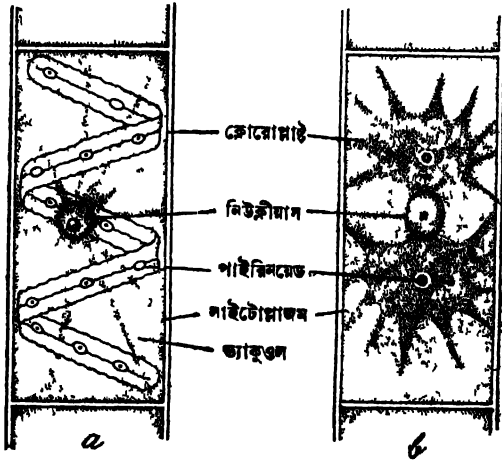
চিত্র 31a-b
বিভিন্ন রকমের ক্লোরোপ্লাষ্ট। a-*Spirogyra*-এ ফিতাকৃতির, b-*Zygnema*-এ তারকাকৃতির

Euglena-এ প্লাষ্টিড থাকে। একই প্রজাতির বিভিন্ন রকমের কোষে প্লাষ্টিডের আকার আয়তন এবং শ্রেণীর তারতম্য হয়। প্লাষ্টিডের আকার বিভিন্ন ধরণের হয়, যেমন—গোল, ডিম্বাকৃতির, ফিতাকৃতির, চাকতির মত, জালিকাকার, পেয়ালার মত (চিত্র 31a-f) ইত্যাদি। প্লাষ্টিডের ব্যাস 4—10μ ও স্থূলতা 1—3μ হয়ে থাকে। কোন জীবের সব প্লাষ্টিডকে একসাথে প্লাষ্টিডোম (*plastidome*) বলে।
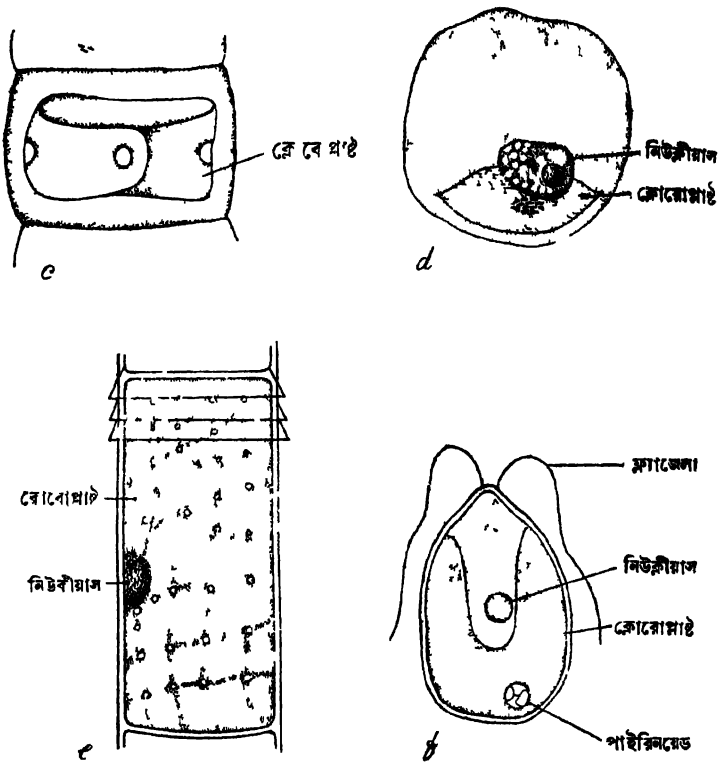
চিত্র 31c-f

বিভিন্ন ধরণের ক্লোরোপ্লাস্ট c—*Ulothrix* এ বলয়াকার, d—*Anthoceros* এ স্পিণ্ডল আকারের, e—*Oedogonium* এ জালিকাকার, f—*Chlamydomonas* এ পেয়ালার আকৃতির

প্লাস্টিডকে প্রধানতঃ তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এই শ্রেণীগুলি হল—

(a) বর্ণহীন লিউকোপ্লাস্ট

(b) সবুজ ক্লোরোপ্লাস্ট

(c) সবুজ ছাড়া অন্যান্য বর্ণযুক্ত ক্রোমোপ্লাস্ট

এইসব বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিডের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। এক-শ্রেণীর প্লাস্টিড পরিবর্তিত হয়ে অন্য শ্রেণীর প্লাস্টিড তৈরী করতে পারে। লিউকোপ্লাস্ট থেকে ক্লোরোপ্লাস্ট বা ক্রোমোপ্লাস্ট ও ক্লোরো-

প্লাণ্ট থেকে ক্রোমোপ্লাণ্টের সৃষ্টি হতে পারে।

একটা পরিণত ক্লোরোপ্লাষ্টিডে তিনটা অংশ থাকে। এই অংশগুলি হচ্ছে—(1) সীমানা নির্দেশকারী পর্দা (*membrane*), (2) স্ট্রোমা (*stroma*), (3) গ্রানা (*grana*) (চিত্র 32)।
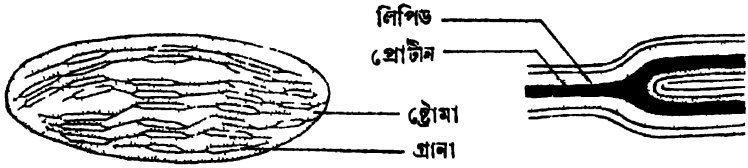
চিত্র 32

ক্লোরোপ্লাণ্টের অভ্যন্তরীণ গঠন, গ্রানা ও ইন্টারগ্রানার অংশ
বড় করে দেখান হয়েছে

(1) সীমানা নির্দেশকারী মেমব্রেন দুইটা স্তরযুক্ত হয়। প্রত্যেকটা স্তর 40—60A চওড়া। এই পর্দা প্লাষ্টিডে বিভিন্ন পদার্থের প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে।

(2) স্ট্রোমা—প্রাচীরের ভিতরের এই স্বচ্ছ অংশ লাইপোপ্রোটীন দিয়ে তৈরী। স্ট্রোমায় কিছু এনজাইম থাকে।

(3) গ্রানা—গ্রানা চ্যাপটা চাকতির আকারের। এগুলি একটার উপর আরেকটা পরপর সাজান থাকে। গ্রানার আয়তন 0.3—1.7μ। একটা প্লাষ্টিডে 1—60 বা তারচেয়ে বেশী সংখ্যক গ্রানা থাকে। প্রত্যেক গ্রানায় দুইটা মেমব্রেন বা ল্যামেলা (*lamella*) থাকে। প্রত্যেক ল্যামেলা 30—35Å স্থূল। দুইটা ল্যামেলার মধ্যে ব্যবধান 65—70Å। ল্যামেলায় 45% প্রোটীন ও 55% লিপিড পাওয়া যায় (চিত্র 32)। একটা গ্রানা অন্য গ্রানার সাথে ল্যামেলা দিয়ে যুক্ত থাকে। ল্যামেলা স্ট্রোমায়ও বিস্তৃত থাকে (স্ট্রোমা ল্যামেলা)। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে গ্রানার ল্যামেলার ভিতরের ত্বকে কিছু দানা আছে। এই দানাগুলিকে Park (1963) কুয়ান্টোসোম (*quantosome*) নাম দিয়েছেন। এগুলি 185Å লম্বা, 155Å চওড়া এবং 100Å স্থূল।

বিভিন্ন ধরণের প্লাষ্টিডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল—

(a) **লিউকোপ্লাষ্ট** (*leucoplast*)

লিউকোপ্লাষ্ট বর্ণহীন ও স্বচ্ছ। যেসব কোষ সূর্যালোক পায় না সেইখানে লিউকোপ্লাষ্ট দেখা যায়। ভ্রূণ কোষে (*embryonic cell*), জনন কোষে, ভাজক (*meristemetic*) কোষে এবং অপরিণত কোষে লিউকোপ্লাষ্ট পাওয়া যায়। লিউকোপ্লাষ্ট গোল, লম্বাটে বা অনিয়মিত আকারের হয় (চিত্র 33a)। এখানে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন ও স্নেহ জাতীয়
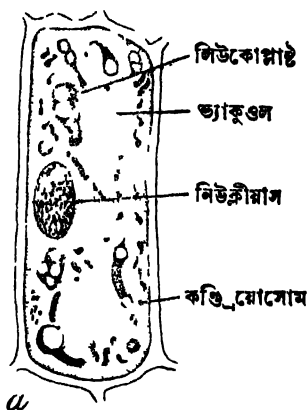
চিত্র 33a

রাই-এ লিউকোপ্লাষ্ট

পদার্থ (*fat*) সঞ্চিত হয়। আলুর যেসব লিউকোপ্লাষ্ট হেক্সোজ শর্করাকে ষ্টার্চে পরিবর্তিত করে তাদের অ্যামাইলোপ্লাষ্ট (*amyloplast*) বলে (চিত্র 33b)। যেসব লিউকোপ্লাষ্ট স্নেহ জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত করে তাদের
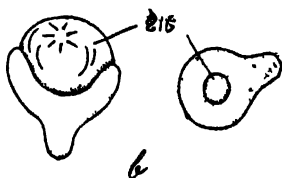
চিত্র 33b

অ্যামাইলোপ্লাষ্ট

ইলিওপ্লাস্ট (*elioplast*) বলে। যেসব লিউকোপ্লাস্ট প্রোটীন সঞ্চয় করতে পারে তাদের অ্যালিউরোন দানা (*aleurone grain*) বলা হয়।

(b) **ক্লোরোপ্লাস্ট** (*chloroplast*)

ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতিতে উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ (*photosynthesis*) হয়। গাছের যেসব অংশে সূর্যের আলো পড়ে সেখানে ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায়। ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয় (চিত্র 31a-f)। ক্লোরোপ্লাস্টে যেসব বর্ণ থাকে সেগুলি হ'ল— ক্লোরোফিল (*chlorophyll*) 'a', ক্লোরোফিল 'b', ক্যারোটিন (*carotene*) এবং জ্যান্থোফিল (*xanthophyll*)। এই বর্ণগুলি গ্রানায় থাকে। গ্রানাগুলি বর্ণহীন স্ট্রোমার মধ্যে অবস্থিত। কোন কোন উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে পাইরিনয়েড (*pyrenoid*) থাকে। পাইরিনয়েডগুলি প্রোটীন দিয়ে তৈরী ও সাধারণতঃ এর চারিদিকে ষ্টার্চের স্তর থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টে গ্রানার সংখ্যা দশ থেকে কয়েকশ' পর্যন্ত হয়। গ্রানায় প্রোটীন ও লিপিড ছাড়া বিভিন্ন অজৈব পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম, লোহা, তামা ও দস্তা থাকতে পারে। ক্লোরোপ্লাস্টে সাধারণতঃ 50 শতাংশ জল, 25 শতাংশ প্রোটীন, 15 শতাংশ লিপিড এবং 10 শতাংশ বর্ণ বা রঙ (*pigment*) থাকে। বিভিন্ন কোষে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যার তারতম্য হয়। কোন কোন উদ্ভিদ—যেমন *Zygnema*-তে প্রতি কোষে দুইটা ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। *Chlomydomonas*, *Ulothrix* ও অন্যান্য কোন কোন উদ্ভিদে একটা কোষে একটা মাত্র ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। *Recinus communis*-এর একটা কোষে 400,000 পর্যন্ত ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

(c) **ক্রোমোপ্লাস্ট** (*chromoplast*)—সবুজ ছাড়া অন্য বর্ণযুক্ত প্লাষ্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে। এখানে ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল ও অন্যান্য বর্ণ থাকে। এদের বর্ণ হলুদ বা লাল হয়। ফল, ফুলে ক্রোমোপ্লাস্ট দেখা যায়। তবে মাটীর নীচের বিশেষ ভান্ডার মূল গাজরেও ক্রোমোপ্লাস্ট পাওয়া গিয়েছে। ক্রোমোপ্লাস্টের কোন নির্দিষ্ট আকৃতি নাই। এরা লম্বাটে, সূচ্যাকার, খণ্ডিত বা কোণযুক্ত হয় (চিত্র 34a, b)। ক্রোমোপ্লাস্টের বিভিন্ন বর্ণ স্ট্রোমার মধ্যে ছড়ান থাকে। বাদামী শৈবালের রঙ ফিউকোজ্যান্থিনের (*fucoxanthine*) জন্য, লাল শৈবালের রঙ ফাইকোএরিথ্রিনের (*phycoerythrin*) জন্য এবং টমেটোর লাল রঙ লাইকোপেনের (*lycopen*) জন্য হয়ে থাকে।

উৎপত্তি—

প্রোপ্লাষ্টিডের (*proplastid*) বিভাগের ফলে প্লাষ্টিড তৈরী হয়। আদি
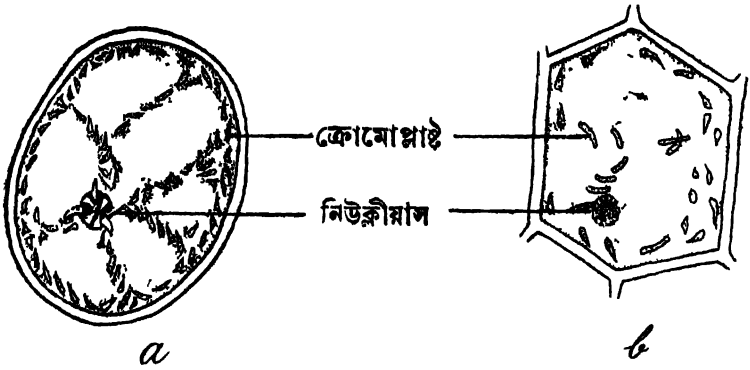
চিত্র 34
ক্রোমোপ্লাষ্ট। a-টমেটোর কোষে, b-গাজরের কোষে

প্লাষ্টিড বা প্রোপ্লাষ্টিড খুব ছোট ছোট গোল কিম্বা লম্বাটে। কাণ্ডের অগ্রভাগ ও পাতার কোষ বিভাগের সময় প্রোপ্লাষ্টিডও বিভক্ত হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যখন কাণ্ড ও পাতাব কোষগুলি পরিণত হতে থাকে তখন ঐ সব প্রোপ্লাষ্টিড বড় হয় ও পরে ক্লোরোপ্লাষ্টে রূপান্তবিত হয়। মূলেও একই ভাবে ভাজক কোষের বিভাগ ও বৃদ্ধিব সময় প্রোপ্লাষ্টিডও বিভক্ত হয় ও পবে ঐসব প্রোপ্লাষ্টিড পরিণত হয়ে লিউকোপ্লাষ্ট তৈরী করে। সবসময় কোষ বিভাগের সাথে সাথে প্রোপ্লাষ্টিডেব বিভাগ হয় না। তবে কোন কোন উদ্ভিদে যেমন *Anthoceros*, *Zygnema*-এ কোষ বিভাগের আগে কিম্বা সাথে সাথে নিয়মিতভাবে প্লাষ্টিডের বিভাগ হয়। ক্লোরোপ্লাষ্ট বা লিউকোপ্লাষ্ট থেকে নানা পবিবর্তনেব পব ক্রোমোপ্লাষ্ট তৈবী হয়। শৈবালে ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীব উদ্ভিদে প্লাষ্টিডেব বিভাগের সময় প্লাষ্টিডের ভিতরের পর্দাটা ভাঁজ হয়ে যায় পরে ঐ জাযগায বাইবের পর্দাটা সঙ্কুচিত হতে থাকে যতক্ষণ না ঐ প্লাষ্টিডটা দুইটা অংশে বিভক্ত হচ্ছে (চিত্র 35)।
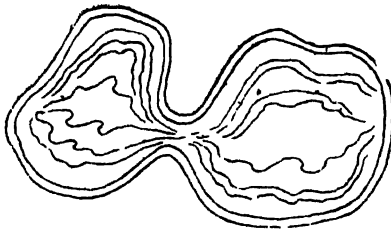
চিত্র 35
প্লাষ্টিডের বিভাগ

এইভাবে সৃষ্ট প্লাষ্টিড দুইটা সমান কিম্বা অসমান হয়।

উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের প্লাষ্টিডের সৃষ্টি সূর্যের আলো দিয়ে প্রভাবিত হয়। প্রোপ্লাষ্টিডের ভিতরের পর্দাটা ভিতরের দিকে ঢুকে অনেক জায়গায়
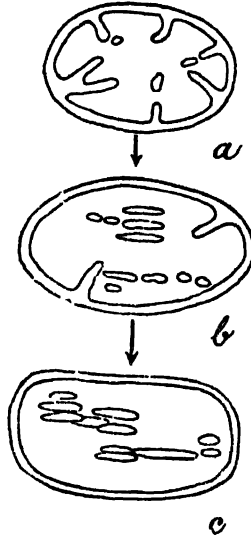
চিত্র 36
প্লাষ্টিডের উৎপত্তি

ছোট ছোট ভেসিকেল (*vescicle*) তৈরী করে। এই ছোট ছোট অংশগুলি পরে আলাদা হয়ে যায় ও পরিণত প্লাস্টিডের ল্যামেলার সৃষ্টি করে (চিত্র 36)। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্লোরোফিলের পার্থক্য মেণ্ডেলীয় সূত্র (*Mendel's law*) অনুযায়ী আচরণ করে। এখানে অনেক সময় অপরিবর্তনশীল মিউটেশন (*mutation*) হয় এজন্য এদের প্লাষ্টোজীন (*plastogene*) বলা হয়ে থাকে।

নিউক্লীয়াস (*Nucleus*)

সব উদ্ভিদের কোষেই নিউক্লীয়াস থাকে। তবে নীলাভ সবুজ শৈবাল (*blue green algae*) ও ব্যাকটিরিয়ায় সুগঠিত নিউক্লীয়াস থাকে না, কিন্তু নিউক্লীও পদার্থ থাকে। পরিণত সীভ টিউবে (*seive tube*) ও স্তন্যপায়ী (*mammal*) প্রাণীর রক্তের পরিণত লোহিত কণিকায়

নিউক্লীয়াস থাকে না। নিউক্লীয়াসবিহীন কোষ বেশী দিন বাঁচতে পারে না। কোষের বিভাগ, বৃদ্ধি ও জনন সব কিছুতেই নিউক্লীয়াসের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

নিউক্লীয়াস সাধারণতঃ গোল বা ডিম্বাকার হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ডাম্বেলাকার, চ্যাপটা, শাখাযুক্ত, বা অনিয়মিত আকারের নিউক্লীয়াস দেখা যায়।

বেসিক স্টেইন (*basic stain*) বা ক্ষারীয় রঞ্জক পদার্থ দিয়ে নিউক্লীয়াসকে রঙ করা যায়। অরসিন (*orcein*), কারমিন (*carmine*), ক্রিষ্ট্যাল ভায়োলেট (*crystal violet*), হেমাটোক্সিলিন (*hemato-xylin*), মিথাইল গ্রীন (*methyl green*), বেসিক ফুক্‌সিন (*basic fuchsin*) ইত্যাদি রঙ নিউক্লীয়াসকে রঞ্জিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন কোষে নিউক্লীয়াসের আয়তনের তারতম্য হয়। সাধারণতঃ এর আয়তন 10 থেকে 15μ পর্যন্ত হয়। তবে কিছু কোষে 1μ ব্যাসযুক্ত নিউক্লীয়াস পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের (*gymno-sperm*) ডিম্বাণুর নিউক্লীয়াস 600μ ব্যাসযুক্ত হয়।

1895 খৃষ্টাব্দে Bovari বলেছিলেন যে ক্রোমোসোমের সংখ্যার উপর নিউক্লীয়াসের আয়তন নির্ভর করে। কিন্তু Gates-এর (1909) মতে সব সময় নিউক্লীয়াসের আয়তন ক্রোমোসোমের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল নয়। প্রত্যেক কোষের নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজমের আয়তনের একটা নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে এবং এই অনুপাতকে নিউক্লীয়-সাইটোপ্লাজমীয় অনুপাত (*nucleo-cytoplasmic ratio*) বা ক্যারিওপ্লাজমীয় অনুপাত (*karyoplasmic ratio*) বলে। এই অনুপাতকে Hartwig-এর (1960) নিউক্লীও সাইটোপ্লাজমীয় ইনডেক্স (*nucleo-cytoplasmic index*) বা NP. দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

$$NP = \frac{V_n}{V_c - V_n}$$

V_n = নিউক্লীয়াসের আয়তন

V_c = সাইটোপ্লাজমের আয়তন

অপরিণত কোষে নিউক্লীয়াসটা কোষের মাঝখানে থাকে কিন্তু পরিণত কোষে ভ্যাকুওলের উপস্থিতির জন্য নিউক্লীয়াসটা পরিধির দিকে সরে যায়। তবে সব অবস্থাতেই নিউক্লীয়াসের চারিদিকে সাইটোপ্লাজম থাকে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক কোষে একটা নিউক্লীয়াস থাকে এবং এইসব কোষকে এক নিউক্লীয়াসযুক্ত (*uninucleate*) কোষ বলে। যেসব কোষে দুইটা করে নিউক্লীয়াস থাকে তাদের দ্বি-নিউক্লীয়াসযুক্ত (*binucleate*) কোষ বলে। যেসব কোষে দুইটার চেয়ে বেশী সংখ্যক নিউক্লীয়াস থাকে সেসব কোষকে বহুনিউক্লীয়াসযুক্ত (*multinucleate*) কোষ বলে। *Vaucheria* ও অন্যান্য *Siphonales* বর্গের (*order*) সবুজ শৈবাল এবং ফাইকোমাইসেটিস্ (*Phycomycetes*) শ্রেণীর ছত্রাকের দেহে কোন মধ্যপর্দা থাকে না। এইরকম দেহকে সিনোসাইট (*coenocyte*) বলে এবং এখানে অসংখ্য নিউক্লীয়াস থাকে। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের কোন কোন কোষে বহু নিউক্লীয়াসযুক্ত অবস্থা দেখা যায়। এই অবস্থা সাইটোপ্লাজমের বিভাগ ছাড়া বারবার নিউক্লীয়াসের বিভাগের ফলে কিম্বা দুইটা কোষের মাঝের প্রাচীর নষ্ট হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়।

নিউক্লীয়াসের রাসায়নিক গঠন

নিউক্লীয়াসে যেসব রাসায়নিক বস্তু পাওয়া যায় সেগুলি হ'ল—

(a) প্রোটীন
   (i) ক্ষারীয় বা বেসিক প্রোটীন (*basic protein*)—হিস্টোন (*histone*), প্রোটামাইন (*protamine*) ইত্যাদি
   (ii) অম্লধর্মযুক্ত বা অবশিষ্ট প্রোটীন (*acidic* বা *residual protein*)

(b) নিউক্লীক অ্যাসিড (*nucleic acid*)
   (i) ডি· এন· এ· (DNA), (ii) আর. এন. এ· (RNA)

(c) লিপিড

(d) অজৈব পদার্থ

(a) **প্রোটীন**—ক্রোমোসোমে, নিউক্লীওলাসে, নিউক্লীও রসে সব জায়গাতেই প্রোটীন থাকে। এখানে বিভিন্ন রকমের প্রোটীন পাওয়া যায়।

(b) **নিউক্লীক অ্যাসিড**—নিউক্লীয়াসের শুষ্ক ওজনের 15—30 শতাংশ হ'ল নিউক্লীক অ্যাসিড। আর· এন· এ·র পরিমাণ নিউক্লীয়াসের শুষ্ক ওজনের 1—2 শতাংশ এবং এটা প্রধানতঃ নিউক্লীওলাসে পাওয়া যায়। ক্রোমোসোমে প্রধানতঃ ডি· এন· এ· থাকে।

(c) **লিপিড**—লিপিড সাধারণতঃ লাইপো-প্রোটীন (লিপিড ও প্রোটীন) ও ফসফোলিপিড অবস্থায় পাওয়া যায়। ক্রোমোসোমে ও নিউক্লীওলাসে ফসফোলিপিড থাকে।

(d) **অজৈব পদার্থ**—ক্যালসিয়াম ডি· এন· এ র সাথে যুক্ত থাকে। লোহা, দস্তা, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির লবণও নিউক্লীয়াসে পাওয়া যায়।

এছাড়া বিভিন্ন বকমেব এনজাইম নিউক্লীয়াসে থাকে।

নিউক্লীয়াসের গঠন

(a) নিউক্লীযাসেব (চিত্র 37) চাবিদিকে একটা সূক্ষ্ম পদা আছে। এই পর্দাকে নিউক্লীযাব মেমব্রেন (*nuclear membrane*) বা নিউক্লীও পদা বলে। এই পর্দা নিউক্লীযাসে বিভিন্ন বস্তুব প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ কবে।
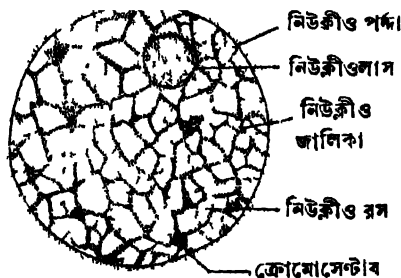
চিত্র 37
নিউক্লীয়াসেব গঠন

(b) নিউক্লীযাসেব ভিতব যে জেলীব মত তবল পদার্থ থাকে তাকে নিউক্লীও বস (*nuclear sap*) বা নিউক্লীওপ্লাজম (*nucleoplasm*) বা ক্যাবিওলিম্ফ (*karyolymph*) বলে। নিউক্লীওপ্লাজম প্রধানতঃ প্রোটীন দিযে তৈবী। এছাড়া এখানে বিভিন্ন এনজাইম, আব এন এ ইত্যাদি থাকে।

(c) নিউক্লীওপ্লাজমে নির্দিষ্ট সংখ্যক সূক্ষ্ম সূতা (ক্রোমোনিমা) পবস্পব জড়িযে একটা জালেব সৃষ্টি কবে। এই জালকে নিউক্লীও জালিকা বা নিউক্লীযাব রেটিকুলাম (*nuclear reticulum*) বা ক্রোমাটিন বেটিকুলাম (*chromatin reticulum*) বলে। কোষ বিভাগেব সময নিউক্লীও জালিকা ভেঙে যায় ও ক্রোমোসোমগুলি দেখা যায়।

(d) প্রত্যেক নিউক্লীযাসে এক বা একাধিক গোল নিউক্লীওলাস থাকে। রঞ্জিত কোষে এদের গাঢ় বর্ণেব দেখায়।

(c) কোন কোন কোষে ইন্টারফেজ অবস্থায় নিউক্লীয়াসের মধ্যে এক বা একাধিক অংশ গাঢ় রঙ নেয়। এই অঞ্চলগুলিকে প্রোক্রোমোসোম বা ক্রোমোসেন্টার (*chromocenter*) বলে। ক্রোমোসোমগুলির হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল পরস্পর যুক্ত হয়ে ক্রোমোসেন্টার গঠন করে।

নিউক্লীয়ার মেমব্রেন (*nuclear membrane*)

এই পর্দা নিউক্লীয়াসের ভিতরের পদার্থকে সাইটোপ্লাজম থেকে আলাদা করে রাখে। কোষ বিভাগের কোন কোন অবস্থায় নিউক্লীয়ার মেমব্রেনকে দেখা যায় না। নিউক্লীয়ার মেমব্রেনে দুইটা পর্দা থাকে (চিত্র 38)।
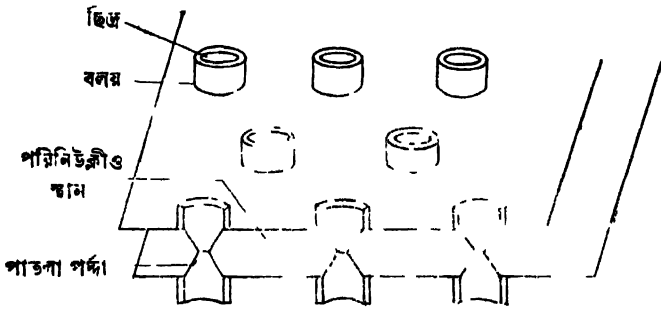
চিত্র 38
নিউক্লীয়ার মেমব্রেনের গঠন

প্রত্যেকটা পর্দা 80- 100Å চওড়া। দুইটা পর্দার মধ্যে ব্যবধান 100—300Å। পর্দা দুইটার মধ্যবর্তী স্থানকে পেরিনিউক্লীয় স্থান (*peri-nuclear space*) বলে। নিউক্লীয়ার মেমব্রেনে অনেক ছিদ্র (*pore*) থাকে। ছিদ্রগুলির প্রান্তে পর্দা দুইটা সংযুক্ত থাকে। ছিদ্রগুলিকে ঘিরে বেলনাকার (*cylindrical*) বলয় (*annulus*) দেখা যায়। এইসব বলয় বা অ্যানুলাসের ব্যাস 400Å। বিভিন্ন জীবে এবং একই জীবের বিভিন্ন কোষে নিউক্লীও পর্দা বা নিউক্লীয়ার মেমব্রেনের ছিদ্রের আয়তন ও সংখ্যার তারতম্য হয়। প্রত্যেক ছিদ্রের মাঝখানে একটা সূক্ষ্ম পর্দা থাকে যা নিউক্লীয়াসে বিভিন্ন বস্তুর প্রবেশ বা নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লীয়ার মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে শর্করা, অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু, বিভিন্ন ধরণের RNA ইত্যাদি যেতে পারে।

নিউক্লীয়ার মেমব্রেন প্রোটীন ও লিপিড দিয়ে তৈরী। সাম্প্রতিক

গবেষণা থেকে জানা যায় যে এই মেমব্রেন এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে তৈরী হয়। কোষ বিভাগের সময় প্রফেজের শেষে নিউক্লীয়ার মেমব্রেন ভেঙ্গে যায় ও সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলিকে তখন এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে আলাদাভাবে চেনা যায় না। টেলোফেজে অপত্য নিউ-ক্লীয়াসের চারিদিকে নিউক্লীয়ার মেমব্রেন আবার এণ্ডোপ্লাজমিক রেটি-কুলামের অংশ থেকেই তৈরী হয় (চিত্র 23)।

নিউক্লীওলাস (*Nucleolus*)

নিউক্লীওলাসের (চিত্র 37) সংখ্যা ক্রোমোসোম সেটের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। প্রতি সেট (*set*) ক্রোমোসোমের জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদে এক বা একাধিক নিউক্লীওলাস থাকে। তবে কোন কোন কোষে দুইটা নিউক্লীওলাস মিলিত হওয়ার ফলে এর সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে। নিউক্লীওলাস নির্দিষ্ট ক্রোমো-সোমের সেকেণ্ডারী কনষ্ট্রিকশন (*secondary constriction*) অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকে ও কোষ বিভাগের কোন কোন অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে যায়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে নিউক্লীওলাসের ভিতরের গঠন দেখা যায়। নিউক্লীওলাসের দুইটা অংশ—নিউক্লীওলোনীমা এবং পার্স এমরফা।

(a) নিউক্লীওলোনীমা (*nucleolonema*)—এটা নিউক্লীওলাসেব স্থায়ী সুত্রযুক্ত ভিতরের অংশ যা কোষ বিভাগের সময়ও নষ্ট হয় না। মাইটোসিসের সময় নিউক্লীওলোনীমা সমানভাবে বিভক্ত হয়ে দুইটা অপত্য কোষে যায়। (b) পার্স এমরফা (*pars amorpha*) এই অংশটা দানাদার ও বাইরের দিকে থাকে। প্রফেজের শেষে এটা অদৃশ্য হয়ে যায় ও টেলোফেজে পুনর্গঠিত হয়।

নিউক্লীওলাসে প্রোটীন, RNA, DNA, সামান্য লিপিড, এনজাইম ও খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। নিউক্লীওলাসের শুষ্ক ওজনের 90 শতাংশ পর্যন্ত প্রোটীন পাওয়া গিয়েছে। RNA-র পরিমাণ শুষ্ক ওজনের 8—17 শতাংশ ও DNA-র পরিমাণ 7–10 শতাংশ। নিউক্লীওলাসে এলকালাইন ফসফাটেস্ (*alkaline phosphatase*), আর. এন. এ. পলিমারেস্ (*R.N.A. polymerase*), রাইবোনিউক্লীয়েস্ (*ribonuclease*) প্রভৃতি এনজাইম পাওযা যায়। খনিজ পদার্থের মধ্যে ফসফরাস, গন্ধক (*sulpher*) ও কখনও কখনও পটাশিযাম ও ক্যালসিয়াম থাকে।

নিউক্লীওলাসের প্রধান কাজ হল প্রোটীন ও রাইবোসোমীয় আর এন এ উৎপাদনে সাহায্য করা। যেসব কোষে প্রোটীন উৎপাদন খুব তাড়াতাড়ি হয় সেখানে নিউক্লীওলাসগুলি বড় ও সুগঠিত হয়। অনেক বিজ্ঞানী মনে

করেন যে নিউক্লীওলাসে বিভিন্ন পদার্থ সঞ্চিত থাকে। Strasburger-এর মতে নিউক্লীওলাস (*nucleolus*) স্পিণ্ডল তন্তু (*spindle fibre*) গঠন করতে সাহায্য করে। নিউক্লীয়াসের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি নিউক্লীওলাসে থাকে। এর মাধ্যমে ক্রোমোসোম সাইটোপ্লাজমকে প্রভাবিত করে।

পঞ্চম অধ্যায়

কোষ বিভাগ

সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধর্মই হ'ল যে তারা বড় হতে পারে। উদ্ভিদের কাণ্ড, মূলের অগ্রভাগ ক্রমাগত বাড়তে পারে। এই বৃদ্ধির সময় নূতন নূতন কোষেব সৃষ্টি হয়। সব কোষই আগের কোন কোষের বিভাগের ফলে তৈরী হয। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা কোষ বিভাগ লক্ষ্য করেন।

সাধারণতঃ কোষ বিভাগের সময় নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজম দুইটাই বিভক্ত হয়। কিন্তু কখনও কখনও কেবল নিউক্লীয়াস কিম্বা কেবল সাইটোপ্লাজমের বিভাগ হয়। যেসব উদ্ভিদের দেহ সিনোসাইটিক (অর্থাৎ যাদের দেহে মধ্যবর্তী প্রাচীর নাই) সেখানে শুধু নিউক্লীয়াসের বিভাগ হয়। সী অর্চিনের (*sea urchin*) ডিম্বাণুতে নিউক্লীও বিভাগ ছাড়াই সাইটোপ্লাজমেব বিভাগ হয। কোষ বিভাগের হার জীবের প্রয়োজন, জেনেটিক গঠন, বয়স ও পরিবেশের উপব নির্ভর কবে। একটা জীব থেকে অন্য জীবে কোষ বিভাগের ধারাব কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল প্রক্রিয়াটা মোটামুটি একই।

মাইটোসিস (*mitosis*)

কোষ বিভাগ বিভিন্ন বকমের হয। যে ধবণেব কোষ বিভাগ দেহ কোষে দেখা যায় সেই বিভাগকে মাইটোসিস (*mitosis*) বলে। Flemming (1882) প্রাণী কোষে এবং Strasburger উদ্ভিদ কোষে মাইটোসিস বিভাগের বর্ণনা দেন। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাগের ফলে দুইটা সমান আকাবের অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। এই অপত্য কোষ দুইটার ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান হয়। এই কারণে মাইটোসিস বিভাগকে অনেক সময় সমবিভাগ (*equational division*) বলা হয়। মাইটোসিস দেহ কোষে, (যেমন উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগের কোষে) দেখা যায় এইজন্য এই বিভাগকে সোমাটিক (*somatic*) কোষ বিভাগও বলা হয়।

মাইটোটিক বিভাগের ফলে সমান আকৃতির ও প্রকৃতির দুইটা অপত্য কোষ গঠিত হয়। এই অপত্য কোষগুলি বিভক্ত হলে আবার একই আকৃতি ও প্রকৃতির নূতন অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। বহুকোষী জীবের বেলায়

এইরকম কোষ বিভাগের ফলে ঐ জীবের আয়তন বাড়ে। কিন্তু এক-কোষী জীব কোষ বিভাগের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ এখানে কোষ বিভাগ হ'ল অঙ্গজ জননের একটা পদ্ধতি। অনেক সময় দেহের কোন কোন কোষ নষ্ট হয়ে যায় ও তাদের জায়গায় নূতন কোষের প্রয়োজন হয়, যেমন মানবদেহের রক্তের এরিথ্রোসাইট (*erythrocyte*) ও চোখের কর্ণিয়ার (*cornea*) বাইরের কোষগুলি। সুতরাং জীবের বৃদ্ধি ও সংস্কারের জন্য সবসময় নূতন কোষের প্রয়োজন ও এই নূতন কোষ কোষ বিভাগের মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে। কোষ বিভাগের মাধ্যমে নিউ-ক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

মাইটোসিস বিভাগের প্রথমে নিউক্লীয়াসটা দুইটা সমান অপত্য নিউ-ক্লীয়াসে বিভক্ত হয়। নিউক্লীয়াসের এই বিভাগকে **ক্যারিওকাইনেসিস** (*karyokinesis*) বলে। 1878 খৃষ্টাব্দে Schleicher ক্যারিওকাইনেসিস শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেন। নিউক্লীয়াসের বিভাগের পরে সাইটোপ্লাজমের বিভাগ হয়। Whitmann 1887 খৃষ্টাব্দে সাইটোপ্লাজমের এই বিভাগকে **সাইটোকাইনেসিস** (*cytokinesis*) নামকরণ করেন। কোষ বিভাগের সময় কোষে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়। এইসব পরিবর্তন একটার পর আরেকটা পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে যতক্ষণ না কোষটা সম্পূর্ণ বিভক্ত হচ্ছে। মাইটোসিস বিভাগকে বর্ণনার সুবিধার জন্য কয়েকটা অবস্থায় বা দশায় (*stage*) ভাগ করা হয়। এই দশাগুলি হচ্ছে প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ। অনেক সময় প্রোফেজ থেকে মেটাফেজের পরি-বর্তনকে প্রোমেটাফেজ বলা হয়। দুইটা মাইটোসিস বিভাগের মধ্যবর্তী অবস্থাকে ইন্টারফেজ বলা হয়। ইন্টারফেজ ও মাইটোসিস বিভাগের বিভিন্ন দশার বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

ইন্টারফেজ (*interphase*)

এই অবস্থায় কোষ বিভাগ হয় না বলে ইন্টারফেজকে (চিত্র 39) বিশ্রাম অবস্থাও (*resting stage*) বলা হয়। এই সময় কোষটা কোষবিভাগ ছাড়া অন্য সব কাজ করে সেইজন্য এইরকম কোষকে মেটাবলিক (*metabolic*) কোষও বলা হয়ে থাকে। ইন্টারফেজে নিউক্লীয়াসের মধ্যে প্রোক্রোমোসোম (*prochromosome*) ও নিউক্লীওলাস স্পষ্ট দেখা যায়।

এইসময় খুব সরু সূতার মত ক্রোমোসোমগুলি পরস্পর জড়িয়ে থাকে ও এদের আলাদা ভাবে দেখা যায় না। নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণীর কোষ থেকে ইন্টারফেজ অবস্থায় সম্পূর্ণ ক্রোমোসোম

চিত্র ৩৭
মাইটোসিস বিভাগের বিভিন্ন অবস্থা

নিষ্কাশন করা হয়েছে, এর থেকে ই·টারফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। তাছাড়া প্রোক্রোমোসোমের উপস্থিত ক্রোমো-সোমের স্থায়িত্বের আরেকটা নিদর্শন। ক্রোমোসোমগুলি বিশ্রাম অবস্থায় সামান্য পেঁচান বা কুন্ডলিত *(coiled)* থাকে। এইসব পেঁচ আগের মাইটো-সিস বিভাগের সময় গঠিত পেঁচ বা কুন্ডলের *(coil)* অবশিষ্টাংশ। এই পেঁচগুলিকে *relic coil* বা স্মারক কুন্ডল বলা হয়। ইন্টারফেজ অবস্থার স্থায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীতে বিভিন্ন রকমের হয়। কোথাও ই·টারফেজ অবস্থার স্থায়িত্ব 18 – 24 ঘণ্টা আবার কোথাও বা এর স্থায়িত্ব কয়েক দিন পর্যন্ত হয়। ই·টারফেজ অবস্থাকে তিনটা পর্যায়ে ভাগ করা হয় – G_1 অবস্থা, S অবস্থা এবং G_2 অবস্থা। G_1 *(G=gap)* অবস্থায় ডি· এন· এ· (DNA) উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তু ও এনজাইমের সৃষ্টি হয় এবং আর এন· এ· (RNA) ও প্রোটীন তৈরী হয়। S অবস্থায় *(S = synthesis)* ডি এন· এ· গঠিত হয়। G_2 অবস্থায় সব রকমেব মেটাবলিক (বিপাকীয়) কাজ হয়ে থাকে। ডি· এন এ· উৎ-পাদন সম্পূর্ণ না হ'লে মাইটোসিস বিভাগ আরম্ভ হতে পারে না। ই·টারফেজ অবস্থায় কোষ ও নিউক্লীয়াসের আয়তন বাড়ে।

প্রফেজ *(prophase)*

প্রফেজ (চিত্র 39) মাইটোসিস বিভাগের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা। প্রফেজ আরম্ভ হবার সাথে সাথেই নিউক্লীও জালিকাটা কতকগুলি সরু, আকাবাঁকা সুতার মত অংশে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রথম অবস্থায় এই সুতাগুলি পরস্পর জড়ান থাকে পরে এগুলি আলাদা হয়ে যায়। এই সূত্রগুলিকে “ক্রোমোনিমা” *(chromonema)* বলে। কোন কোন সময় ক্রোমোনিমায় বড় বড় পেঁচ বা কুন্ডল (*relic coil* বা স্মাবক কুন্ডল) দেখা যায়। এর পর প্রত্যেকটা ক্রোমোনিমা লম্বালম্বিভাবে দুইটা অংশে বিভক্ত হয়। প্রফেজের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রোমোনিমাটা ক্রমশঃ ছোট ও মোটা হতে থাকে। ক্রোমোনিমার চারিদিকে এইসময় ম্যাট্রিক্স দেখা দেয় ও ম্যাট্রিক্সের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এইসব সূত্রকে ক্রোমোসোম *(chromosome)* বলে। প্রত্যেক ক্রোমো-সোমে দুইটা ক্রোমাটিড সমান্তরালভাবে থাকে। প্রতোক ক্রোমাটিডে *(chromatid)* ক্রোমোনিমা ম্যাট্রিক্স দিয়ে আবৃত থাকে। এইসময় ক্রোমোসোমের দ্বিগুণ প্রকৃতি ভাল করে বোঝা যায়। ক্রোমাটিড দুইটা পরস্পর ভালভাবে পেঁচান থাকে। এই পেঁচগুলিকে প্লেকটোনেমিক কয়েলিং *(plectonemic coiling)* বলে (চিত্র 49)। জলের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে যাবার

ফলে ক্রোমোসোমগুলি আরও ঘনীভূত *(condensed)* হয়। প্রত্যেকটা ক্রোমাটিড লম্বালম্বিভাবে আবার বিভক্ত হয়ে দুইটা অর্ধক্রোমাটিডের সৃষ্টি করে অর্থাৎ এই অবস্থায় প্রত্যেক ক্রোমোসোমে চারটা অর্ধক্রোমাটিড থাকে। ক্রোমাটিডে দুই রকমের পেঁচ দেখা যায়—*major coil* বা মুখ্য কুণ্ডল এবং *minor coil* বা গৌন কুণ্ডল (চিত্র 40a, b)। প্রফেজের অগ্রগতির সাথে

চিত্র 40a
ক্রোমোসোমের পেঁচ বা কয়েল

সাথে মুখ্য কুণ্ডলেব সংখ্যা কমে যায় কিন্তু ব্যাস বাড়ে। প্রফেজের শেষভাগে নিউক্লীওলাস ও নিউক্লীও পর্দা ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়। প্রফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি ছড়ান থাকে। এব কাবণ সম্ভবতঃ ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে বিকর্ষণ। প্রাণীর কোষে প্রফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি নিউক্লীও পর্দার দিকে অবস্থান কবে এবং সেন্ট্রোসোমটা *(centrosome)* বিভক্ত হয়ে দুইটা অপত্য সেন্ট্রোসোমের সৃষ্টি করে।

b
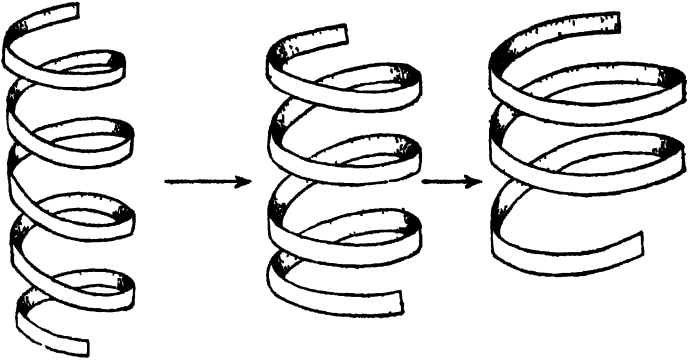
চিত্র 40b

মুখ্য পেঁচ বা মেজর কয়েলের সংখ্যা কমছে কিন্তু ব্যাস বাড়ছে। গৌন পেঁচ (মাইনর কয়েল) দেখান হয় নাই।

প্রোমেটাফেজ বা প্রিমেটাফেজ (*pro metaphase* বা *premetaphase*) **বা প্রাক্-মেটাফেজ অবস্থা**

এই অবস্থায় স্পিণ্ডিল (*spindle*) তৈরী হয়। প্রথমে কতকগুলি সরু সুতার সৃষ্টি হয় ও পরে ঐ সুতাগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে স্পিণ্ডল গঠন করে। সাধারণতঃ স্পিণ্ডিলের মাঝখানটা মোটা ও দুই প্রান্ত ক্রমশঃ সরু থাকে। এই প্রান্ত দুইটাকে মেরু বা *pole* ও মাঝখানের অঞ্চলকে নিরক্ষরেখা বা *equator* বলে। কোন কোন প্রাণীর স্পিণ্ডিল পিপাকৃতির হয় ও এদের মেরু দুইটা চ্যাপটা থাকে; আবার কোন কোন পতঙ্গের স্পিণ্ডলের মেরু দুইটা ছড়ান থাকে। স্পিণ্ডিল প্রধানতঃ প্রোটীন ও সামান্য RNA দিয়ে তৈরী। স্পিণ্ডিল রঙ নেয় না বলে এদের *achromatic figure* বা বর্ণহীন গঠন বলা হয়ে থাকে। কোষ বিভাগে স্পিণ্ডিলের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ স্পিণ্ডল স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না পারলে কোষ বিভাগও অস্বাভাবিক হয়। সাধারণতঃ স্পিণ্ডিলের তন্তুগুলিকে (*fibre*) দেখা যায় না, কিন্তু অ্যাসিড বা অম্ল মাধ্যমে এই তন্তুগুলিকে দেখা যায়। যেহেতু বেশীর ভাগ ফিক্সেটিভে অ্যাসিড থাকে সেজন্য কিছু বিজ্ঞানী স্পিণ্ডিলের উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু 1944 খৃষ্টাব্দে Schrader সজীব কোষে স্পিণ্ডিল তন্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোষ থেকে ক্রোমোসোম সমেত

স্পিন্ডলকে বের করা সম্ভব হয়েছে এবং এর থেকে স্পিন্ডলের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে স্পিন্ডলের সৃষ্টি দুইটা পর্যাযে হয়। প্রথম পর্যায়ে সাইটোপ্লাজম থেকে যে স্পিন্ডল তৈরী হয তাকে *central spindle* বা কেন্দ্রীয় স্পিন্ডল বলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিউক্লীও মেমব্রেনের অবলুপ্তির পর নিউক্লীও বস্তু থেকে স্পিন্ডলের ক্রোমোসোমীয় তন্তুগুলি গঠিত হয়।

প্রোমেটাফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি নিরক্ষরেখার দিকে যেতে চায় এবং ক্রোমোসোমগুলির সেন্ট্রোমিয়ার অংশ স্পিন্ডল তন্তুর সাথে যুক্ত থাকে।

মেটাফেজ (*metaphase*)

কোষ বিভাগেব অন্যান্য অবস্থাব তুলনায় মেটাফেজ (চিত্র 39) স্থির অবস্থা। মেটাফেজে ক্রোমোসোমগুলি স্পিন্ডল তন্তুর সাথে নিবক্ষ-রেখায় (*equator*) সংযুক্ত থাকে। প্রত্যেক ক্রোমোসোমের সেন্ট্রো-মিয়ার অংশ নিরক্ষবেখায় অবস্থান করে এবং বাহু দুইটা যে কোন দিকে প্রসারিত থাকে। যেসব তন্তুর সাথে সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত থাকে তাদের আকর্ষ তন্তু (*tractile fibre*) বা ক্রোমোসোমীয় তন্তু (*chromosomal fibre*) কিম্বা বিচ্ছিন্ন তন্তু বলে। স্পিন্ডলেব যেসব তন্তু এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাদেব অবিচ্ছিন্ন বা সহযোগী (*supporting fibre*) তন্তু বলে। ক্রোমোসোমীয় তন্তুব প্রকৃতি বিতর্কিত। কিছু বিজ্ঞানীগণের মতে এই তন্তু ক্রোমাটিডেব সম্প্রসারিত অংশ কিম্বা ক্রোমাটিড থেকে সৃষ্ট কোন পদার্থ দিযে গঠিত। আবাব অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতে ক্রোমোসোমীয তন্তু নিউক্লীও রস কিম্বা সাইটোপ্লাজম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ক্রোমোসোমীয় তন্তু ফালগেন রঙ (*feulgen stain*) দিয়ে রঞ্জিত কবা যায়। এজন্য মনে কবা হয যে এই তন্তু ক্রোমোসোমেব থেকেই সৃষ্টি হযেছে। সহযোগী তন্তু সাইটোপ্লাজম থেকে তৈরী হয়।

Schrader 1953 খৃষ্টাব্দে বলেন যে স্পিন্ডল গঠনের উপর নির্ভর করে মাইটোসিসকে দুইটা ভাগ কবা যায— (a) প্রত্যক্ষ (*direct*) এবং (b) পবোক্ষ (*indirect*) মাইটোসিস (চিত্র 41a, b)। প্রত্যক্ষ মাইটো-সিসে স্পিন্ডলে ক্রোমোসোমীয তন্তু থাকে। পবোক্ষ মাইটোসিসে কেবল সহযোগী তন্তু (*supporting fibre*) দেখা যায়। এইসব সহযোগী তন্তু নিউক্লীও পর্দা লোপ পাবার আগেই সৃষ্টি হয়। এই তন্তুর বাইরের দিকে ক্রোমোসোমগুলি আটকানো থাকে। ক্রোমোসোমীয় বা আকর্ষ তন্তু (*tractile fibre*) একদিকে সেন্ট্রোমিয়ারেব সাথে অন্যদিকে মেরুর সাথে

যুক্ত থাকে। এজন্য মনে করা হয় যে ক্রোমোসোমীয় তন্তু সেন্ট্রোমিয়ার ও মেরুর প্রভাবে গঠিত হয়। অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে সব মাইটোসিসই প্রত্যক্ষ ধরণের।

চিত্র 41
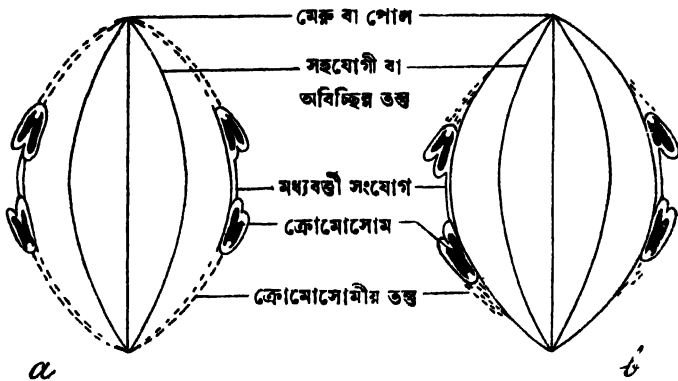
বিভিন্ন ধরণের স্পিণ্ডল *a*—প্রত্যক্ষ, *b*—পরোক্ষ

মেটাফেজে সেণ্ট্রোমিয়ার সাধারণতঃ অবিভক্ত অবস্থায় থাকে। ক্রোমোসোমগুলি মেটাফেজে সবচেয়ে ছোট ও মোটা দেখায়। এই সময় মুখ্য কুণ্ডলের (*major coil*) সংখ্যা সবচেয়ে কম হলেও এদের ব্যাস সবচেয়ে বেশী হয়। মেটাফেজে ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটার মধ্যের পেঁচ খুলে যায় ফলে ক্রোমাটিড দুইটা আলাদা হয়ে পাশাপাশি থাকে। প্রাণীর কোষের মেটাফেজে দুইটা মেরু থেকে অনেক সুতার মত রশ্মি (*ray*) সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে পড়ে এদের অ্যাষ্টারীয় রশ্মি বা *astral ray* (চিত্র ২৪) বলে। একটা মেরুর অ্যাষ্টারীয় রশ্মিগুলিকে একসাথে *aster* বলা হয়। সাধারণতঃ ক্রোমোসোমগুলি স্পিণ্ডিলের পরিধির দিকে নিরক্ষরেখায় (*equator*) সাজান থাকে। ক্রোমোসোমগুলি খুব ছোট ও অসংখ্য হলে ঐগুলি নিবক্ষরেখার সব জায়গায় ছড়ান থাকে। যেসব জীবে ক্রোমোসোমের আয়তনের যথেষ্ট তারতম্য আছে সেখানে বড় ক্রোমোসোমগুলি স্পিণ্ডলের পরিধির দিকে থাকে। মেটাফেজের শেষে সেণ্ট্রোমিয়ারটা বিভক্ত হয়।

অ্যানাফেজ (*anaphase*)

অ্যানাফেজে (চিত্র 39) প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটা বিপরীত মেরুর দিকে যেতে আরম্ভ করে। এই সময় ক্রোমাটিডগুলিকে অপত্য (*daughter*) ক্রোমোসোম বলে। সেন্ট্রোমিয়ার অংশটা সবচেয়ে আগে মেরুর দিকে যায় ও বাহু দুইটা পেছনে থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর উপর নির্ভর করে অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমগুলি বিভিন্ন আকারের হয় যেমন V-আকৃতির, J-আকৃতির কিম্বা I আকৃতির। দুই মেরুর দিকে চলনশীল ক্রোমোসোমগুলি কতকগুলি তন্তু দিয়ে যুক্ত থাকে। এদের সংযোগকারী তন্তু বা ইণ্টারজোনাল ফাইবার (*interzonal fibre*) বলে। অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের পেঁচগুলি খুলতে আরম্ভ করে এই অবস্থার শেষ দিকে আকর্ষতন্তু (*tractile fibre*) ও ম্যাট্রিক্স অদৃশ্য হয় ও ক্রোমো নিমা আবার দেখা যায়। ক্রোমোসোমগুলি মেরুতে পেঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানাফেজের সমাপ্তি হয়।

অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের সঞ্চলনের (*movement*) কারণ নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। বিভিন্ন মতগুলি হ'ল— (*a*) আকর্ষ তন্তুর প্রোটীন অণু-গুলির সঙ্কোচনের জন্য ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে যায়। (*b*) কোন কোন বিজ্ঞানীগণের মতে ক্রোমোসোমের কাছে সাইটোপ্লাজমে পর্যায়ক্রম ঘনত্বের তারতম্যই ক্রোমোসোমগুলির সঞ্চলনের কারণ। (*c*) মেরুর দিকে সাইটোপ্লাজমের একটা ক্ষীণ প্রবাহ দেখা যায় ও এই প্রবাহই ক্রোমোসোম-গুলিকে মেরুর দিকে চালিত করে। যেসব কোষে অ্যাস্টার (*aster*) থাকে সেখানে মেরুর দিকে একটা স্রোত প্রবাহিত হতে দেখা গিয়েছে। (*d*) স্পিণ্ডলের দৈর্ঘ্য বাড়ার জন্য ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে যায় (Belar '29, Barber '39, Ris '43, '49, Hughes ও Swann '48)। (*e*) ক্রোমোসোমগুলিতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ (−) ও মেরুতে ধনাত্মক বিদ্যুৎ (+) থাকে। এইজন্য ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে আকৃষ্ট হয়। Darlington-এর মতে স্থির বৈদ্যুতিক (*electrostatic*) শক্তিই ক্রোমো-সোমকে চালিত করে। (*f*) ক্রোমোসোমগুলির প্রাথমিক গতি আকর্ষ তন্তুর সঙ্কোচনের জন্য হয় ও পরবর্তী গতি স্পিণ্ডলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। স্পিণ্ডলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে মাঝের অংশটা সরু হয়ে যায় এবং ঐ অংশটাকে "স্টেম বডি" (*stem body*) বলা হয়। (*g*) কোন কোন বিজ্ঞানীগণের মতে অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের প্রাথমিক গতি দুইটা অপত্য ক্রোমাটিডের সেন্ট্রোমিয়ারগুলির মধ্যে বিকর্ষণের জন্য হয় (Lillie 1909)।

Ris-এর (1943) মতে প্রাণী কোষে স্পিণ্ডলের দৈর্ঘ্য বাড়ার জন্য ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে যায়। কিন্তু উদ্ভিদকোষে স্পিণ্ডলের সঙ্কোচনের ফলে ক্রোমোসোমগুলি মেরুর দিকে চালিত হয়।

টেলোফেজ (*telophase*)

টেলোফেজে (চিত্র 39) দুইটা অপত্য নিউক্লীয়াস গঠিত হয়। স্পিণ্ডলটা নষ্ট হয়ে যায় তবে "স্টেম বডি" থাকলে তা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। টেলোফেজে কোষে যেসব পরিবর্তন দেখা যায় তা ঠিক প্রফেজের বিপরীত। ক্রোমোসোমগুলির পেঁচ বা কুণ্ডল খুলে যায় ফলে ক্রোমোসোমগুলি খুব লম্বা হয়। তবে ক্রোমোসোমের কিছু কিছু গৌন কুণ্ডল (*minor coil*) অবশিষ্ট থাকে যা পরের বিভাগের প্রফেজে স্মারক কুণ্ডল (*relic coil*) হিসাবে দেখা দেয়। এই সময় ক্রোমোসোমের ম্যাট্রিক্স থাকে না বলে ক্রোমানিমাগুলি দেখা যায়। এইসব ক্রোমানিমা পরস্পর জড়িয়ে নিউক্লীও জালিকার সৃষ্টি করে। বিশেষ ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট জায়গায় নিউক্লীওলাসের সৃষ্টি হয়। নিউক্লীও রস এবং নিউক্লীও পর্দা তৈরী হয়। এইভাবে দুইটা অপত্য নিউক্লীয়াস গঠিত হয়।

সাইটোকাইনেসিস (*cytokinesis*) **বা সাইটোপ্লাজমের বিভাগ**

সাধারণতঃ টেলোফেজ অবস্থাতেই সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। এই সময় *equator* বা নিরক্ষরেখা অঞ্চলে ছোট ছোট দানার মত পদার্থ (এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের অংশ) জমা হয়। পরে এইসব দানাগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটা পর্দা বা সেল প্লেট (*cell plate*) তৈরী করে। এই কোষ পর্দা রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে মিডিল ল্যামেলা (*middle lamella*) বা মধ্যপর্দা গঠন করে। এই মধ্যপর্দার দুই দিকে সেলুলোজের প্রাচীর তৈরী হওয়ার পর কোষ বিভাগ সমাপ্ত হয়। কোন কোন প্রাণীতে সাইটোকাইনেসিস খাঁজ গঠনের মাধ্যমে হয়। এইসব ক্ষেত্রে প্লাজমা মেমব্রেন একটা খাঁজ গঠন করে যা ক্রমশঃ কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয় ও পরে মিলিত হয়। এইভাবে সাইটোপ্লাজমের বিভাগ সম্পূর্ণ হয়। সাইটোকাইনেসিস বিভিন্ন সময় হতে পারে। কোন কোন কোষে নিউক্লীয়াসের বিভাগের সাথে সাথেই সাইটোপ্লাজমের বিভাগ হয় আবার কখনও কখনও ক্যারিওকাইনেসিসের (*karyokinesis*) অনেক পরে সাইটোকাইনেসিস হয়ে থাকে।

মাইটোসিস বিভাগের স্থায়িত্ব

মাইটোসিস বিভাগ সম্পূর্ণ করবার জন্য বিভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রয়োজন হয়। ঐ জীবের প্রকৃতি, তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর মাইটোসিস বিভাগের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। *Tradescantia*-র পুংকেশরের রোমে (*staminal hair*) 10°C তাপমাত্রায় কোষ বিভাগ সম্পূর্ণ করতে 135 মিনিট সময় লাগে; 25°C-এ কোষ বিভাগ 75 মিনিটে এবং 45°C-এ কোষ বিভাগ 30 মিনিটে সম্পূর্ণ হয়। *Arrhenatherum*-এর গর্ভমুণ্ডের (*stigma*) রোমে 19°C তাপমাত্রায় কোষ বিভাগ সম্পূর্ণ করবার জন্য 78—110 মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। ঐ একই তাপমাত্রায় বাদামী রঙের শৈবাল (*Phaeophyceae*) *Sphacelaria* 39 মিনিটের চেয়ে কম সময়ে কোষ বিভাগ সম্পূর্ণ করে।

কোষ বিভাগের বিভিন্ন অবস্থার স্থায়িত্বও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণতঃ প্রফেজ অবস্থা সবচেয়ে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়, টেলোফেজ প্রফেজের চাইতে কম সময় স্থায়ী হয। অ্যানাফেজ ও মেটাফেজ স্বল্পস্থায়ী। তবে বিভিন্ন উদ্ভিদে মাইটোসিসের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের স্থায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। পেঁয়াজের মূলের কোষে 20°C তাপমাত্রায় প্রফেজ 71 মিনিট, মেটাফেজ 6.5 মিনিট, অ্যানাফেজ 2.4 মিনিট এবং টেলোফেজ 3.8 মিনিট স্থায়ী হয়। মটরশুটীর মূলের কোষে 20°C তাপমাত্রায় প্রফেজ 78 মিনিট, মেটাফেজ 14.4 মিনিট, অ্যানাফেজ 4.2 মিনিট ও টেলোফেজ 13.2 মিনিট স্থায়ী হয়। *Arrhenatherum*-এর গর্ভমুণ্ডের রোমের কোষে 19°C তাপমাত্রায় প্রফেজ 36—45 মিনিট, মেটাফেজ 7—10 মিনিট, অ্যানাফেজ 15—20 মিনিট এবং টেলোফেজ 20—30 মিনিট স্থায়ী হয়।

মাইটোসিসের তাৎপর্য

(1) মাইটোসিসের মাধ্যমে নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

(2) মাইটোসিসের ফলে যে দুইটা অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়, সেগুলি মাতৃকোষের যথার্থ প্রতিলিপি অর্থাৎ তাদের ক্রোমোসোমের সংখ্যা, প্রকৃতি, আয়তন সবই মাতৃকোষের অনুরূপ হয়। বারবার মাইটোটিক বিভাগের ফলে একই জেনেটিক গঠনের অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং কেবল মাইটোসিসের মাধ্যমেই দেহের বৃদ্ধি সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারে।

(3) মাইটোসিসের ফলে বহুকোষী জীব বড় হতে পারে। বহুকোষী জীবের দেহে অসংখ্য কোষ (মানুষের দেহের কোষের সংখ্যা 10^{14}) থাকে। কিন্তু একটা কোষ থেকেই জীবনের সুরু হয়, বারবার মাইটোসিসের ফলে পরে বহুসংখ্যক কোষের সৃষ্টি হয়।

(4) এককোষী জীব মাইটোসিস পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।

(5) অঙ্গজ জননের জন্য মাইটোসিসের প্রয়োজন প্রশ্নাতীত।

(6) জীবদেহের কোন অংশ আঘাতের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে মাইটোসিস ঐ জায়গায় নূতন কোষের প্রয়োজন মেটায়। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর দেহের কোন অংশ ভেঙ্গে গেলে মাইটোসিসের মাধ্যমে ঐ অংশ পুনর্গঠিত (পুনরুৎপাদন) হয়।

(7) দেহের কোন কোন কোষ (যেমন মানবদেহের রক্তের এরিথ্রোসাইট ও চোখের কর্ণিয়ার বাইরের কোষগুলি) বেশী দিন বাঁচে না। সুতরাং তাদের জায়গায় নূতন কোষের প্রয়োজন হয়। মাইটোসিস সেই প্রয়োজন মেটায়।

(8) কোন জীবে মাইটোটিক বিভাগ সুষ্ঠুভাবে না হ'লে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। দেহের কোন অংশে মাইটোসিসের হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে কর্কট রোগের *(cancer)* সৃষ্টি হয়।

মায়োসিস *(meiosis)*

মায়োসিসের ফলে কোন কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হয়, এইজন্য এই বিভাগকে সংখ্যাহ্রাসকারী বিভাগ বা *reduction division* বলে। সব যৌন জননশীল জীবে দুইটা হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটের মিলনের (*fertilization* বা নিষেক) ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোটের সৃষ্টি হয়। জীবন চক্রের কোন পর্যায়ে ডিপ্লয়েড সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হ্যাপ্লয়েড হয়। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে ফার্টিলাইজেশনের পরেই ডিপ্লয়েড জাইগোটে মায়োসিস হয়, ফলে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের (লিঙ্গধর উদ্ভিদ বা গ্যামেটোফাইট) সৃষ্টি হয়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের দেহ ডিপ্লয়েড (রেণুধর উদ্ভিদ বা স্পোরোফাইট) এবং এখানে মায়োসিস রেণু তৈরীর ঠিক আগে হয়। প্রাণীর বেলায় মায়োসিস গ্যামেট তৈরীর সময় হয়ে থাকে। সুতরাং মায়োসিস হ'ল ফার্টিলাইজেশনের বিপরীত প্রক্রিয়া। প্রত্যেক ডিপ্লয়েড কোষে ক্রোমোসোমগুলি জোড়ায় থাকে। কোন জোড়ার দুইটা সদস্য একটা অন্যটার অনুরূপ হয় ও এদের হোমোলোগ বা হোমোলোগাস *(homologous)* ক্রোমোসোম বলে। প্রত্যেক জোড়ার একটা ক্রোমোসোম পুংগ্যামেট থেকে অন্যটা স্ত্রীগ্যামেট
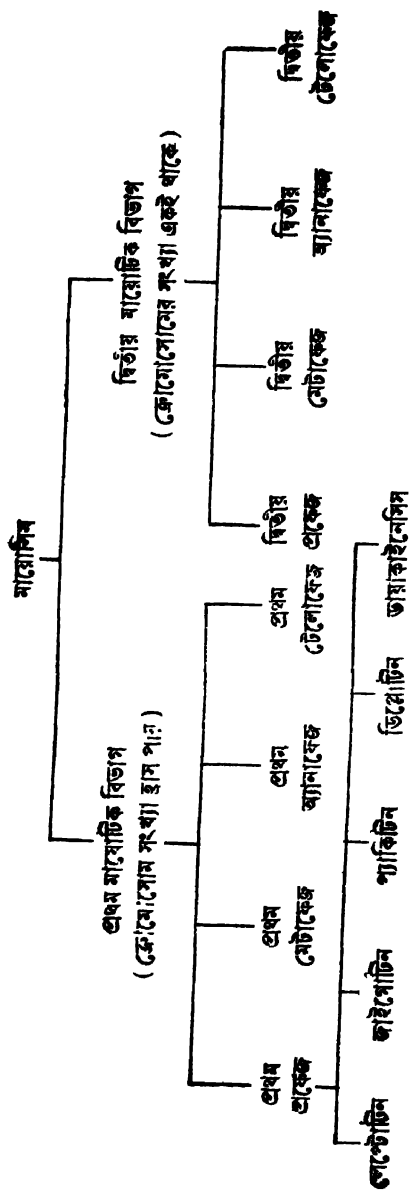
চিত্র 42
মায়োসিসের বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগগুলি দেখান হয়েছে

থেকে আসে। একটা ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীনগুলি এর হোমোলোগের জীনগুলি থেকে মিউটেশনের জন্য সামান্য আলাদা হতে পারে। মায়োসিসের ফলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি আলাদা হয়ে বিপরীত মেরুতে যায়।

1883 খৃষ্টাব্দে Strasburger মায়োসিস বিভাগ লক্ষ্য করেন। 1905 খৃষ্টাব্দে Farmer ও Moore এই রকমের বিভাগকে "মায়োসিস" নাম দেন। মায়োসিস কেবল জনন কোষে হয়। যেসব কোষে মায়োসিস হয় তাদের মায়োসাইট *(meiocyte)* বলে। এই কোষগুলি পাশের অন্য কোষের তুলনায় বড় থাকে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীতে মায়োসিস মূলতঃ একই রকমের। মায়োসিসে নিউক্লীয়াসটা দুইবার বিভক্ত হয়; ফলে একটা নিউক্লীয়াস থেকে চারটা নিউক্লীয়াসের সৃষ্টি হয়। প্রথম বিভাগে ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস পায় ও এই বিভাগকে প্রথম মায়োটিক বিভাগ বা হেটারোটিপিক *(heterotypic)* বিভাগ বলা হয়। দ্বিতীয় বিভাগের ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা একই থাকে এবং এই বিভাগকে দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাগ বা হোমোটিপিক *(homotypic)* বিভাগ বলা হয়ে থাকে। মাইটোসিসের মত প্রথম ও দ্বিতীয় মায়োসিসকে কতকগুলি অবস্থা বা দশায় *(stage)* ভাগ করা হয়। চিত্র 42 থেকে এই বিভাগগুলি সহজেই বোঝা যাবে।

প্রথম মায়োটিক বিভাগ

প্রথম মায়োসিসকে চারটা ভাগে বিভক্ত করা হয়— প্রথম প্রফেজ, প্রথম মেটাফেজ, প্রথম অ্যানাফেজ এবং প্রথম টেলোফেজ। অনেক সময় প্রথম প্রফেজ এবং প্রথম মেটাফেজের মাঝের অবস্থাকে প্রথম প্রোমেটাফেজ বলা হয়ে থাকে।

প্রথম প্রফেজ *(prophase I)*

প্রথম প্রফেজ (চিত্র 44) দীর্ঘস্থায়ী এবং মাইটোসিসের প্রফেজের তুলনায় অনেক জটিল। বর্ণনা করার সুবিধার জন্য এই অবস্থাকে আবার পাঁচটা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এইসব উপ-বিভাগগুলি হ'ল লেপ্টোটিন, জাইগোটিন, প্যাকিটিন, ডিপ্লোটিন এবং ডায়াকাইনেসিস।

লেপ্টোটিন *(leptotene)*

লেপ্টোটিনে (চিত্র 44) নিউক্লীও জালিকা ভেঙ্গে যায় ও ক্রোমোনিমাগুলি দেখা দেয়। এই সময় ক্রোমোনিমাগুলি খুব লম্বা ও সরু থাকে ও এদের

মতভেদ আছে। কোন কোন জীবে এই অবস্থাতেই DNA তৈরী হয় এবং ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হয়। *Tradescantia*-এ জাইগোটিনের আগে DNA উৎপাদন সম্পূর্ণ হয় না। *Trillium*-এ প্যাকটিন অবস্থার আগেই DNA তৈরী সম্পূর্ণ হয়।

প্রাণী কোষে লেপ্টোটিন অবস্থায় সেন্ট্রোসোমটা বিভক্ত হয় ও দুইটা সেন্ট্রিওল বিপরীত প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে।

জাইগোটিন (*zygotene*)

জাইগোটিন (চিত্র 44) হ'ল প্রফেজের স্বল্পস্থায়ী অবস্থা। এইসময় প্রত্যেকটা হোমোলোগাস (সমসংস্থ) ক্রোমোসোম পরস্পরের কাছে আসে ও জোড়ায় অবস্থান করে। এই অবস্থাকে *synapsis* বা যুগ্মতা বলে। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের কেবল অনুরূপ অংশগুলির মধ্যেই
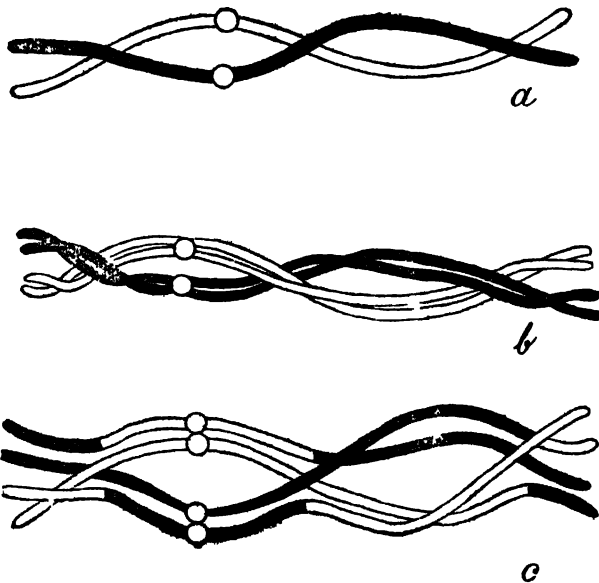
চিত্র 45

প্রথম প্রফেজের বিভিন্ন পর্যায়ে একটা বাইভ্যালেন্ট দেখান হয়েছে। **উপরে**—জাইগোটিন বা প্যাকিটিনের প্রথম দিকে ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হয় নাই; **মাঝে**—প্যাকিটিন প্রত্যেক ক্রোমোসোমে দুইটা ক্রোমাটিড রয়েছে; **নীচে**—ডিপ্লোটিনে কায়েসমা দেখা যাচ্ছে।

সাইন্যাপসিস হয় এবং কোন ক্রোমোসোমের সব অংশ হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের অনুরূপ অংশের সাথে যুগ্ম অবস্থান করে। একটা ক্রোমোসোমের কোন অংশ অস্বাভাবিক হ'লে ঐ অংশ ও হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের স্বাভাবিক অংশের মধ্যে সাইন্যাপসিস হয় না। যুগ্ম অবস্থানকারী প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোসোমকে বাইভ্যালেন্ট (*bivalent*) বলে (চিত্র 44, 45)। যুগ্মতার ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক দেখায়। অর্থাৎ লেপ্টোটিনে 2n ক্রোমোসোম থাকলে প্যাকিটিনে n সংখ্যক বাইভ্যালেন্ট দেখা যাবে। সাইন্যাপসিস বা যুগ্মতা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণতঃ এই যুগ্মতা সেন্ট্রোমিয়ারে আরম্ভ হয়ে দুইটা প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয়। এইরকম যুগ্মতাকে *procentric synapsis* বা প্রাক-কেন্দ্রীয় যুগ্মতা বলে। যুগ্মতা প্রান্তে আরম্ভ হয়ে সেন্ট্রোমিয়ারের দিকে অগ্রসর হ'লে ঐ যুগ্মতাকে *proterminal synapsis* বা প্রাক-প্রান্তীয় যুগ্মতা বলে। ক্রোমোসোমের যে কোন অংশে কিম্বা একই সাথে অনেকগুলি অংশে যুগ্মতা আরম্ভ হ'লে একে মধ্যবর্তী যুগ্মতা (*intermediate synapsis*) বলে। কোন অংশে যুগ্মতা আরম্ভ হ'লে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। এইসময় ক্রোমোসোমগুলি আরও কুণ্ডলিত (*coiled*) হতে থাকে, এজন্য এদের ছোট ও মোটা দেখায়। কুণ্ডলিত হওয়ার ফলে মুখ্য কুণ্ডলগুলির (*major coil*) ব্যাস বাড়ে (চিত্র 40b)। প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটা পরস্পর পেঁচান থাকে। এই পেঁচ বা কুণ্ডলকে প্যারানেমিক কয়েল (*paranemic coil*) বলে (চিত্র 49b)।

প্যাকিটিন (*pachytene*)

জাইগোটিনের (চিত্র 44) তুলনায় প্যাকিটিন বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়। এই অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি আরও ঘনীভূত হওয়ায় ছোট ও মোটা দেখায় এবং বাইভ্যালেন্টগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে চেনা যায়। প্রত্যেক ক্রোমোসোমে দুইটা ক্রোমাটিড দেখা যায়। প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টে চারটা ক্রোমাটিড থাকে ব'লে এদের টেট্রাড (*tetrad*) বলা হয়। প্যাকিটিনে বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম দুইটার মধ্যে আকর্ষণ কমে যায়। এই সময় ক্রোমোসোমগুলি জাইগোটিনের তুলনায় আরও কুণ্ডলিত হয়। মুখ্য কুণ্ডলের (*major coil*) ব্যাস আরও বাড়ে এবং গৌণ কুণ্ডল (*minor coil*) দেখা দেয়। প্যাকিটিনে নিউক্লীওলাসের সাথে নির্দিষ্ট ক্রোমোসোম যুক্ত থাকে এবং বাইভ্যালেন্টগুলি নিউক্লীয়াসের মধ্যে ছড়ান থাকে। যেসব প্রাণীতে ক্রোমোসোমগুলি লেপ্টোটিন ও জাইগোটিনে মেরুঅভিমুখী
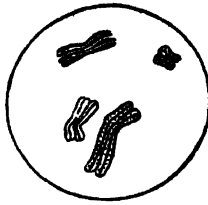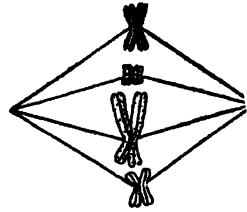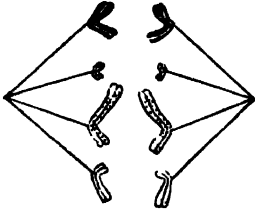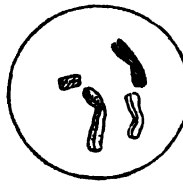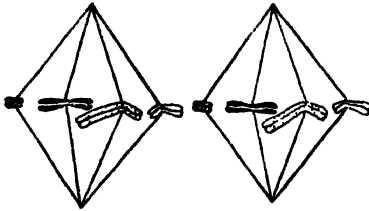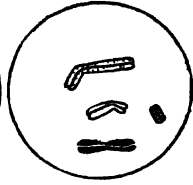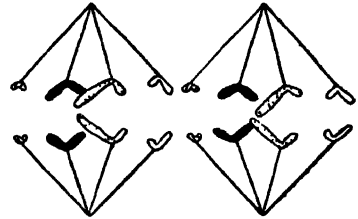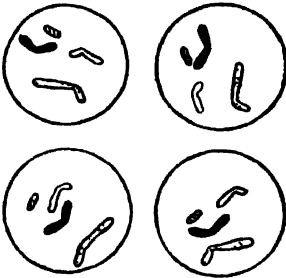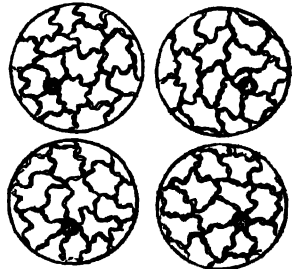
চিত্র 46
মায়োসিস বিভাগের বিভিন্ন অবস্থা নক্সাকারে দেখান হয়েছে

বা *polarized* থাকে সেখানে প্যাকিটিনে পোলারাইজেশনের *(polarization)* মাত্রা কমে যায়।

ডিপ্লোটিন (*diplotene*)

ডিপ্লোটিনে (চিত্র 44) চারটা ক্রোমোটিডের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম দুইটা যা এতক্ষণ পর্যন্ত আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পাশাপাশি ছিল তাদের মধ্যে একটা বিকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। হোমোলোগাস (*homologous*) ক্রোমোসোমগুলি পৃথক হতে আরম্ভ করে কিন্তু এক বা একাধিক স্থানে এরা যুক্ত থাকে। এই সব স্থানকে কায়েসমা (*chiasma, sing-chiasmata*) বলে। কায়েসমার অবস্থানের উপর বাইভ্যালেন্টের আকৃতি নির্ভর করে। একটা কায়েসমা থাকলে বাইভ্যালেন্টটা 'X'- আকৃতির হয়। দুইটা কায়েসমার উপস্থিতিতে বাইভ্যালেন্টটা একটা ফাঁস (*loop*) গঠন করে। অনেকগুলি কায়েসমার উপস্থিতিতে এক সারি ফাঁসের (*loop*) সৃষ্টি হয় (চিত্র 47)। কায়েসমা ক্রোমোসোমের প্রান্তে থাকলে একে প্রান্তীয় (*terminal*) কায়েসমা বলে। কায়েসমা ক্রোমোসোমের বাহুর (*arm*) প্রান্ত ছাড়া অন্য যে কোন অংশে থাকলে একে মধ্যবর্তী (*interstitial*) কায়েসমা বলা হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে সব কায়েসমাই মধ্যবর্তী ধরনের এবং মধ্যবর্তী কায়েসমা প্রান্তের দিকে সরে যাবার ফলে প্রান্তীয় কায়েসমার সৃষ্টি হয়। প্রান্তের দিকে কায়েসমার চলনকে *terminalization* বা প্রান্তিকরণ বলে। একটা ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটাকে ভগিনী ক্রোমাটিড (*sister chromatid*) বলে। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডকে অ-ভগিনী ক্রোমাটিড (*non-sister chromatid*) বলে। কায়েসমার স্থানে অ-ভগিনী ক্রোমাটিড দুইটা ভেঙ্গে যায় ও ভগ্ন প্রান্তের পেঁচ খুলে যায়। একটা ক্রোমাটিডের ভগ্ন অংশ অ-ভগিনী ক্রোমাটিডের ভগ্ন অংশের সাথে যুক্ত হয় অর্থাৎ কয়েসমা অঞ্চলে দুইটা অ-ভগিনী বা নর্নসিস্টার ক্রোমাটিড অংশ বিনিময় করে (চিত্র 45)। এই অংশ বিনিময়কে ক্রসিং ওভার (*crossing over*) বলে। 1969 খৃষ্টাব্দে Stern ও Hotta দেখেন যে এনজাইম এন্ডোনিউক্লিয়েজ দুইটা অ-ভগিনী ক্রোমাটিডকে একই জায়গায় ভেঙ্গে দেয় ও এনজাইম লাইগেস ক্রোমাটিডের ভগ্ন অংশ যুক্ত করে। কায়েসমার সংখ্যা ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। লম্বা ক্রোমোসোমে ছোট ক্রোমোসোমের তুলনায় বেশী কায়েসমা থাকে। একটা ক্রোমোসোমে কায়েসমার সংখ্যা সাধারণতঃ 1—12 পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোন
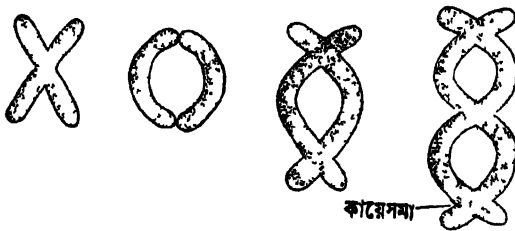
চিত্র 47

বাইভ্যালেণ্টের আকৃতি কায়েসমার অবস্থানের উপর নির্ভর করে

ক্রোমোসোমে একটা কায়েসমার উপস্থিতি দ্বিতীয় কায়েসমা গঠনে বাঁধার সৃষ্টি করে (*interference* বা প্রতিরোধ)।

ডিপ্লোটিন অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি কুণ্ডলিত হয় অর্থাৎ পেঁচিয়ে যায় বলে এদের আরও ছোট ও মোটা দেখায়। এই সময় ম্যাট্রিক্স দেখা যায় ও নিউক্লীওলাসটা ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে।

ডায়াকাইনেসিস (*diakinesis*)

ডায়াকাইনেসিস (চিত্র 44) অবস্থায় ম্যাট্রিক্সের পরিমাণ বাড়ে। ক্রোমোসোমের কুণ্ডলীকরণ বা *coiling* অব্যাহত থাকে বলে এরা ক্রমশঃ ছোট ও মোটা হয়। এই অবস্থায় ক্রোমোসোমের সংখ্যা সহজেই গোনা যায়। বাইভ্যালেন্টগুলি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং নিউক্লীয়াসের পরিধির দিকে সরে যায়। ডায়াকাইনেসিসে কায়েসমাগুলি প্রান্তের দিকে যেতে থাকে। দীর্ঘ ক্রোমোসোমে অনেকগুলি কায়েসমা থাকলে এদের *terminalization* বা প্রান্তিকরণ ডায়াকাইনেসিসে সম্পূর্ণ হয় না। কায়েসমার প্রান্তিকরণের হার নীচের সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়।

$$T = \frac{\text{প্রান্তীয় কায়েসমার সংখ্যা}}{\text{মোট কায়েসমার সংখ্যা}}$$

($T =$ প্রান্তিকরণের পরিমাণ)

ডায়াকাইনেসিসে নিউক্লীওলাসটা ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে ও শেষে অদৃশ্য হয়।

প্রথম প্রোমেটাফেজ (*prometaphase I*)

এই অবস্থায় নিউক্লীও পর্দা অবলুপ্ত হয় ও স্পিণ্ডল তৈরী হয়।

প্রাণী কোষে সেন্ট্রোসোম দুইটা বিপরীত প্রান্তে (মেরুতে) থাকে এবং এদের মধ্যে স্পিণ্ডিল তৈরী হয়।

বাইভ্যালেন্টগুলির সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল স্পিণ্ডিল তন্তুর (*spindle fibre*) সাথে যুক্ত হয় এবং এরা স্পিণ্ডিলের নিরক্ষরেখার (*equator*) দিকে যায়।

প্রথম মেটাফেজ (*metaphase I*)

মেটাফেজে (চিত্র 44, 46) ক্রোমোসোমগুলি সবচেয়ে বেশী ঘনীভূত অবস্থায় থাকে ও এদের মসৃন দেখায়। বাইভ্যালেন্টগুলি স্পিণ্ডিলের নিরক্ষরেখা অঞ্চলে অবস্থান করে। প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টে দুইটা কার্যতঃ অবিভক্ত সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। এই সেন্ট্রোমিয়ার দুইটা নিরক্ষরেখা থেকে সমান দূরত্বে উপরে ও নীচে থাকে। বাহুগুলি নিরক্ষরেখার দিকে থাকে। দুইটা সেন্ট্রোমিয়ারের মধ্যে ব্যবধান কায়েসমার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। কায়েসমা সেন্ট্রোমিয়ারের কাছে থাকলে এই দূরত্ব কম হয়। সেন্ট্রো-মিয়ার থেকে দূরে কায়েসমা থাকলে বাইভ্যালেন্টের সেন্ট্রোমিয়ার দুইটার মধ্যে ব্যবধান বেশী হয়। মেটাফেজের শেষে প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটার মধ্যে বিকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম অ্যানাফেজ (*anaphase I*)

প্রথম অ্যানাফেজে (চিত্র 44, 46) প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপরীত মেরুর দিকে যেতে সুরু করে। ক্রোমোসোমের এই পৃথক হওয়াকে ডিসজাংশন (*disjunction*) বলে। সেন্ট্রোমিয়ার মেরুর দিকে প্রথমে অগ্রসর হয় ও বাহু দুইটাকে টেনে নিয়ে যায়। এই সময় স্পিণ্ডিলটা ক্রমশঃ লম্বা হয়। কায়েসমার টারমিন্যা-লাইজেশন আগেই সম্পূর্ণ হ'লে ক্রোমোসোমগুলি সহজেই আলাদা হয়ে যায়। কায়েসমার প্রান্তিকরণ বা টারমিন্যালাইজেশন আগে সম্পূর্ণ না হয়ে থাকলে কায়েসমা অঞ্চলে কিছু প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়। কিন্তু হোমোলোগাস ক্রোমোসাম দুইটার মধ্যে বিকর্ষণের ফলে কায়েসমাগুলি ক্রমশঃ প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে যতক্ষণ না ক্রোমোসোম দুইটা আলাদা হচ্ছে। মায়োসিসে সেন্ট্রোমিয়ারগুলি কার্যতঃ অবিভক্ত থাকে ও সম্পূর্ণ ক্রোমোসোম মেরুতে যায়। এর ফলে প্রত্যেক মেরুতে হ্যাপ্লয়েড (*haploid*) বা '*n*' সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।

প্রথম প্রফেজে যে দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোম (একটা মাতা থেকে ও অন্যটা পিতা থেকে আসে) যুগ্ম অবস্থান করেছিল তা অ্যানাফেজে

আবার আলাদা হয়ে যায়। তবে ক্রসিং ওভার হয়ে থাকলে কোন কোন ক্রোমাটিড মাতা ও পিতার ক্রোমাটিডের সংযোগে তৈরী হয়।

প্রথম টেলোফেজ (*telophase I*)

মাইটোসিসের টেলোফেজের মত প্রথম টেলোফেজে (চিত্র 44) একই রকম পরিবর্তন দেখা যায়। ক্রোমোসোমগুলির পেঁচ খুলে যাবার ফলে এরা খুব লম্বা ও সরু হয়। নিউক্লীওলাস ও নিউক্লীও পর্দা আবির্ভূত হয়।

টেলোফেজের পর কখনও কখনও সাইটোকাইনেসিস হয়। আবার কখনও বা সাইটোপ্লাজমের বিভাগ হয় না, যেমন নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের মায়োসাইটে (*meiocyte*) এবং অনেক উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের পরাগরেণু মাতৃকোষে।

Trillium-এ অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমগুলি মেরুতে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মেটাফেজ আরম্ভ হয়। ক্রোমোসোমের *coil* বা কুণ্ডলগুলি অপরিবর্তিত থাকে ও এইগুলি দ্বিতীয় টেলোফেজ পর্যন্ত স্থায়ী হয। অনেক সময় প্রথম টেলোফেজের ক্রোমোসোমগুলি নিউক্লীয়াস গঠন না করে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রফেজ সুরু করে।

ইন্টারকাইনেসিস (*interkinesis*)

প্রথম মায়োটিক বিভাগ ও দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাগেব মাঝের সময়কে ইন্টারকাইনেসিস বলে। এই সময় কোষ বিভাগ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে ও পরের বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় DNA, RNA এবং প্রোটীন তৈবী হয়।

দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাগ

এই বিভাগ মাইটোসিসের মত হ'লেও এর সাথে মাইটোসিসের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলির সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড থাকে কিন্তু মাইটোসিসের সময কোষে ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম দেখা যায়। দ্বিতীয মায়োটিক বিভাগে ক্রোমোটিডগুলি আলাদা থাকে কিন্তু মাইটোসিসে ক্রোমোসোমেব ভগিনী ক্রোমোটিড দুইটা পবস্পব পেঁচান থাকে। তাছাড়া মায়োসিস আবম্ভ হওযার সময় ক্রোমাটিডের যে রকম জেনেটিক গঠন ছিল তা থেকে দ্বিতীয় বিভাগের কোন কোন ক্রোমাটিডের জেনেটিক গঠন ক্রসিং ওভারের জন্য আলাদা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকবার মাইটোসিস বিভাগ হ'লেও ক্রোমাটিডের জেনেটিক গঠন সাধারণতঃ একই থাকে।

দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাগকে আবার চারটা ভাগে বিভক্ত করা হয়—যেমন, দ্বিতীয় প্রফেজ, দ্বিতীয় মেটাফেজ, দ্বিতীয় অ্যানাফেজ এবং দ্বিতীয় টেলোফেজ। দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনা দেওয়া হল।

দ্বিতীয় প্রফেজ (*prophase II*)

এই অবস্থা স্বল্পস্থায়ী এবং প্রথম প্রফেজের মত জটিল নয়। দ্বিতীয় প্রফেজে (চিত্র 44, 46) প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটা সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে যুক্ত থাকে কিন্তু বাহুগুলি ছড়ান থাকে। প্রথম টেলোফেজ ও ইন্টারফেজে ক্রোমোসোমের মুখ্য কুন্ডল অবলুপ্ত হয়ে থাকলে এই সময় প্রথম বিভাগের গৌণ কুন্ডল থেকেই কুন্ডলগুলি (*coil*) তৈরী হয় এবং ক্রোমোসোমগুলি ছোট দেখায়। দ্বিতীয় প্রফেজের শেষে নিউক্লীওলাস ও নিউক্লীও পর্দা অদৃশ্য হয়।

দ্বিতীয় মেটাফেজ (*metaphase II*)

দ্বিতীয় মেটাফেজে (চিত্র 44, 46) স্পিন্ডিল তৈরী হয় এবং ক্রোমোসোমগুলি স্পিন্ডিলের নিবক্ষরেখায় অবস্থান করে। প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটার মধ্যে প্রফেজ অবস্থায় যে বিকর্ষণ দেখা গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ দূর হয় ও ক্রোমোটিড দুইটা পাশাপাশি থাকে। মেটাফেজের শেষে সেন্ট্রোমিয়ার দ্বিগুণ হয়।

দ্বিতীয় অ্যানাফেজ (*anaphase II*)

দ্বিতীয় অ্যানাফেজে (চিত্র 44, 46) প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপরীত মেরুর দিকে যেতে সুরু করে। এখন এই ক্রোমাটিডকে অপত্য ক্রোমোসোম বলা হয়। আগেই ক্রোমাটিডের বাহু দুইটা পৃথক এবং সেন্ট্রোমিয়ারটা কার্যকরীভাবে দ্বিগুণ হয়েছিল বলে এই সময় ক্রোমাটিড দুইটা সহজেই আলাদা হয়ে যেতে পারে। সেন্ট্রোমিয়ারগুলি মেরুর দিকে আগে যায় এবং বাহুগুলিকে টেনে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় টেলোফেজ (*telophase II*)

ক্রোমোসোমগুলি মেরুতে পৌঁছাবার সাথে সাথেই টেলোফেজ (চিত্র 46) সুরু হয়। এই সময় ক্রোমোসোমগুলির পেঁচ খুলে যাবার ফলে এদের খুব লম্বা ও সরু দেখায়। নিউক্লীওলাস ও নিউক্লীও পর্দা তৈরী হয় ও শেষে অপত্য নিউক্লীয়াস গঠিত হয়।

সাইটোকাইনেসিস (*cytokinesis*)

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীতে সাইটোকাইনেসিস ভিন্ন ভিন্ন সময় হয়। কোন কোন উদ্ভিদে প্রথম মায়োটিক বিভাগের পরই সাইটোপ্লাজমের বিভাগের ফলে দুইটা কোষের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিভাগের পর আবার সাইটোকাইনেসিস হয় ও চারটি কোষ তৈরী হয়।

Paeonia-তে প্রথম বিভাগের পর কোন সাইটোকাইনেসিস হয় না। দ্বিতীয় বিভাগের পর সাইটোপ্লাজমের বিভাগ হয়। দুইটা প্রাচীর একটা অন্যটার সমকোণে থাকে।

সাধারণতঃ সাইটোকাইনেসিস খাঁজ (*furrow*) গঠনের মাধ্যমে হয়।

মায়োসিসের তাৎপর্য

(1) মায়োসিসের মাধ্যমে কোন জীবের জীবন চক্রে ক্রোমোসোম সংখ্যা স্বাভাবিক থাকে। মায়োসিস হ'ল নিষেকের বিপরীত প্রক্রিয়া। নিষেকের ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ দুইটা হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট নিষিক্ত হয়ে একটা ডিপ্লয়েড জাইগোটের সৃষ্টি হয়। মায়োসিসের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড কোষ থেকে আবার হ্যাপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয় ও এইভাবে এক বংশ থেকে পরের বংশে ক্রোমোসোম সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। যৌন জননশীল জীবের জীবন চক্রের কোন একটা পর্যায়ে মায়োসিস অপরিহার্য।

(2) মায়োসিসে ক্রসিং ওভারের ফলে মাতৃ ও পিতৃ ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশ বিনিময় হয়। এর ফলে জীনের নূতন জোট (*combination*) সম্ভব।

(3) মায়োসিসের সময়ে পিতৃ ও মাতৃ ক্রোমোসোমগুলির যদৃচ্ছ পৃথকীকরণ (*random seggregation*) হয়। প্রথম মায়োটিক বিভাগে বাইভ্যালেন্টগুলি বিভিন্নভাবে সাজান থাকে। সেইজন্য মায়োসিসের ফলে সৃষ্ট কোষগুলিতে পিতৃ মাতৃ-ক্রোমোসোমের নানারকম জোট দেখা যায়। যদি কোন কোষে পাঁচ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে তাহলে বত্রিশ রকমের গ্যামেটের সৃষ্টি হতে পারে। কত রকমের গ্যামেট তৈরী হতে পারে তা 2^n ($n=$ বাইভ্যালেন্টের মোট সংখ্যা) থেকে নির্ধারণ করা যায়। অধিকাংশ জীবে পাঁচ জোড়ার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে, সেজন্য কেবল মাতৃ ক্রোমোসোম বা কেবল পিতৃ ক্রোমোসোম নিয়ে গ্যামেট গঠনের সম্ভাবনা খুবই কম।

মায়োসিসের সময়ে মাতা, পিতার ক্রোমোসোমের যদৃচ্ছ বন্টন এবং ক্রসিং ওভারের জন্য জীনের নূতন জোটের সৃষ্টি হয়। এইভাবে মায়োসিস জেনেটিক বিভিন্নতা (*variation* বা প্রকরণ) সৃষ্টির একটা প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করে। এই জেনেটিক ভ্যারিয়েশনের ফলে বিবর্তনে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীগোষ্ঠীর উপযোগীতা বাড়ে।

মাইটোসিস ও মায়োসিসের তুলনা

মাইটোসিস (*mitosis*)	**মায়োসিস** (*meiosis*)
1. মাইটোসিসের ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যার পরিবর্তন হয় না। অপত্য কোষে মাতৃকোষের সমান সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। এইজন্য এই বিভাগকে *eqational division* বা সমবিভাগ বলে।	1. মায়োসিসের ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হয়। মাতৃকোষ ডিপ্লয়েড হলে অপত্য কোষ হ্যাপ্লয়েড হয়। এইজন্য এই বিভাগকে *reduction division* বা সংখ্যা হ্রাসকারী বিভাগ বলে।
2. দেহ কোষে ও জনন কোষে দেখা যায়। তবে গ্যামেট কিম্বা রেণু গঠনের সময় সাধারণতঃ এই বিভাগ হয় না।	2. কেবল জনন কোষে দেখা যায়।
3. মাইটোসিসের ফলে কোষের একবার বিভাগ হয়।	3. মায়োসিসেব সময় কোষের দুই-বার বিভাগ হয়। প্রথম মায়োটিক বিভাগ এবং দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাগ। প্রথম মায়োটিক বিভাগে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়। দ্বিতীয় বিভাগে ক্রোমোসোম সংখ্যা একই থাকে।
4. একটা মাতৃকোষ থেকে দুইটা অপত্য কোষ তৈরী হয়।	4. একটা মাতৃকোষ থেকে চারটা অপত্য কোষ তৈরী হয়।
প্রফেজ (*prophase*)	**প্রফেজ** (*prophase*)
5. (*a*) প্রফেজ একবার হয়।	5. (*a*) প্রফেজ দুইবার হয়—প্রথম প্রফেজ এবং দ্বিতীয় প্রফেজ।

মাইটোসিস	মায়োসিস
(*b*) স্বল্পস্থায়ী।	(*b*) প্রথম প্রফেজ দীর্ঘস্থায়ী, দ্বিতীয় প্রফেজ স্বল্প-স্থায়ী।
(*c*) প্রফেজকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয় না।	(*c*) প্রথম প্রফেজকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এই উপবিভাগগুলি হ'ল—লেপ্টোটিন (*leptotene*), জাইগোটিন (*zygotene*), প্যাকিটিন (*pachytene*), ডিপ্লোটিন (*diplotene*), ডায়াকাইনেসিস (*diakinesis*)।
(*d*) নিউক্লীয়াসের আয়তন মায়োসিসের মত বড় হয় না।	(*d*) নিউক্লীয়াসের আয়তন বেশ বড় হয়।
(*e*) হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি জোড়ায় অবস্থান করে না। সাইন্যাপসিস হয় না তবে ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্লাণ্ডে হোমো-লোগাস ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থান করে।	(*e*) প্রথম প্রফেজে হোমোলো-গাস ক্রোমোসোমগুলি জোড়ায় অবস্থান করে অর্থাৎ সাইন্যাপসিস হয়।
(*f*) অ-ভগিনী ক্রোমোটিড (*non-sister chromatid*) আলাদা থাকে।	(*f*) প্রথম প্রফেজে অ-ভগিনী ক্রোমাটিড পরস্পর পেঁচান থাকে।
(*g*) কায়েসমা তৈরী হয় না।	(*g*) প্রথম প্রফেজে কায়েসমা গঠিত হয়।
(*h*) ক্রসিং ওভার (*crossing over*) হয় না।	(*h*) প্রথম প্রফেজে ক্রসিং ওভার হয়। অ-ভগিনী ক্রোমাটিড দুইটা অংশ বিনিময় করতে পারে।

মাইটোসিস	মায়োসিস
(*i*) কায়েসমা থাকে না ব'লে কায়েসমার প্রান্তিকরণও দেখা যায় না।	(*i*) কায়েসমার প্রান্তিকরণ বা *terminalization* হয়।
(*j*) নিউক্লীওলাস ও নিউক্লীও পর্দা বিলুপ্ত হয়।	(*j*) মাইটোসিসের মত।
প্রোমেটাফেজ (*prometaphase*)	**প্রোমেটাফেজ** (*prometaphase*)
6. স্পিণ্ডিল তৈরী হয়।	6. স্পিণ্ডিল গঠিত হয়।
মেটাফেজ (*metaphase*)	**মেটাফেজ** (*metaphase*)
7. (*a*) একবার মেটাফেজ হয়।	7. (*a*) মেটাফেজ দুইবার হয়—প্রথম মেটাফেজ ও দ্বিতীয় মেটাফেজ।
(*b*) সেন্ট্রোমিয়ার স্পিণ্ডিলের ঠিক নিরক্ষরেখায় থাকে।	(*b*) প্রথম মেটাফেজে প্রতি বাইভ্যালেন্টের একটা সেন্ট্রোমিয়ার স্পিণ্ডিলের নিরক্ষরেখার একটু উপরে ও অন্যটা সামান্য নীচে থাকে। দ্বিতীয় মেটাফেজে সেন্ট্রোমিয়ার নিরক্ষরেখায় থাকে।
(*c*) সেন্ট্রোমিয়ারগুলি বিভক্ত হয়।	(*c*) প্রথম মেটাফেজে সেন্ট্রোমিয়ারটা কার্যকরীভাবে বিভক্ত হয় না। দ্বিতীয় মেটাফেজ মাইটোসিসের মতই।
অ্যানাফেজ (*anaphase*)	**অ্যানাফেজ** (*anaphase*)
8. (*a*) একবার হয়।	8. (*a*) দুইবার হয় — প্রথম ও দ্বিতীয় অ্যানাফেজ।

মাইটোসিস	মায়োসিস
(*b*) প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটা বিপরীত মেরুর দিকে যায়।	(*b*) প্রথম অ্যানাফেজে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটা বিপরীত মেরুর দিকে যায়। দ্বিতীয় অ্যানাফেজে প্রত্যেক ক্রোমোসোমেব ক্রোমাটিড দুইটা বিপরীত মেরুর দিকে যায়।
(*c*) ক্রোমোসোমগুলি প্রথম মায়োসিসের তুলনায় লম্বা ও সরু হয়।	(*c*) প্রথম মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও মোটা থাকে।
(*d*) দুটো মেরুতেই সব ক্রোমোসোম যায়।	(*d*) প্রথম অ্যানাফেজে প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম দুইটা আলাদা হয়ে বিপরীত মেরুতে যাওয়ার ফলে প্রত্যেক মেরুতে মাতৃকোষের অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।
(*e*) অপত্য ক্রোমোসোমের জেনেটিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে।	(*e*) ক্রসিং ওভার (*crossing over*) হওয়ার ফলে কোন কোন অপত্য ক্রোমোসোমেব জেনেটিক গঠন নূতন ধবনের হয়।
টেলোফেজ (*telophase*)	**টেলোফেজ** (*telophase*)
9. (*a*) একবাব হয়।	9. (*a*) দুইবাব হয়—প্রথম এবং দ্বিতীয় টেলোফেজ। তবে কখনও কখনও প্রথম টেলোফেজ হয় না কিন্তু দ্বিতীয় টেলোফেজ নিয়মিতভাবে হয়।
সাইটোকাইনেসিস (*cytokinesis*)	**সাইটোকাইনেসিস** (*cytokinesis*)
10. প্রত্যেক মাইটোসিস বিভাগের পর সাইটোকাইনেসিস হয়।	10. প্রথম মায়োটিক বিভাগের পর কখনও কখনও সাইটোকাইনেসিস হয়। দ্বিতীয় মায়োসিসের পর সাইটোকাইনেসিস হয়।

অন্যান্য ধরণের কোষ বিভাগ

অ্যামাইটোসিস (*amitosis*)

কোন কোন নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ (ইষ্ট) ও প্রাণীতে (অ্যামিবা) নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি দুইটা অংশে বিভক্ত হয়। এই বিভাগের ফলে সৃষ্ট অপত্য কোষ দুইটা অসমান হয়। এইরকমের কোষ বিভাগকে অ্যামাইটোসিস (চিত্র 48) বলে। অ্যামাইটোসিসের সময় নিউক্লীয়াসের মাঝের কোন অংশ সংকুচিত ও ক্রমশঃ সরু হওয়ার ফলে নিউক্লীয়াসটা লম্বা ও ডাম্বেল আকৃতির হয়। পরে ঐ স্থানটা আরও সংকুচিত হওয়ায়
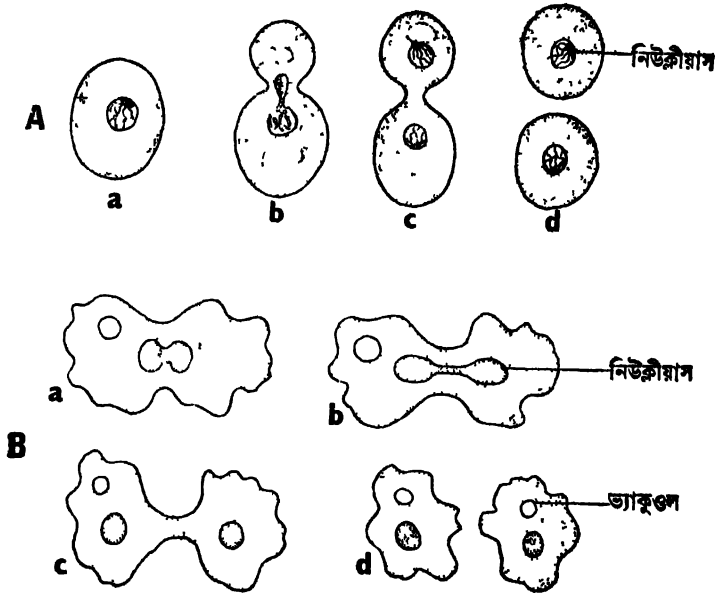
চিত্র 48
অ্যামাইটোসিস
A—ইষ্টে বাডিং (*budding*) বা মুকুলোদ্গম,
B—অ্যামিবায় ফিশন (*fission*)

নিউক্লীয়াসটা দুইটা অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। অ্যামাইটোসিসে স্পিণ্ডল গঠিত হয় না, নিউক্লীও পর্দা বর্তমান থাকে, এবং ক্রোমোসোমগুলি অপত্য

ক্রোমোসোমে বিভক্ত হয় না। নিউক্লীয়াসের এই ধরণের বিভাগকে নিউ-ক্লীয়ার বাডিং (*nuclear budding*) বলে। কখনও কখনও নিউক্লীয়াসের এইরকম বিভাগের ফলে দুইটার চেয়ে বেশী নিউক্লীয়াস তৈরী হয়; তখন ঐ বিভাগকে নিউক্লীয়ার ফ্র্যাগমেন্টেশন (*fragmentation*) বলে। নিউ-ক্লীয়াসের অসমান বিভাগের পর সাইটোপ্লাজমও ঐভাবে বিভক্ত হয়। সাইটো-প্লাজমের কোন একটা স্থান সঙ্কুচিত হয়। ক্রমশঃ ঐ জায়গায় সংকোচনের মাত্রা বাড়ার ফলে কোষ দুইটা আলাদা হয়ে যায়। অ্যামাইটোসিসের সময় নিউক্লীওলাস বিভক্ত হতে পারে কিম্বা নাও হতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্রোমোসোমের আচরণ

ক্রোমোসোমের সঞ্চলন (*movement*)

কোষ বিভাগের সময় ক্রোমোসোমের নানা পরিবর্তন হয়। যেমন—ক্রোমোসোমের সংকোচন, কুণ্ডলীকরণ (*coiling*), সাইন্যাপসিস (*synapsis*), কায়েসমার প্রান্তিকরণ (*terminaliztion*) ইত্যাদি। এখানে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল। অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের সঞ্চলন সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

ক্রোমোসোমের সংকোচন

প্রফেজ থেকে মেটাফেজ ও অ্যানাফেজের ক্রোমোসোমগুলি অনেক বেশী সংকুচিত অবস্থায় থাকে। এই সংকোচনের ফলে সীমিত স্থানের মধ্যে দীর্ঘ ক্রোমোসোমগুলির বিভাগ ভালভাবে হতে পারে। মাইটোসিসের তুলনায় মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলি বেশী সংকুচিত অবস্থায় থাকে। Manton-এর মতে মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলি মাইটোসিসের তুলনায় 33—50% ছোট থাকে। মায়োসিস বিভাগের প্যাকিটিনের তুলনায় লেপ্টোটিনের ক্রোমোসোমগুলি দীর্ঘ হয় (Manton 1939, 1950)। প্যাকিটিনের চেয়ে মেটাফেজের ক্রোমোসোমগুলি আরও ছোট হয়।

Huskin (1941) *Trillium*-এর ক্রোমোসোমের সংকোচনের পরিমাণ কোষ বিভাগের বিভিন্ন অবস্থায় লক্ষ্য করেন। ক্রোমোসোমের এবং ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। অনেক সময় ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য কমলেও একই সাথে ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য বাড়তে পারে। *Trillium*-এ ডায়াকাইনেসিসে ক্রোমোসোমগুলির দৈর্ঘ্য 125μ এবং প্রথম মেটাফেজে 100μ হয়। দ্বিতীয় অ্যানাফেজ পর্যন্ত ক্রোমোসোমগুলির দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে। দ্বিতীয় অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমগুলির দৈর্ঘ্য কমে গিয়ে 80μ হয়। ক্রোমোনিমাগুলির দৈর্ঘ্য লেপ্টোটিনে 920μ ও জাইগোটিনে 1040μ হয়। প্যাকিটিন, ডিপ্লোটিন ও ডায়াকাইনেসিসে এই দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ কমে 100μ হয়। ডায়াকাইনেসিসের শেষে ক্রোমোনিমাগুলির দৈর্ঘ্য 200μ, প্রথম মেটাফেজে 300μ এবং প্রথম অ্যানাফেজে 350μ হয়। দ্বিতীয় অ্যানাফেজ পর্যন্ত এই দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে। এর পরের বিভাগের

(মাইটোসিস) প্রফেজে ক্রোমোনিমাগুলির দৈর্ঘ্য 1000μ, মেটাফেজে 650μ এবং অ্যানাফেজে আবার 1000μ হয়। মেটাফেজ ক্রোমোসোমের তুলনায় অ্যানাফেজে ক্রোমোনিমাগুলি অনেক বেশী পেঁচান থাকে (*Sparrow* 1942)। ডায়াকাইনেসিস থেকে প্রথম মেটাফেজ পর্যন্ত ক্রোমোসোম ও ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য থেকে বোঝা যায় যে ক্রোমোসোমের সঙ্কোচন হলেও ক্রোমোনিমার প্রসারণ হতে পারে।

মাইটোসিস ও মায়োসিসের সময় ক্রোমোসোমের সঙ্কোচন কুণ্ডলীকরণ বা কয়েলিং-এর (*coiling*) উপর নির্ভর করে।

ক্রোমোসোমের কুণ্ডলীকরণ (*coiling*)

মেটাফেজে প্রত্যেক ক্রোমোসোম স্প্রিঙের মত সর্পিলভাবে পেঁচান থাকে। এই পেঁচানকে কয়েলিং বা কুণ্ডলীকরণ বলে। একটা সম্পূর্ণ পেঁচকে সোমাটিক বা মুখ্য কুণ্ডল (*somatic, major* বা *standard coil*) বলে। প্রত্যেক প্রফেজে সোমাটিক কুণ্ডল নূতন করে তৈরী হয়। কোন নির্দিষ্ট প্রজাতিতে কুণ্ডলের সংখ্যা ও ব্যাস মোটামুটি একই থাকে। ইন্টারফেজ অবস্থার পর যখন আবার প্রফেজ অবস্থা আরম্ভ হয় তখন আগের বিভাগের সোমাটিক কয়েলের বেশীর ভাগই নষ্ট হয়ে গিয়ে কেবল কিছু আলগা পেঁচ অবশিষ্ট থাকে। এই পেঁচকে স্মারক কুণ্ডল (*relic coil*) বলে। কোষ বিভাগের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রমশঃ স্মারক কুণ্ডলগুলি লুপ্ত হয়ে যায়। মাইটোসিস বিভাগের প্রফেজ অবস্থায় প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটা (ভগ্নী ক্রোমাটিড) পরস্পর বৈদ্যুতিক তারের মত পেঁচান থাকে। এই ধরণের পেঁচকে রিলেশন্যাল কয়েল (*relational coil*) বলে। প্রফেজের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রোমোসোমগুলি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয় ও মেটাফেজে ভগ্নী ক্রোমাটিড (*sister chromatid*) দুইটার পেঁচ খুলে গিয়ে এরা আলাদা হয়ে যায় ও পাশাপাশি অবস্থান করে। কেবল সেন্ট্রোমিয়ার অংশে ভগ্নী ক্রোমাটিড দুইটা যুক্ত থাকে। রিলেশন্যাল কয়েলের উৎপত্তি আগের বিভাগের অ্যানাফেজের সোমাটিক কয়েল থেকে হয়। এই কয়েলের সৃষ্টি সম্বন্ধে দুইটা মতবাদ আছে।

(1) Darlington-এর (1937) মতে অ্যানাফেজে কুণ্ডলিত (*coiled*) ক্রোমোসোমগুলি অবিভক্ত থাকে। প্রফেজে এরা লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয় ও ক্রমশঃ সোজা হয়। এর ফলে রিলেশন্যাল কয়েলের সৃষ্টি হয়।

(2) দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে অ্যানাফেজের আগেই ক্রোমোসোমগুলি বিভক্ত হয় এবং এগুলি আগেই প্রফেজে ক্রোমাটিড অবস্থায় কুণ্ডলিত

হয়েছিল। পরবর্তী বিভাগের প্রফেজে অ্যানাফেজের মুখ্য কুণ্ডলগুলি (*major coil*) আলগা হয়ে স্মারক কুণ্ডলে (*relic coil*) রূপান্তরিত হওয়ার ফলে নবগঠিত ক্রোমাটিড (আগের বিভাগের অর্ধ-ক্রোমাটিড) দুইটা রিলেশন্যাল কয়েল গঠন করে।

মাইটোসিস বিভাগের প্রফেজে ক্রোমাটিড দুইটা এমনভাবে পেঁচান থাকে যার ফলে প্রান্ত দুইটা ঘুরে না গেলে এরা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে না। এইরকমের রিলেশন্যাল কয়েলকে **প্লেকটোনেমিক কয়েল** (*plectonemic coil*) (চিত্র 49) বলা হয়।

চিত্র 49
প্লেকটোনেমিক ও প্যারানেমিক কয়েল

মায়োসিসে ক্রোমাটিড দুইটা এমন করে পেঁচান থাকে যে এদের প্রান্ত দুইটা ঘুরে না গেলেও অ্যানাফেজে এরা সহজেই আলাদা হয়ে যায়। এই-রকমের পেঁচকে **প্যারানেমিক কয়েল** (*paranemic coil*) (চিত্র 49) বলে।

কোষ বিভাগের অগ্রগতির সাথে সাথে কুণ্ডল বা কয়েলের সংখ্যা কমতে থাকে ও এদের ব্যাস বাড়ে। মেটাফেজ ও অ্যানাফেজে কুণ্ডলের সংখ্যা কমে ও এই প্রক্রিয়াকে *despiralization* বা বিকুণ্ডলীকরণ বলে। যতক্ষণ না স্মারক কুণ্ডলগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ বিকুণ্ডলীকরণ সম্পূর্ণ হয় না। লেপ্টোটিন বা তার আগেই যখন ক্রোমোসোমগুলি কুণ্ডলিত হতে আরম্ভ করে তখন ঐ প্রক্রিয়াকে *spiralization* বা কুণ্ডলী-করণ বলা হয়।

মাইটোসিসের তুলনায় মায়োসিসে যে পেঁচ বা কুণ্ডল দেখা যায় তা অপেক্ষাকৃত জটিল। মাইটোসিসের মেটাফেজের তুলনায় মায়োসিসের বাইভ্যালেন্টে অল্প সংখ্যক কিন্তু বড় বড় মুখ্য কুণ্ডল (*major coil*)

দেখা যায়। এছাড়া ক্রোমোসোমের সব জায়গায় একরকম ছোট ছোট কুণ্ডল দেখা যায়। এদের গৌণ কুণ্ডল (*minor coil*) বলে। মাইনর কয়েল মেজর কয়েলের সমকোণে থাকে। Fuji (1926) *Tradescantia*-এ প্রথম মাইনর কয়েল দেখতে পান।

মায়োসিসে বিভিন্ন কুণ্ডলের ভাগ্য নানা ধরণের জীবে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। *Tradescantia*-এ প্রথম মায়োটিক বিভাগের পর ইন্টারফেজে মেজর কয়েল নষ্ট হয়ে গিয়ে মাইনর কয়েলগুলি ক্রমশঃ বড় হয় ও দ্বিতীয় মেটাফেজে বড় কুণ্ডল (বা কয়েল) গঠন করে। দ্বিতীয় মেটাফেজের কয়েল বা কুণ্ডলগুলির অবশিষ্টাংশ পরের মাইটোসিস বিভাগের প্রফেজে স্মারক ও রিলেশন্যাল কয়েল হিসাবে দেখা দেয়। *Trillium*-এ প্রথম ও দ্বিতীয় মায়োসিস বিভাগের মাঝে ইন্টারফেজ অবস্থা অনুপস্থিত থাকে। প্রথম মায়োটিক বিভাগের মেজর কয়েলগুলি দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাগেও অপরিবর্তিত থাকে। পরের মাইটোসিস বিভাগের প্রফেজে এই কয়েলগুলি স্মারক কুণ্ডল (*relic coil*) হিসাবে দেখা যায়।

ক্রোমোসোমে কয়েল বা কুণ্ডলের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। এই মতগুলিকে প্রধানতঃ দুইটা ভাগে ভাগ করা যায়— (*a*) টরশন (*torsion*) বা ব্যবর্তনের মত, (*b*) ম্যাট্রিক্সীয় (*matrical*) মত। Darlington, Kuwada, Nabel প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা প্রথমোক্ত মতের সমর্থক। Darlington-এর (1935) আণবিক মতবাদ (*molecular theory*) অনুসারে ক্রোমোসোমের নিউক্লীক অ্যাসিড ও প্রোটীন কয়েলিং বা কুণ্ডলীকরণ নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লীক অ্যাসিড ও প্রোটীনের গঠন থেকে বোঝা যায় যে এইসব অণুর কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকবার প্রবণতা আছে। আণবিক কুণ্ডলের জন্য যে ব্যবর্তন (*torsion*) শক্তির সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে কয়েল দেখা দেয়। আণবিক কুণ্ডলের জন্য সূত্রগুলি বিপরীত দিকে ঘুরে গিয়ে টেনশন (*tension*) বা চাপ কমাতে চায় এবং এর ফলে ক্রোমোসোমে কুণ্ডল দেখা দেয়। Sax, Wilson, Huskin প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় মতের সমর্থক। তাঁদের মতে ম্যাট্রিক্সের মধ্যে ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের ফলে কয়েলের সৃষ্টি হয়। Sax ও Hamphry-র (1934) মতে ম্যাট্রিক্সের সঙ্কোচনের ফলে ক্রোমোনিমার উপর চাপ পড়ে এবং এর ফলে *Tradescantia*-র মেজর কয়েলের উৎপত্তি হয়। Wilson ও Huskin (1939) দেখেন যে *Trillium erectum*-এ মেজর কয়েল বা মুখ্য কুণ্ডল তৈরী হওয়ার সময় ক্রোমোসোমগুলি সামান্য সঙ্কুচিত হয় কিন্তু ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণে বাড়ে, সুতরাং সীমিত ম্যাট্রিক্সের মধ্যে ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য বাড়ার ফলেই মেজর কয়েল গঠিত হয় (Huskin 1941)। Coleman ও

Hillary (1941) এই মতেরই সমর্থক। তাঁদের মতে ডিপ্লোটিনে গৌণ কুণ্ডল বা মাইনর কয়েল খুলে যাওয়ার ফলে ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য বাড়ে। কোন দুইটা সূত্র পরস্পর পেঁচিয়ে রিলেশন্যাল কয়েল গঠন করবে কিনা তা নির্ভর করে কয়েল গঠনের সময় তাদের মধ্যে দূরত্বের উপর। যদি সূত্র দুইটার আলাদা ম্যাট্রিক্স থাকে ও তাদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকে তবে সূত্রগুলি পরস্পর পেঁচিয়ে যায় না এবং তাদের নিজস্ব পেঁচ যে কোন দিকে থাকতে পারে, যেমন— সোমাটিক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডদ্বয়। যদি সূত্র দুইটা একই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে আলাদাভাবে থাকে তবে সূত্র দুইটা পরস্পর পেঁচিয়ে যায় না এবং এদের নিজস্ব পেঁচ একই দিকে থাকে, যেমন— প্রথম মায়োটিক বিভাগের ভগ্নী ক্রোমাটিডগুলি। যদি সূত্র দুইটা খুব কাছে থাকে এবং কয়েলিং-এর আগে আলাদা ও সমান্তরালভাবে থাকে তবে তারা পরস্পর পেঁচিয়ে রিলেশন্যাল কয়েল গঠন করে, যেমন— মাইটোসিস ও মায়োসিস অর্ধ-ক্রোমাটিডগুলি। সুতরাং ম্যাট্রিক্সীয় মতের সমর্থকরা মনে করেন যে ম্যাট্রিক্স ও ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্যের তারতম্যের জন্য কুণ্ডল তৈরী হয় এবং দুইটা সূত্রের ব্যবধানের উপর রিলেশন্যাল কয়েলের উৎপত্তি নির্ভর করে।

কুণ্ডলীকরণের (*coiling*) মাত্রা তাপমাত্রা, জেনেটিক গঠন ও পুষ্টির উপর নির্ভর করে। Brown টমেটোতে দেখেন যে একই কোষের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে কুণ্ডলীকরণের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। Ris-এর (1945) মতে ক্রোমোসোমের বিভিন্ন স্থানের কুণ্ডলীকরণের মাত্রার তারতম্যের জন্য প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী কনষ্ট্রিকশন (*primary, secondary constriction*), হেটারোক্রোমাটিন (*heterochromatin*) প্রভৃতি অঞ্চল দেখা যায়। Gall (1956) এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু D' Angelo (1950) ও Duryee-র (1941) পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে সব ক্ষেত্রে Ris-এর ধারণা প্রযোজ্য নয় কারণ কোন কোন জীবের ক্রোমোসোমকে *microneedle* (সূক্ষ্ম সূচ) দিয়ে টানলেও ক্রোমোনিমার অংশ অবিকৃত থাকে।

যুগ্মতা বা সাইন্যাপসিস (*synapsis*)

মায়োসিসে হোমোলোগাস (*homologous*) ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতা দেখা যায়। সাইন্যাপসিস বা যুগ্মতা জাইগোটিনে আরম্ভ হয়। প্যাকিটিনে সবচেয়ে বেশী সাইন্যাপসিস দেখা যায় এবং ডিপ্লোটিনে সাইন্যাপসিস শেষ হয়ে যায়। তবে কখনও কখনও ডায়াকাইনেসিসেও সাইন্যাপসিস দেখা যায়। সচরাচর দেখা না গেলেও দেহ কোষেও ক্রোমো-

সোমের যুগ্মতা হতে পারে, যেমন ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডে। যেসব কোষে তিন বা তারচেয়ে বেশী হোমোলোগাস ক্রোমোসোম উপস্থিত (পোলপ্লয়েড) থাকে সেখানে কোন একটা স্থানে কেবল দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোম যুগ্ম অবস্থান করতে পারে। তবে ট্রিপ্লয়েড ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের (*salivary gland*) ক্রোমোসোমে এর ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এখানে তিনটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে সাইন্যাপসিস হয়। আগেই বলা হয়েছে যে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির হোমোলোগাস বা অনুরূপ অংশের মধ্যে কেবল সাইন্যাপসিস হয়। ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমে প্রতি ব্যাণ্ড অনুরূপ ব্যাণ্ডের সাথে যুগ্ম অবস্থান করে। ভুট্টার পরাগরেণু মাতৃকোষেও হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির প্রত্যেক ক্রোমোমিয়ার অনুরূপ ক্রোমোমিয়ারের সাথে যুগ্মভাবে থাকে। অনুরূপ নয় এমন দুইটা অংশের মধ্যে যুগ্মতা বিরল। ট্রাইসোমিক (*trisomic*) ভুট্টার তিনটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে দুইটা সাধারণতঃ যুগ্ম অবস্থান করে এবং তৃতীয় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমটা আলাদা থাকে। এই ক্রোমোসোমটা ভাঁজ হবার ফলে একই ক্রোমোসোমের দুইটা অংশের মধ্যে যুগ্মতা হয়। এই রকমের যুগ্মতা ভুট্টার 'B' ক্রোমোসোমেও দেখা যায়। এই ধরনের অস্বাভাবিক ও অনির্দিষ্ট যুগ্মতার উপর হেটারোক্রোমাটিনের প্রভাব আছে।

সাইন্যাপসিসের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। Manton-এর (1939) মতে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য বাড়ার ফলে যুগ্মতা দেখা দেয়। মাইটোসিস বিভাগের প্রফেজের তুলনায় মায়োসিস বিভাগের জাইগোটিনে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য বেশী হয়। স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডে ক্রোমোসোমগুলির দৈর্ঘ্য বাড়ার পর যুগ্মতা হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি যুগ্মতা ব্যাখ্যা করতে পারে না। ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য ছাড়া অন্যান্য কারণও, যেমন, যুগ্মতার সময়, হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটার মধ্যে প্রাথমিক দূরত্ব, ইত্যাদি সাইন্যাপসিসকে প্রভাবিত করে।

Darlington, Frankel, La Cour (1940) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা সাইন্যাপসিস বা যুগ্মতায় সময়ের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করেন। কিন্তু Swanson-এর মতে সাইন্যাপসিসে সময়ের প্রভাব প্রশ্নাতীত নয়।

জাইগোটিনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির কোন অংশ আকস্মিকভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করলে ঐ স্থান থেকে দুই দিকেই যুগ্মতা আরম্ভ হয়। "জিপ" (*zip*) যেমন একপ্রান্ত থেকে টেনে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বন্ধ করা হয় তেমনি যুগ্মতা এক জায়গায় সুরু হলে প্রান্ত পর্যন্ত তা চলতে থাকে।

Darlington-এর (1937) মতে অ্যানাফেজ থেকে পরবর্তী প্রফেজ

ছাড়া আর সব অবস্থাতেই ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থায় থাকে। মাইটোসিসে প্রফেজের ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ অবস্থায় থাকে বলে এখানে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা হয় না। মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলি একক অবস্থায় থাকে। সুতরাং ক্রোমোসোমগুলিতে অপরিপূর্ণতা বা অসংপৃক্ততা (*unsaturation*) দেখা যায়। এইজন্য হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা হয়। প্যাকিটিনের শেষ দিকে ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হয়। তখন ক্রোমোসোমগুলি আর অপরিপূর্ণ থাকে না। এর ফলে ডিপ্লোটিনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি আলাদা হয়ে যায়। এটাই হ'ল Darlington-এর *Precocity theory*। তবে এই মতবাদকে কোন কোন বিজ্ঞানী সমর্থন করেন নাই কারণ তাঁদের মতে লেপ্টোটিনে সাইন্যাপসিসের (*synapsis*) আগেই ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ অবস্থায় থাকে।

Sax ও Sax (1935) ও Beasley-র (1938) মতে সব সময়েই হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। মাইটোসিসে প্রফেজের প্রথম থেকেই ক্রোমোসোমগুলি কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে বলে এই আকর্ষণ দেখা যায় না। মায়োটিক বিভাগের লেপ্টোটিনে ক্রোমোসোমগুলি কুণ্ডলিত থাকে না বলে আকর্ষণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী হয় এবং যুগ্মতা দেখা যায়। Beasley-র (1938) মতে মায়োসিসের সময় নিউক্লীয়াসের স্ফীতি, নিউক্লীও রসের ঘনত্বের হ্রাস এবং প্রফেজের দীর্ঘ স্থায়িত্ব যুগ্মতাকে প্রভাবিত করে।

Wilson ও Morrison-এর (1966) মতে সাইন্যাপসিস আংশিকভাবে ক্রোমোসোমের বিন্যাসের উপর এবং অংশতঃ এর দ্বিগুণতার (*duplication*) মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

কায়েসমার প্রান্তিকরণ (*terminalization*)

মায়োসিসের ডিপ্লোটিনে কায়েসমা প্রথম দেখা যায়। কোষ বিভাগের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রোমোসোমে কায়েসমার অবস্থানের পরিবর্তন হয়। কায়েসমার এই সঞ্চলনকে (*movement*) Darlington কায়েসমার *terminalization* (প্রান্তিকরণ) বলেছেন।

প্রান্তিকরণ বা টারমিন্যালাইজেশনের পরিমাণ বেশী হলে সব কায়েসমাগুলিই ক্রোমোসোমের প্রান্তে যায় ও এদের সংখ্যা হ্রাস পায় (Moffett 1938)।

প্রান্তিকরণ সবসময় সেন্ট্রোমিয়ার থেকে ক্রোমোসোমের প্রান্তের দিকে হয়ে থাকে। বড় বাইভ্যালেন্টের তুলনায় ছোট বাইভ্যালেন্টের প্রান্তিকরণের

পরিমাণ (প্রতি একক ক্রোমোসোম দৈর্ঘ্যে) বেশী হয়। প্রান্তিকরণের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে।

Darlington ও Dark-এর (1932) স্থির বৈদ্যুতিক (*electrostatic*) মতবাদ অনুসারে কায়েসমার প্রান্তিকরণ দুইটা শক্তি দিয়ে প্রভাবিত হয়। (*a*) সেন্ট্রোমিয়ারে একটা শক্তিশালী বিকর্ষণ শক্তি দেখা যায়। (*b*) ক্রোমোসোমের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে সমভাবে বিস্তৃত আরেকটা বিকর্ষণ শক্তি থাকে। সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলের বিকর্ষণ শক্তি বেশী হওয়ার জন্য কায়েসমাগুলি প্রান্তের দিকে অগ্রসর হতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রান্তিকরণ সম্পূর্ণ হচ্ছে কিম্বা ফাঁস গুলির (*loop*) মধ্যে একটা ভারসাম্য আসছে। এই দুইটা শক্তি, কায়েসমার সংখ্যা ও ক্রোমোসোমের সঙ্কোচনের মাত্রার উপর প্রফেজ ও মেটাফেজে বাইভ্যালেন্টের আকৃতি নির্ভর করে। বিভিন্ন গবেষণা ক্রোমোসোমে বিকর্ষণ শক্তির উপস্থিতির সমর্থন করে। মেটাফেজে সেন্ট্রোমিয়ার ও এর কাছের প্রথম কায়েসমার মধ্যে বাইভ্যালেন্টের প্রসারতা সেন্ট্রোমিয়ারগুলির মধ্যে জোরালো বিকর্ষণ শক্তির উপস্থিতির ইঙ্গিত করে। Darlington-এর মতে এই বিকর্ষণের কারণ হ'ল প্রত্যেক সেন্ট্রোমিয়ারে একই রকম বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকে। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানী এই মতকে সমর্থন করেন নাই। অধিকাংশ জীবে মেটাফেজ ও অ্যানাফেজের প্রথম দিকে যখন বাইভ্যালেন্টগুলি স্পিণ্ডিলের সংস্পর্শে থাকে তখনই কেবল সেন্ট্রোমিয়ার ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রসারতা দেখা যায়। সেন্ট্রোমিয়ার ও মেরু অঞ্চলের মধ্যে সংযোগের জন্য বাইভ্যালেন্টে এই প্রসারতা দেখা দিতে পারে। পুরুষ *mantid*-এর মায়োসিস বিকর্ষণ শক্তির উপস্থিতিকে সমর্থন করে না। Hughes-Schrader (1943) দেখেন যে ম্যান্টিডে (*mantid*) হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে কায়েসমা গঠিত না হলেও তারা সমান্তরালভাবে পাশাপাশি যুগ্ম অবস্থান করে এবং ক্রোমোসোমের বাহুগুলির মধ্যে কোন বিকর্ষণ দেখা যায় না। এইসব প্রতিবাদ সত্ত্বেও অনেক বিজ্ঞানী স্থির বৈদ্যুতিক মতবাদ (*electrostatic theory*) সমর্থন করেছেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে বলা যায় যে মায়োসিসে ক্রোমোসোমের আচরণকে কেবল সাধারণ স্থির বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

দ্বিতীয় মতবাদ হ'ল *coiling* বা কুণ্ডলীকরণের মতবাদ। আমরা আগেই দেখেছি যে প্রফেজের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রোমোসোমে কুণ্ডলের সংখ্যা কমে কিন্তু ব্যাস বাড়ে এবং এর ফলে ক্রোমোসোমগুলি ক্রমশঃ ছোট ও দৃঢ় হয়। এই অবস্থায় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি পরস্পর কায়েসমা দিয়ে যুক্ত থাকে। ক্রোমোসোমের দৃঢ়তা বাড়ার সাথে সাথে যে

শক্তির সৃষ্টি হয় তা সবচেয়ে বেশী জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে চায়। এর ফলে দুইটা পাশাপাশি কায়েসমার মাঝের অঞ্চল দুই দিকে বেঁকে যায়। যখন কুণ্ডলীকরণের ফলে সৃষ্ট শক্তি কায়েসমা অঞ্চলে যে শক্তি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলিকে একসাথে রেখেছিল তার চেয়ে বেশী হয় তখন কায়েসমাগুলি ক্রোমোসোমের প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয়। যেহেতু কুণ্ডলীকরণ একবার সুরু হলে চলতেই থাকে সেজন্য প্রান্তিকরণ বা টারমিন্যালাইজেশন একবার সুরু হলে তা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে। এই মতবাদের সত্যতা যাচাই করবার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। *Tradescantia paludosa*-এ দেখা গিয়েছে যে ক্রোমোসোমগুলি যত ছোট হতে থাকে তত বেশী সংখ্যক কায়েসমার টারমিন্যালাইজেশন হয়। Lesley ও Forst (1927) দেখেন যে *Matthiola incana*-এ মায়োসিসে ক্রোমোসোমগুলি স্বাভাবিকভাবে সঙ্কুচিত হয় না এবং এখানে কায়েসমাগুলিও মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। Upcott-ও (1937) *Lathyrus odoratus*-এর উপর গবেষণা করে ক্রোমোসোমের *coiling*-এর সাথে প্রান্তিকরণের সম্পর্ক সমর্থন করেছেন। তবে অনেক জীবে ক্রোমোসোমের সুনির্দিষ্ট সঙ্কোচন সত্ত্বেও কায়েসমার সামান্য প্রান্তিকরণ হয় কিম্বা একেবারেই হয় না। সম্ভবতঃ কায়েসমার প্রান্তিকরণ বা টারমিন্যালাইজেশন আরম্ভ করার জন্য ক্রোমোসোমে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার দৃঢ়তার প্রয়োজন।

Ostergen (1943) বলেন যে নির্দিষ্ট আকৃতিযুক্ত কোন বস্তু তার আকৃতির পরিবর্তনকে বাঁধা দেয়। কায়েসমা ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন ঘটায় সেজন্য কায়েসমা অঞ্চলে একটা বাঁধা বা বিকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হয়। এই শক্তি কায়েসমাকে প্রান্তের দিকে ঠেলে দেয়।

ক্রোমোসোমের আচরণের পার্থক্য

এণ্ডোমাইটোসিস (*endomitosis*)

অনেক জীবে যেসব কোষ আর বিভক্ত হতে পারে না সেই রকম পরিণত কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা কখনও কখনও স্বাভাবিক কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার 2, 4, 8, 16 গুণ হয়ে থাকে। এই অবস্থাকে এণ্ডোপলিপ্লয়েডি (*endopolyploidy*) বলা হয় (চিত্র 50)। Nemek 1905 খৃষ্টাব্দে কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মূলের কোষে দেখেছিলেন যে বিভাজনশীল কোষগুলি ডিপ্লয়েড কিন্তু কিছু পরিণত কোষ পলিপ্লয়েড। Jacobj-এর (1925) মতে এর কারণ হ'ল নিউক্লীয়াসের বিভাগ ছাড়াই নিউক্লীও বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিভাগ। Hertwig (1935) ড্রসোফিলার গর্ভাশয়ের ধাত্রী
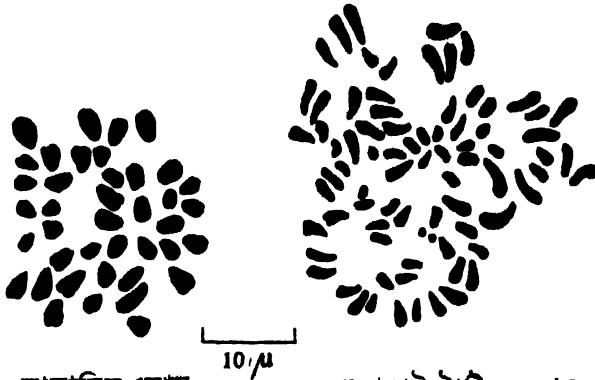
চিত্র 50

ইঁদুরের স্বাভাবিক ও এণ্ডোমাইটোটিক কোষের মেটাফেজ অবস্থা

কোষের (*nurse cell*) বৃদ্ধির সময় ক্রোমোসোমের এইরকমের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন। Geitler (1937, 1939, 1941) পুরুষ *Gerris lateralis*-এর স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের (*salivary gland*) কোষে 512 ও 1024 গুণ ক্রোমোসোমযুক্ত অতিকায় নিউক্লীয়াস দেখতে পেয়েছিলেন। Geitler এইসব পলিপ্লয়েড কোষের উৎপত্তির বর্ণনা দিয়েছিলেন। এখানে কোষ বিভাগ সুরু হয় কিন্তু সমাপ্ত হয় না। ক্রোমোসোমগুলি প্রফেজে কুণ্ডলিত (*coiled*) হওয়ার ফলে সংকুচিত হয়। প্রফেজের শেষ দিকে কোষ বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায়, নিউক্লীয়ার মেমব্রেন ভেঙ্গে যায় না, কোন স্পিণ্ডিল গঠিত হয় না এবং মেটাফেজে, অ্যানাফেজ হয় না। এই আংশিক মাইটোসিসের ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। Geitler এই প্রক্রিয়াকে এণ্ডো-মাইটোসিস নাম দিয়েছেন। কোন কোন কোষে খুব বেশী সংখ্যক ক্রোমোসোমের উপস্থিতি ঐসব কোষে বারবার এণ্ডোমাইটোসিসের জন্য হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ এণ্ডোমাইটোসিসে ক্রোমোসোমের ঘনীভূত ও অঘনীভূত অবস্থা লক্ষ্য করেছেন তবে কোন অবস্থাতেই ক্রোমোসোমের ঘনীভূত অবস্থা (*condensation*) স্বাভাবিক মেটাফেজের মাত্রায় পৌঁছায় না। এণ্ডো-পলিপ্লয়েড কোষ এণ্ডোমাইটোসিসের ফলেই সৃষ্টি হয়।

সাধারণতঃ এণ্ডোপলিপ্লয়েড কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা সহজেই গোনা যায়। কিন্তু কোন কোন পতঙ্গে এণ্ডোপলিপ্লয়েডির মাত্রা খুব বেশী

হওয়ার ঐসব কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা প্রত্যক্ষভাবে নির্ণয় করা কষ্ট-সাধ্য। সেজন্য ক্রোমোসোমের সংখ্যা গুনে কখনও কখনও পলিপ্লয়েডির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া কোন কোষে DNA-র পরিমাণ থেকেও পলিপ্লয়েডির মাত্রা বোঝা যায়।

এণ্ডোপলিপ্লয়েড টিস্যুর (*tissue*) বিভিন্ন কোষে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পলিপ্লয়েডি দেখা যায়। কোন কোন কোষ ডিপ্লয়েড (2n), কোনটা টেট্রাপ্লয়েড (4n), আবার কোনটা বা অক্টোপ্লয়েড (8n) স্তরে থাকে। খুব কম ক্ষেত্রেই সব কোষে একই মাত্রার পলিপ্লয়েডি দেখা যায়। Huskin ও তাঁর সহকর্মীরা (1948) *Rhoeo discolor*-এ এইরকমের মিক্সোপ্লয়েডির (*mixoploidy*) বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া তাঁরা দেখেন যে একই কোষের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পলিটেনি (*polyteny*) হয়েছে। Huskin-এর মতে কোষগুলি খুব ধীরে ধীরে ডিপ্লয়েড থেকে টেট্রাপ্লয়েড এবং টেট্রাপ্লয়েড থেকে অক্টোপ্লয়েড হয়। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার আগে যদি টিস্যুটাকে পরীক্ষা করা হয় তবে বিভিন্ন মাত্রার পলিপ্লয়েডি দেখা যায়। Mickey (1946, 1947) ফড়িঙে (*grasshopper*) মিক্সোপ্লয়েডি দেখেছিলেন।

White-এর (1934) মতে ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমো-সোমের পলিটেনি প্রকৃতি হ'ল এণ্ডোপলিপ্লয়েডির একটা বিশেষ অবস্থা। ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হওয়ার পরেও ক্রোমাটিডগুলি আলাদা না হ'লে পলিটেনি (*polyteny*) বা বহুসূত্রযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। পলিটেনি অবস্থায় ক্রোমাটিডগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে ব'লে ক্রোমোসোমের সংখ্যা বাড়ে না। ড্রসোফিলার ধাত্রী কোষে (*nurse cell*) এণ্ডোমাইটোসিস ও পলিটেনির মাঝামাঝি অবস্থা দেখা যায়। White (1946) বলেন যে একই কোষে পলিটেনি ও পলিপ্লয়েডি দেখা যেতে পারে। Bauer-এর (1938) মতে পলিটেনি নিউক্লীয়াসের ক্রোমোসোমগুলির লম্বালম্বি বিভাগের ফলে পলিপ্লয়েড অবস্থার সৃষ্টি হয়। *Culex pipens* (মশা) নিয়ে গবেষণা করে Berger (1938) ও Grell (1946) এই মতের সমর্থন করেছেন।

অনেক উদ্ভিদে এণ্ডোমাইটোসিস দেখা গিয়েছে। Berger (1941) *Spinacia*-র পরিণত কোষে নিয়মিতভাবে এণ্ডোমাইটোসিস দেখেছিলেন। *Allium*-এ টেট্রাপ্লয়েড মাত্রা পর্যন্ত এণ্ডোপলিপ্লয়েডি দেখা যায়।

গ্রন্থির কোষ সাধারণতঃ পলিপ্লয়েড (যেমন *Gerris*-এ) কিম্বা পলিটেনি (যেমন *Drosophila*-এ) অবস্থায় থাকে। Huskin (1947) দেখেন যে, কর্ম-ব্যস্ত অবিভাজনশীল কোষে পলিসোমাটি (*polysomaty*) বা পলিটেনি হয়।

কোষ বিভাগ ছাড়া কোন কোষ যতবেশী সময় কর্মব্যস্ত থাকবে ততই পলি-টেনি বা এণ্ডোপলিপ্লয়েডির মাত্রা বাড়বে।

অধিকাংশ এণ্ডোপলিপ্লয়েড নিউক্লীয়াসে আর মাইটোসিস বিভাগ হয় না। তবে মশায় এণ্ডোপলিপ্লয়েড নিউক্লীয়াসে মাইটোসিস বিভাগ হতে দেখা গিয়েছে।

দেহকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা হ্রাস বা সোমাটিক রিডাকশন (*somatic reduction*)

ক্রোমোসোমের বিভাগের চেয়ে তাড়াতাড়ি যদি কোষ বিভাগ হয় তা হলে দেহকোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা কমে যায়। এইরকমের বিভাগকে সোমাটিক রিডাকশন (*somatic reduction*) বলে। উদ্ভিদে অনিয়মিত-ভাবে এইরকম বিভাগ হয়। Hughes-Schrader (1925, 1927) *Icerya purchasi* নামের প্রাণীতে প্রথম নিয়মিত সোমাটিক রিডাকশনের বর্ণনা দেন। এই প্রাণী পুরুষ, স্ত্রী এবং উভলিঙ্গ (*bisexual*) হয়। উভলিঙ্গ *Icerya*-তে এইরকমের বিভাগ দেখা গিয়েছে। Berger (1938, 1941) ও Grell (1946) *Culex pipens*-এ ($2n = 6$) সোমাটিক রিডাকশন দেখেছিলেন। এখানে এই বিভাগের সময় প্রফেজে তিন জোড়া ক্রোমোসোম দেখা যায়। প্রত্যেকটা ক্রোমোসোমে দুই থেকে বত্রিশটা সূত্র থাকে। প্রফেজের শেষ দিকে এই সূত্রগুলি আলাদা হয়ে যায়। এর পর হোমোলোগাস সূত্রগুলি যুগ্ম অবস্থান করে অর্থাৎ দেহকোষে সাইন্যাপসিস হয়। বড় কোষে মেটাফেজে 24 বা 48টা এইরকম জোড়া দেখা যায়। অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমগুলি আর কোন লম্বালম্বি বিভাগ ছাড়াই পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায়। এর ফলে অপত্য কোষে কম সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। আবার এই পদ্ধতিতে পরবর্তী বিভাগগুলি হওয়ায় ক্রোমোসোম সংখ্যা আরও হ্রাস পায়। এইভাবে যেসব কোষে 48টা (16n) বা 96টা (32n) ক্রোমোসোম ছিল সেখানে সোমাটিক রিডাকশনের ফলে 12টা (4n) বা 24টা (8n) ক্রোমোসোমযুক্ত কোষের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এণ্ডোপলিপ্লয়েডির বিপরীত প্রক্রিয়া হ'ল সোমাটিক রিডাকশন।

Huskin (1948), Huskin ও Steinitz (1948) *Allium*-এর মূলে ইণ্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA) প্রয়োগ করে এণ্ডোপলিপ্লয়েড কোষ পেয়েছিলেন। তাঁরা 1—2% রাইবোজ নিউক্লীক অ্যাসিড (RNA) বা এর সোডিয়াম ঘটিত লবণ 6—12 ঘণ্টা প্রয়োগ করেও সোমাটিক রিডাকশন পেয়েছিলেন।

ননডিসজাংশন (*nondisjunction*) **অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অক্ষমতা**

অনেক সময় মায়োসিসের অ্যানাফেজ অবস্থায় দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোম স্বাভাবিক ভাবে আলাদা হয়ে দুইটা মেরুতে না গিয়ে একসাথে যে কোন একটা মেরুতে যায়। এই ধরনের অস্বাভাবিকতাকে নন-ডিসজাংশন (*nondisjunction*) বলে। মাঝে মাঝে দেহকোষেও ননডিসজাংশন (*somatic non-disjunction*) দেখা যায়।

জাইগোটিনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটার মধ্যে যুগ্মতা না হ'লে বা কায়েসমা সম্পূর্ণভাবে খুলে গেলে বাইভ্যালেন্ট গঠিত না হয়ে দুইটা ইউনিভ্যালেন্ট তৈরী হয়। ইউনিভ্যালেন্টগুলি স্বাধীনভাবে যে কোন মেরুতে যেতে পারে। যদি দুইটা ইউনিভ্যালেন্টই একই মেরুতে যায় ও অন্য মেরুতে ঐ ক্রোমোসোমের কোন সদস্যই না থাকে তবে n+1 গ্যামেট ও n−1 গ্যামেট তৈরী হয়, বেশীর ভাগ উদ্ভিদ ও প্রাণীতে এই কারণেই নন-ডিসজাংশন হয়।

হেটারোজাইগাস অবস্থায় রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশন (*reciprocal translocation*) থাকলে অনেক সময় ননডিসজাংশন হয়। *Oenothera*-র কতকগুলি প্রজাতি এক বা একাধিক ট্রান্সলোকেশনের জন্য স্থায়ীভাবে হেটারোজাইগাস (*heterozygous*) ও সেজন্য এদের মায়োসিসে নিয়মিতভাবে *ring* বা বলয় তৈরী হয়। *O. Lamerckiana*-র মায়োসিসে 12টা ক্রোমোসোমের একটা বলয় ও একটা বাইভ্যালেন্ট দেখা যায় (চিত্র 51)। এই
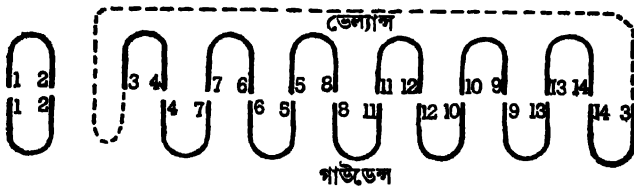
চিত্র 51

প্রথম মায়োটিক বিভাগে *O. Lamerckiana*-র ক্রোমোসোমের বিন্যাস

বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোম দুইটা ছাড়া অন্য সব ক্রোমোসোমে ট্রান্সলোকেশন হয়েছে। *O. Lamerckiana*-র প্রত্যেক ক্রোমোসোমকে দুইটা সংখ্যা দিয়ে নির্দেশ (যেমন 1—2, 3—4, 5—6 ইত্যাদি) করা হয়। বলয়ের ক্রোমোসোমগুলির একটা সেট (*set*) হ'ল 3—4, 5—8, 7—6, 9—10, 11—12, 13—14, ও অন্য সেটটা হ'ল 3—14, 5—6, 7—4, 12—10,

11—8 এবং 13—9। 1—2 ক্রোমোসোম দুইটা বাইভ্যালেন্ট গঠন করে। অ্যানাফেজে বলয়ের একটা ক্রোমোসোম এক মেরুতে ও পাশেরটা অন্য মেরুতে যায়। একটা সেটের বিভিন্ন ক্রোমোসোমগুলিকে একসাথে কমপ্লেক্স (*complex*) বলে। প্রথম সেটের ক্রোমোসোমগুলি ও একটা 1—2 ক্রোমোসোমকে ভেল্যান্স কমপ্লেক্স (*velans complex*) বলে। দ্বিতীয় সেট ও একটা 1—2 ক্রোমোসোমকে গাউডেন্স কমপ্লেক্স (*gaudens complex*) বলা হয়। ক্রোমোসোমগুলি এমনভাবে থাকে যার ফলে গাউডেন্স কমপ্লেক্স এক মেরুতে ও ভেল্যান্স কমপ্লেক্স অন্য মেরুতে যায়। দুটো কমপ্লেক্সেই লীথ্যাল (*lethal*) জীন কিম্বা ছোট ঘাটতি (*deficiency*) থাকে। গাউডেন্সের লীথ্যাল জীন ভেল্যান্সের লীথ্যাল জীন থেকে আলাদা। সুতরাং গাউডেন্স-গাউডেন্স কিম্বা ভেল্যান্স-ভেল্যান্স অবস্থা সব সময়েই প্রাণনাশক কারণ এখানে লীথ্যাল জীনটা হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকে। কিন্তু গাউডেন্স-ভেল্যান্স জোটে লীথ্যাল জীনটা হোমোজাইগাস অবস্থায় না থাকায় উদ্ভিদটা বেঁচে থাকে। *O. Lamerckiana* হল এইরকম একটা হেটারোজাইগোট। *O. Lamerckiana*-এ কোন কোন কোষ বিভাগের সময় বিশৃঙ্খলার জন্য পর্যায়ক্রমে একটা ক্রোমোসোম এক মেরুতে ও পাশেরটা অন্য মেরুতে না গিয়ে বলয়ের (*ring*) পাশাপাশি তিনটা ক্রোমোসোম একটা মেরুতে যায় অর্থাৎ ননডিসজাংশন হয়। এর ফলে একটা গ্যামেটে 8টা ক্রোমোসোম ও অন্যাটায় 6টা ক্রোমোসোম থাকে। প্রথম গ্যামেট কার্যকারী হয় কিন্তু দ্বিতীয় গ্যামেটটা নষ্ট হয়ে যায়। প্রথম গ্যামেটে 1টা গাউডেন্স ও 7টা ভেল্যান্স থাকে ও এটা স্বাভাবিক গাউডেন্স কমপ্লেক্সযুক্ত গ্যামেটের সাথে মিলিত হলে ট্রাইসোমিক *O. Lamerckiana*-র সৃষ্টি হয়। কিন্তু 8টা ক্রোমোসোমযুক্ত গ্যামেটটা ভেল্যান্স কমপ্লেক্সযুক্ত গ্যামেটের সাথে মিলিত হলে ঐ উদ্ভিদটা বাঁচতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ একটা গাউডেন্স ক্রোমোসোমে ভেল্যান্সের ক্ষতিকর জীনের প্রকাশ রোধকারী ডমিন্যান্ট জীন থাকে তবে উদ্ভিদটা বেঁচে থাকতে পারে। এইরকম উদ্ভিদে 5টা বাইভ্যালেন্ট ও 5টা ক্রোমোসোম যুক্ত অবস্থায় থাকে। এই উদ্ভিদে ননডিসজাংশনের ফলে সাতটা গাউডেন্স ও একটা ভেল্যান্স ক্রোমোসোমযুক্ত গ্যামেট তৈরী হয়ে থাকে।

Roman 1947 খৃষ্টাব্দে দেখেন যে মাইক্রোস্পোরের দ্বিতীয় বিভাগের সময় ভুট্টার B-ক্রোমোসোমের নন-ডিসজাংশন হয়। এর ফলে একটা পুংগ্যামেটে 2টা B-ক্রোমোসোম থাকে ও অন্যাটায় কোন B-ক্রোমোসোম থাকে না।

Roman ও Randolph-এর গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে ভুট্টার এই ননডিসজাংশন B-ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের জন্যে হয়। Roman বলেন যে B-ক্রোমোসোমের যথাযথভাবে পৃথক হবার অক্ষমতা সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। ভুট্টার B-ক্রোমোসোমগুলিতে সেন্ট্রোমিয়ার প্রান্তে থাকে কিন্তু A-ক্রোমোসোমগুলিতে (অটোসোম) সেন্ট্রোমিয়ার মাঝে থাকে।

Müntzing (1946) রাইয়ে নির্বাচিত ননডিসজাংশন (*non-disjunction*) দেখেছিলেন। রাইয়ে তিনরকমের ফ্র্যাগমেন্ট দেখা যায়— (*a*) একটা বড় ও একটা ছোট বাহুযুক্ত ফ্র্যাগমেন্ট (*fragment*) (*b*) বড় বাহু থেকে তৈরী বড় আইসো-ক্রোমোসোম (*iso-chromosome*) (*c*) ছোট বাহু থেকে তৈরী ছোট আইসো-ক্রোমোসোম। মায়োসিস বিভাগের পরের অ্যানাফেজে প্রথম ফ্র্যাগমেন্টটা কোন মেরুতে না গিয়ে মাঝামাঝি থাকে। সেন্ট্রোমিয়ার দুইটা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায় কিন্তু ক্রোমাটিড দুইটা পৃথক হতে পারে না। এর কারণ বড় বাহুতে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের উপস্থিতি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্পিণ্ডিলের প্রসারণের সাথে সাথে এই ক্রোমোসোমটা জনন (*generative*) কোষে যায়। বড় আইসোক্রোমোসোমের আচরণও একই রকম। এই আইসো-ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারের দুই পাশে দুইটা হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল থাকে। ছোট আইসোক্রোমোসোমে কিন্তু ননডিসজাংশন দেখা যায় না। রাই এবং ভুট্টায় কেবল মায়োসিস বিভাগের পরের বিভাগটা ছাড়া আর সব কোষ বিভাগ স্বাভাবিক হয়। ভুট্টার ননডিসজাংশন কেবল স্পার্ম বা শুক্রাণু গঠনের সময় হয়। কিন্তু রাইয়ে ডিম্বকেও (*ovule*) এইরকম অস্বাভাবিকতা দেখা যায়।

দেহ কোষে ননডিসজাংশনের জন্য কাইমিরা (*chimera*) দেখা দিতে পারে। কোন উদ্ভিদে জীন 'C'-র উপস্থিতিতে লাল রঙের ফুল ও এর অনুপস্থিতিতে সাদা ফুল হয়। একটা হেটারোজাইগাস লাল ফুলযুক্ত উদ্ভিদে CCcc জীন থাকে। এই উদ্ভিদের দলমণ্ডলের (*corolla*) পরিণতির সময় যদি ত্বকের কোষে ননডিসজাংশন হয় তবে একটা কোষে CCc জীন ও অন্য কোষে কেবল c জীন থাকতে পারে। দ্বিতীয় ধরণের কোষ থেকে যত কোষ তৈরী হবে সবগুলিই সাদা হবে। এর ফলে লাল ফুলের মধ্যে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। সাদা অংশটা কত বড় হবে তা নির্ভর করে দলমণ্ডলের পরিণতির কোন্ সময় ননডিসজাংশন হয়েছে তার উপর। ফুলটার খুবছোট অবস্থায় ননডিসজাংশন হ'লে সাদা অংশটা বেশ বড় হয়। ফুলটা প্রায় পরিণত হবার সময় ননডিসজাংশন হলে সাদা অংশটা ছোট হয়। Lawrence

Dahlia variabilis-এ এইরকম কাইমিরার বর্ণনা করেছেন। ***Nemesia strumosa***-এও এই ধরণের ননডিসজাংশন দেখা গিয়েছে।

Drosophila melanogaster-এ চার জোড়া ক্রোমোসোম থাকে। এর মধ্যে দুইটা হ'ল সেক্স ক্রোমোসোম। স্ত্রী ড্রসোফিলায় XX ও পুরুষ ড্রসোফিলায় XY সেক্স ক্রোমোসোম থাকে। স্ত্রী ড্রসোফিলার প্রত্যেক ডিম্বাণুতে সাধারণতঃ তিনটা অটোসোম (A) ও একটা X ক্রোমোসোম থাকে। কিন্তু ডিম্বাণু গঠনের সময় ননডিসজাংশনের হ'লে দুইটা X-ক্রোমোসোমযুক্ত ডিম্বাণু (3A+XX) বা X-ক্রোমোসোমবিহীন ডিম্বাণু (3A) তৈরী হয়। এই ননডিসজাংশনকে *primary non-disjunction* (প্রাথমিক অপৃথকতা) বলা হয় (চিত্র 52)। XX ক্রোমোসোমযুক্ত ডিম্বাণু স্বাভাবিক শুক্রাণুর (3A+X বা 3A+Y) সাথে মিলিত হতে পারে। যদি X ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণু ফার্টিলাইজেশনে অংশ নেয় তাহলে XXX
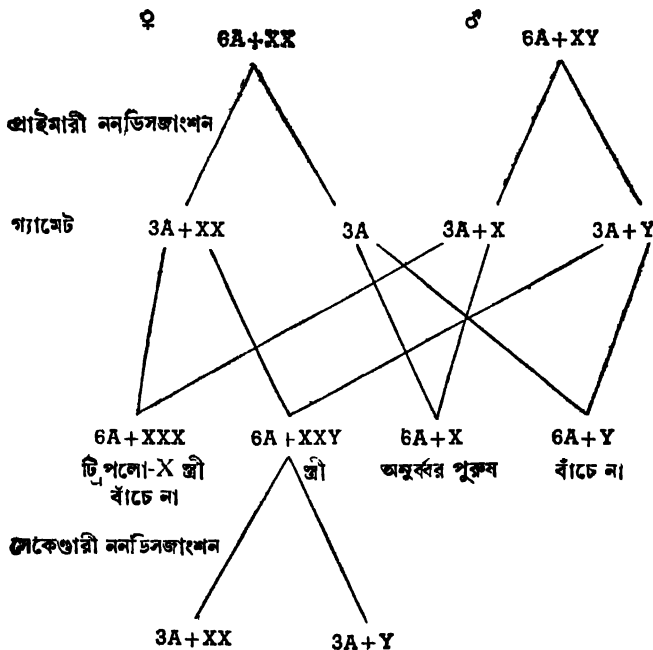
চিত্র 52

Drosophila-এ (2n = 8) প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী ননডিসজাংশন

ক্রোমোসোমযুক্ত ট্রাইসোমিক স্ত্রী পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই ট্রিপলো-X (*triplo-X*) ড্রসোফিলা পরিণত হবার আগেই সাধারণতঃ মারা যায়। Y-ক্রোমোসোমযুক্ত স্পার্ম XX ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হলে 6A+XXY স্ত্রী পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। এইরকমের স্ত্রী পতঙ্গ স্বাভাবিক হয়। X-ক্রোমোসোম বিহীন ডিম্বাণু X-ক্রোমোসোমযুক্ত স্পার্মের সাথে মিলিত হলে 6A+X অনুর্বর পুরুষ পতঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে। X-ক্রোমোসোম বিহীন ডিম্বাণু Y-ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণুর সাহায্যে নিষিক্ত (*fertilized*) হলে 6A+Y পতঙ্গটা বেঁচে থাকতে পারে না। 'X' ক্রোমোসোমে চোখের রঙের জীন w (সাদা) ও W (লাল) থাকে। Bridges (1916) অপ্রত্যাশিত চোখের রঙযুক্ত ড্রসোফিলা দেখতে পেয়েছিলেন এবং এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে X ক্রোমোসোমের ননডিসজাংশন আবিষ্কৃত হয়েছিল। সাদা চোখযুক্ত XXY স্ত্রী ড্রসোফিলায় ননডিসজাংশন দেখা যায়। একটা X ক্রোমোসোম Y ক্রোমোসোমের সাথে যুগ্ম অবস্থান করে, অন্য X টা আলাদা থাকে। অ্যানাফেজে একটা মেরুতে X ক্রোমোসোম ও অন্যটায় Y ক্রোমোসোম যায়। আলাদা Xটা আকস্মিকভাবে কোন কোন সময় অন্য Xটা যে মেরুতে গিয়েছিল সেখানে যায়। এর ফলে একটা গ্যামেটে দুইটা X-ক্রোমোসোম ও অন্যটায় Y-ক্রোমোসোম থাকে। এইরকমের ননডিসজাংশনকে *secondary non-disjunction* (বা পরবর্তী অপৃথকতা) (চিত্র 52) বলা হয়।

ক্রোমোসোমের বর্জন (*elemination*)

Rosa canina-এ ক্রোমোসোমের বর্জন (*elemination*) দেখা যায়। পেন্টাপ্লয়েড (5n) প্রজাতি *Rosa canina* সংকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। এই উদ্ভিদের দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল 35। এখানে পরাগরেণু ও স্ত্রীরেণুর গঠনের সময় সাতটা বাইভ্যালেন্ট ও একুশটা ইউনিভ্যালেন্ট (*univalent*) দেখা যায় (Tackholm '22, Gustafson '44)। উভয় ক্ষেত্রেই সাতটা বাইভ্যালেন্ট মায়োসিস বিভাগের অ্যানাফেজে নিয়মিতভাবে আলাদা হয়ে বিপরীত মেরুতে যায়। পরাগরেণু মাতৃকোষে প্রথম মায়োটিক বিভাগের সময় বাইভ্যালেন্টগুলি আগে আলাদা হয়ে দুই মেরুতে যায়, পরে ইউনিভ্যালেন্টগুলি মোটামুটি সম-সংখ্যায় উভয় মেরুতে যায়। তবে কোন কোন ইউনিভ্যালেন্ট মেরুতে পৌঁছাতে না পারায় বাতিল হয়ে যায়। দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাগেও বাইভ্যালেন্টগুলি নিয়মিতভাবে আলাদা হয়, কিন্তু বেশীর ভাগ ইউনিভ্যালেন্টই কোন মেরুতে পৌঁছাতে পারে না ও নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে সাধারণতঃ সাত, আট, নয়টা ক্রোমো-

সোমযুক্ত পরাগরেণু তৈরী হয়। তবে সাতটা ক্রোমোসোমযুক্ত পরাগরেণুই (*pollen*) সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হয়। স্ত্রীরেণুর গঠনের সময়ও বাইভ্যালেন্টগুলি নিয়মিত ভাবে আলাদা হয়। কিন্তু সব ইউনিভ্যালেন্ট-গুলি ডিম্বক রন্ধ্রের অর্থাৎ মাইক্রোপাইলের (*micropyle*) দিকের মেরুতে যায় ফলে একটা নিউক্লীয়াসে কেবল 7টা ও অন্যটায় 28টা ক্রোমোসোম থাকে। দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাগ নিয়মিতভাবে হয় ও 28টা ক্রোমোসোম-যুক্ত দুইটা বড় স্ত্রীরেণু (মেগাস্পোর) ও 7টা ক্রোমোসোমযুক্ত দুইটা ছোট স্ত্রীরেণু তৈরী হয়। একটা বড় স্ত্রীরেণু কার্যকরী হয় ও এমব্রায়ো স্যাক (ভ্রূণস্থলী) গঠন করে। 7টা ক্রোমোসোমযুক্ত স্পার্মের সাথে 28টা ক্রোমোসোম-যুক্ত এই ডিম্বাণু মিলিত হয়ে 35টা ক্রোমোসোমযুক্ত পেন্টাপ্লয়েড *Rosa canina*-র সৃষ্টি করে। এই উদ্ভিদের সব ইউনিভ্যালেন্টগুলিই মাতা থেকে আসে ও এইসব ক্রোমোসোমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চরিত্রে মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার (*maternal inheritance*) লক্ষ্য করা যায়।

অনেক প্রাণীতেও ক্রোমোসোমের বর্জন লক্ষ্য করা গিয়েছে। দ্বিপক্ষযুক্ত পতঙ্গ (*diptera*) *Sciara*-তে এই ঘটনা (চিত্র 53) দেখা যায়। *Sciara coprophila*-এ Metz ও তাঁর সহকর্মীরা দেখেন যে তিন জোড়া অটো-সোম ও তিনটা সেক্স ক্রোমোসোম (XXX) ছাড়াও একটা থেকে তিনটা খুব লম্বা ক্রোমোসোম থাকে। এদের 'লিমিটেড' (*limited*) বা সীমিত ক্রোমোসোম বলে। *S. coprophila*-এ জাইগোটের প্রথম কয়েকটা বিভাগের সময়ই দেহ কোষ ও যেসব কোষ থেকে পরে জনন কোষ তৈরী হবে তা আলাদা হয়ে যায়। দেহ কোষের পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ মাইটোসিসের সময় দীর্ঘ 'লিমিটেড' বা সীমিত ক্রোমোসোম তিনটা কোন মেরুতে যেতে পারে না ও নিরক্ষরেখা অঞ্চলে থাকে। ফলে কোন অপত্য নিউক্লীয়াসেই এরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না ও নষ্ট হয়ে যায়। সপ্তম বা অষ্টম বিভাগের সময় একইভাবে X-ক্রোমোসোম বাদ যায়। স্ত্রী *Sciara*-র দেহ কোষ থেকে পিতার একটা X ক্রোমোসোম বাতিল হয় ও পুরুষ *Sciara*-র দেহ কোষ থেকে পিতার দুইটা X-ক্রোমোসোমই বাতিল হয়ে যায়। জনন কোষেও দেহ কোষের মত ক্রোমোসোমের বর্জন (*elemination*) লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে এখানে দেহ কোষের চেয়ে পরে ক্রোমোসোম বাতিল হয়। প্রথমে এক বা একাধিক *limited* ক্রোমোসোম বাদ যায়। সব ডিম্বাণু গঠনকারী কোষে পিতা থেকে আসা একটা X-ক্রোমোসোম বাদ যায়। সুতরাং ডিম্বাণু গঠনকারী কোষে পিতার একটা X-ক্রোমোসোম ও মাতার একটা X-ক্রোমোসোম থাকে। স্পার্ম বা শুক্রাণু গঠনের সময় কেবল মাতা থেকে

চিত্র 53
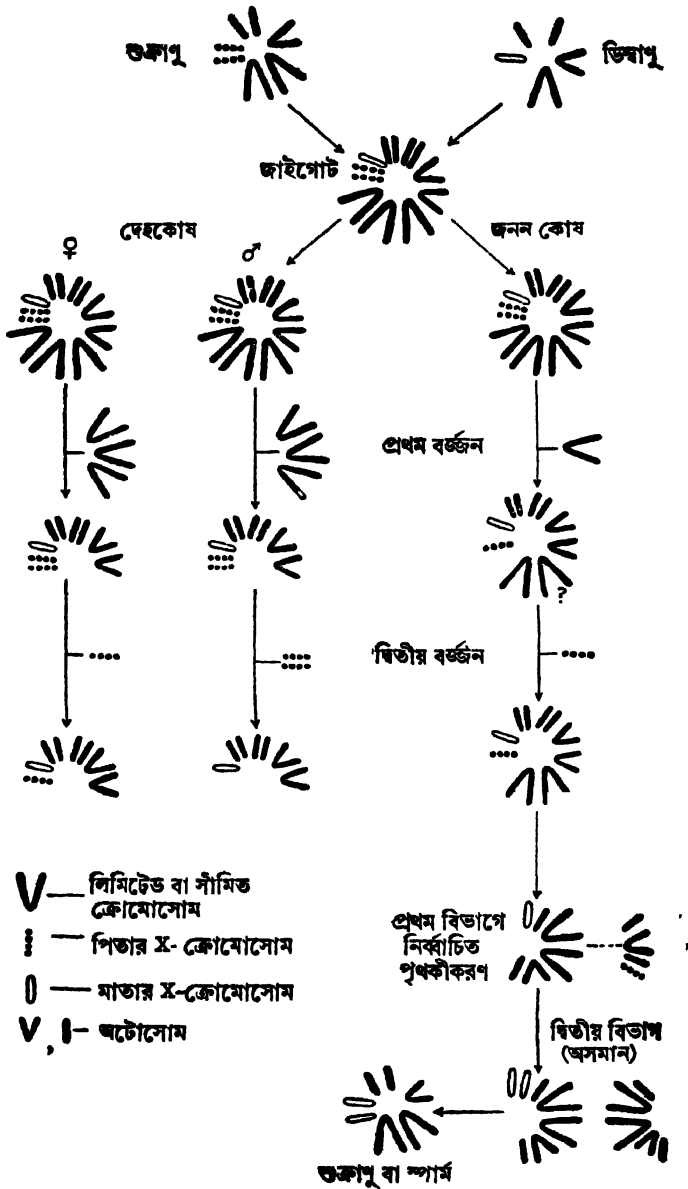
Sciara coprophila-এ ক্রোমোসোমের বর্জন

যে অটোসোম ও X-ক্রোমোসোম এসেছিল সেগুলি এবং লিমিটেড ক্রোমোসোমগুলি থাকে, পিতা থেকে আসা সব অটোসোম ও সেক্স ক্রোমোসোম বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং স্পার্মে কেবল মাতার ক্রোমোসোমগুলি থাকে। *S. ocellaris*-এ Berry দেখেন যে জনন কোষ থেকে X-ক্রোমোসোম ইন্টারফেজে বাতিল হয় (চিত্র 54)। পিতার একটা X-ক্রোমোসোম নিউ-

চিত্র 54
Sciara ocellaris-এ ক্রোমোসোমের বর্জন
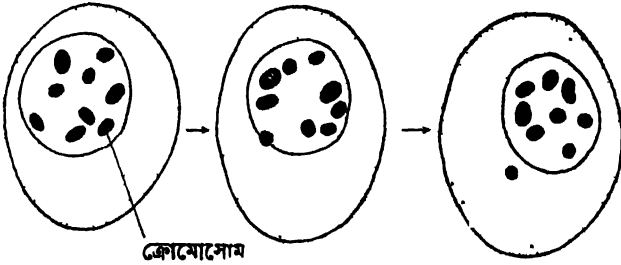
ক্লীও মেমব্রেনের দিকে যায় ও পরে ঐ পর্দার মধ্যে দিয়ে সাইটোপ্লাজমে আসে। সাইটোপ্লাজমে কিছুকাল থাকার পর ঐ ক্রোমোসোমটা নষ্ট হয়ে যায়।

সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন (*secondary association*)

আগেই বলা হয়েছে যে মায়োসিসে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা দেখা যায়। যুগ্ম ক্রোমোসোমের কায়েসমাগুলি জাইগোটিন থেকে প্রথম অ্যানাফেজ পর্যন্ত ঐ হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটাকে একসাথে রাখে। এইরকমের যুগ্মতাকে প্রাইমারী অ্যাসোসিয়েশন (*primary association*) বলে। প্রোমেটাফেজে কোন কোন সময় দুইটা বা তারচেয়ে বেশী সংখ্যক বাইভ্যালেন্ট পরস্পরের কাছে থাকে। এই অবস্থাকে সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন (চিত্র 55a, b) বলা হয়। মায়োসিসে সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখা যায়। Darlington প্রথম *Prunus*-এ এবং Lawrence *Dahlia*-এ সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখেছিলেন। পরবর্তী বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে অনেক উদ্ভিদেই ক্রোমোসোম এইরকম অবস্থায় থাকে। সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশনের কারণ হ'ল যে ঐসব বাইভ্যালেন্টের মধ্যে সুদূর অতীতে কোন সামঞ্জস্য ছিল। বিবর্তনের ফলে এইসব

ক্রোমোসোমে কিছু গঠনগত পার্থক্য হওয়ায় এখন এদের মধ্যে যুগ্মতা হয় না। অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের পৃথকীকরণের (*seggregation*) উপর সেকেণ্ডারী অ্যাসোসিয়েশনের কোন প্রভাব নাই।
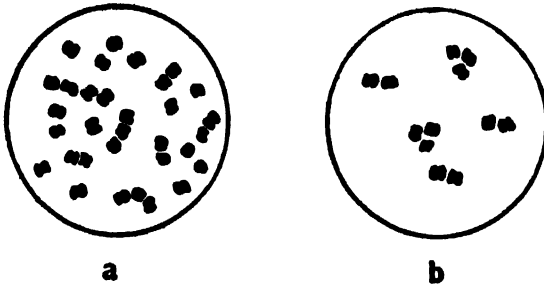
চিত্র 55

সেকেণ্ডারী অ্যাসোসিয়েশন, *a—Dahlia variabilis*-এ, *b*—ধানে (*Oryza sativa*)

সেকেণ্ডারী অ্যাসোসিয়েশন কোন উদ্ভিদের অ্যালোপলিপ্লয়েড (*allopolyplolid*) বিশেষ করে অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড (*amphidiploid*) প্রকৃতি নির্দেশ করে। ছোট ক্রোমোসোমযুক্ত অ্যালোপলিপ্লয়েডে সচরাচর সেকেণ্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখা যায়।

সেকেণ্ডারী অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্যে কোন প্রজাতির সঠিক মূল সংখ্যা (*basic number*) বোঝা যায়। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন সর্বনিম্ন সংখ্যক সমাবেশই বেসিক সংখ্যা নির্দেশ করে। কিন্তু অন্যান্যদের মতে যে ধরনের সমাবেশ সবচেয়ে বেশী হারে দেখা যায় তাই মূল সংখ্যা (*basic number*) নির্দেশ করে। প্রথম মতই ঠিক। অনেক বিজ্ঞানীরা এই মতের প্রতিবাদ করেছেন। Heilborn-এর (1936) মতে নিউক্লীয়াসের মধ্যে বিষম শক্তির বিকর্ষণের ফলে সেকেণ্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখা যায়। কিন্তু এই মত সমর্থন লাভ করে নাই। Propach-এর (1937) মতে ফিক্সেটিভের প্রভাবে সৃষ্ট কৃত্রিম বস্তুই (*artifact*) সেকেণ্ডারী অ্যাসোসিয়েশন হিসাবে দেখা দেয়। কিন্তু এই মতও সমর্থিত হয় নাই। *Cicer* উপর গবেষণা করে Thomas ও Revell (1946) বলেছিলেন যে কোষ বিভাগের প্রথম দিকে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলগুলির যদৃচ্ছ মিলনের ফলে মেটাফেজে সেকেণ্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখা যায়।

Commelinaceae-র বিভিন্ন উদ্ভিদে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের মিলন ও সেকেন্ডারী অ্যাসোসিয়েশন দেখা গিয়েছে এবং এটা Thomas ও Revell-এর মতকে সমর্থন করে। তবে ক্রোমোসোমের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের মিলন নিয়ন্ত্রিতভাবে হয়। কেবল হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলেই সংযোগ দেখা যায় কারণ পূর্বপুরুষের হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলেই সবচেয়ে কম পরিবর্তন হয়েছে। এজন্য এদের মধ্যে এখনও বিশেষ রকমের সংযোগ হয় এবং হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের চটচটে প্রকৃতি এই প্রক্রিয়াকে সুগম করে।

সপ্তম অধ্যায়

জনন (Reproduction)

সব উদ্ভিদের জীবন চক্র (*life cycle*) দুইটা পর্যায়ে সম্পূর্ণ হয়। একটাকে রেণুধর উদ্ভিদ বা *sporophyte* এবং অন্যটাকে লিঙ্গধর উদ্ভিদ বা *gametophyte* বলা হয়। উদ্ভিদের জীবন চক্রে রেণুধর উদ্ভিদ এবং লিঙ্গধর উদ্ভিদের এই পর্যায়ক্রমকে জনুঃক্রম বা অলটারনেশন অফ জেনারেশনস (*alternation of generations*) বলে। রেণুধর উদ্ভিদ জাইগোট (*zygote*) থেকে তৈরী হয় ও রেণু গঠন করে। লিঙ্গধর উদ্ভিদ রেণু থেকে তৈরী হয় ও গ্যামেট (*gamete*) সৃষ্টি করে।। রেণু গঠনের সময় মায়োসিস হওয়ার ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হয়। লিঙ্গধর উদ্ভিদ থেকে সৃষ্ট দুইটা গ্যামেটের মিলনের ফলে জাইগোট গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে নিষেক বা ফার্টিলাইজেশন (*fertilization*) বা সীনগ্যামী (*syngamy*) বলে। নিষেকের ফলে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। মায়োসিসের ফলে লিঙ্গধর উদ্ভিদের এবং নিষেকের ফলে রেণুধর উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এবং রেণুধর উদ্ভিদে লিঙ্গধর উদ্ভিদের দ্বিগুণ সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।

বিভিন্ন উদ্ভিদের জনুঃক্রমে পার্থক্য দেখা যায়। শৈবাল ও ছত্রাকের জীবন চক্রের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লিঙ্গধর উদ্ভিদ এবং কখনও কখনও রেণুধর উদ্ভিদ কিম্বা রেণুধর বা লিঙ্গধর উদ্ভিদ দুইটাই প্রাধান্য লাভ করতে পারে। ব্রায়োফাইটা (*bryophyta*) বা মস জাতীয় উদ্ভিদে লিঙ্গধর উদ্ভিদ বা গ্যামেটোফাইট জীবন চক্রের প্রধান অংশ এবং রেণুধর উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত ছোট, পরজীবী ও ক্ষণস্থায়ী (চিত্র 56)। টেরিডোফাইটা (*pteridophyta*) বা ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদে রেণুধর উদ্ভিদই প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে লিঙ্গধর উদ্ভিদ সাধারণতঃ বেশ ছোট, যদিও স্বাধীন হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদে রেণুধর উদ্ভিদটাই প্রধান এবং লিঙ্গধর উদ্ভিদ সাধারণতঃ এত ছোট হয় যে তা খালি চোখে দেখা যায় না এবং তার কোন স্বাধীন অস্তিত্বও নাই।

নিষেক বা ফার্টিলাইজেশনের সময় একই উদ্ভিদ থেকে সৃষ্ট দুইটা গ্যামেট মিলিত হলে ঐ উদ্ভিদকে **হোমোথ্যালিক** (*homothallic*) বলে। দুইটা উদ্ভিদ থেকে সৃষ্ট গ্যামেটের মিলনের ফলে জাইগোট তৈরী হলে ঐ উদ্ভিদকে **হেটারোথ্যালিক** (*heterothallic*) বলা হয়।
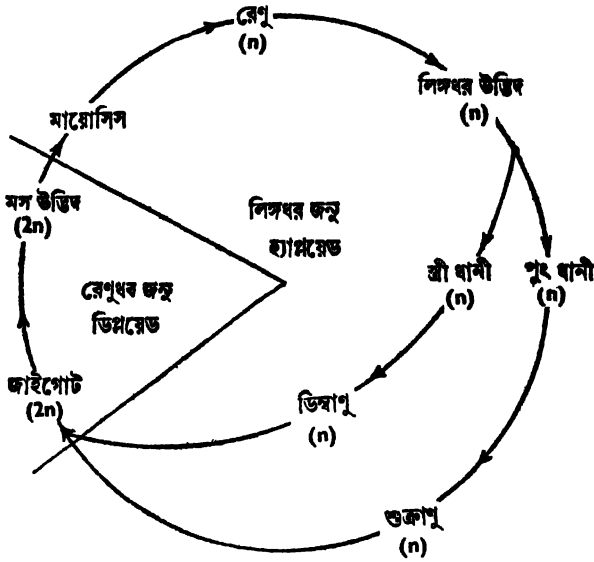
চিত্র *56*
মসের জীবন চক্র

গুপ্তবীজী উদ্ভিদে জনন (*reproduction in angiosperms*)

গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জীবন চক্রে রেণুধর উদ্ভিদই প্রধান। রেণুধর উদ্ভিদের পরাগধানী (*anther*) এবং গর্ভাশয়ে (*ovary*) মায়োসিসের ফলে রেণু তৈরী হয়। এইসব রেণু থেকে লিঙ্গধর উদ্ভিদের (*gametophyte*) সৃষ্টি হয়। লিঙ্গধর উদ্ভিদ পুষ্টির জন্য রেণুধর উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। পরাগধানীতে পরাগরেণু (*pollen grain*) এবং গর্ভাশয়ে ডিম্বক (*ovule*) গঠিত হয়। পরাগরেণু পুং গ্যামেট (*male gamete*) সৃষ্টি করে এবং ডিম্বক ডিম্বাণু (*egg*) তৈরী করে। গর্ভাশয়েই পুং গ্যামেট ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। এর থেকে পরে ভ্রূণ (*embryo*) ও বীজ গঠিত হয়। স্ত্রী লিঙ্গধর উদ্ভিদ স্ত্রী রেণুর প্রাচীরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।

স্ত্রী রেণুর গঠন প্রণালী (*megasporogenesis*)

গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ডিম্বকের ভিতরের অংশকে নিউসেলাস (*nucellus*) বা ভ্রূণ পোষক বলে। এটা ডিম্বক ত্বক বা *integument* দিয়ে আবৃত থাকে। ডিম্বকের যে স্থানে ডিম্বক ত্বক থাকে না সেই অঞ্চলকে ডিম্বক রন্ধ্র

বা *micropyle* বলা হয়। ভ্রূণ পোষকের উপরের অংশে স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ থাকে। এই কোষ ক্রমশঃ বড় হয়ে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়। এর পরবর্তী পর্যায়গুলি বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়।

ভুট্টায় স্ত্রীরেণু মাতৃকোষে মায়োসিস বিভাগের ফলে 4টা স্ত্রীরেণু গঠিত হয়। তিনটা স্ত্রীরেণু পরে নষ্ট হয়ে যায় এবং চতুর্থটা বড় হয়ে ভ্রূণস্থলী (*embryo sac*) গঠন করে। এমব্রিয়ো স্যাকে প্রথম একটা হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লীয়াস থাকে। এই নিউক্লীয়াসটা তিনবার বিভক্ত হয়ে আটটা নিউক্লীয়াস গঠন করে। আটটা নিউক্লীয়াসের মধ্যে তিনটা ডিম্বক রন্ধ্রের (*micropyle*) বিপরীত দিকে যায় ও ঐখানে প্রাচীর গঠনের ফলে প্রতিপাদ কোষ সমষ্টি বা *antipodal cells*-এর সৃষ্টি করে। বাকী পাঁচটা নিউক্লীয়াসের মধ্যে তিনটা ডিম্বক রন্ধ্রের দিকে তিনটা কোষের সৃষ্টি করে। এই তিনটা কোষের মধ্যে মাঝেরটাকে ডিম্বাণু (*egg*) কোষ ও অন্য দুইটাকে সহকারী কোষ (*synergid*) বলে। অবশিষ্ট দুইটা নিউক্লীয়াস ভ্রূণস্থলীর মাঝখানে আসে। ভুট্টায় এই নিউক্লীয়াস দুইটা পাশাপাশি থাকে কিন্তু অন্য কোন কোন উদ্ভিদে এরা মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড সেকেণ্ডারী নিউক্লীয়াস (*secondary* বা *fusion nucleus*) গঠন করে। এছাড়া বিভিন্ন উদ্ভিদে অন্যান্য ধরণের এমব্রিয়ো স্যাক দেখা যায়। চিত্র 57-এ আট নিউক্লীয়াসযুক্ত *Polygonum, Allium, Fritillaria* ও *Adoxa;* চার নিউক্লীয়াসযুক্ত *Oenothera* এবং ষোলটা নিউক্লীয়াসযুক্ত *Paperomia* ধরণের ভ্রূণস্থলীর (*embryo sac*) গঠন প্রণালী দেখান হয়েছে।

পরাগরেণুর (*pollen*) গঠন প্রণালী

ফুল ফুটবার আগেই প্রত্যেক পরাগরেণু মাতৃকোষে মায়োটিক বিভাগ হয়ে থাকে। মায়োসিসের ফলে চারটা পরাগরেণু তৈরী হয়। পরাগরেণুতে দুইটা প্রাচীর থাকে—রেণু বহিঃস্তক (*exine*) ও রেণু অন্তঃস্তক (*intine*) এই পরাগরেণুগুলিই হ'ল পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদ (*male gametophyte*)। প্রত্যেক পরাগরেণুর নিউক্লীয়াসটা বিভক্ত হয়ে *generative* বা জনন নিউক্লীয়াস এবং *tube* বা নালী নিউক্লীয়াস গঠন করে। পরে জনন নিউক্লীয়াসটা বিভক্ত হয়ে দুইটা পুংগ্যামেটের সৃষ্টি করে (চিত্র 58)। বিভিন্ন উদ্ভিদে জনন নিউক্লীয়াসের বিভাগের সময়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ভুট্টায় পরাগধানী থেকে পরাগরেণু বের হবার আগেই জনন নিউক্লীয়াস বিভক্ত হয়। কিন্তু লিলিতে গর্ভদণ্ডের (*style*) মধ্যে দিয়ে যখন পরাগ নালীটা ডিম্বক রন্ধ্রের দিকে যায় তখন জনন নিউক্লীয়াসের বিভাগ হয়।

বিভিন্ন ধরণের এমব্রিয়ো স্যাক	স্ত্রী রেণুর সৃষ্টি			এমব্রিয়ো স্যাকের (ভ্রূণথলী) পরিণতি			
	স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	চতুর্থ বিভাগ	পঞ্চম বিভাগ	পরিণত এমব্রিয়ো স্যাক
একটা রেণু থেকে তৈরী আট নিউক্লিয়াসযুক্ত Polygonum ধরণের							
একটা রেণু থেকে তৈরী চার নিউক্লিয়াসযুক্ত Oenothera ধরণের							
দুইটা রেণু থেকে তৈরী আট নিউক্লিয়াসযুক্ত Allium ধরণের							
চারটা রেণু থেকে তৈরী ষোল নিউক্লিয়াসযুক্ত Peperomia ধরণের							
চারটা রেণু থেকে তৈরী আট নিউক্লিয়াসযুক্ত Fritillaria ধরণের							
চারটা রেণু থেকে তৈরী আট নিউক্লিয়াসযুক্ত Adoxa ধরণের							

চিত্র 57

গুপ্তবীজী উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরণের এমব্রিয়ো স্যাকের গঠন প্রণালী

ফার্টিলাইজেশন (*fertilization*) **বা সীনগ্যামী** (*syngamy*) **বা নিষেক**

পরাগরেণুগুলি গর্ভমুণ্ডে (*stigma*) এসে পড়লে ঐখানে অঙ্কুরিত হয়। পরাগ নালীতে (*pollen tube*) নালী নিউক্লিয়াস ও জনন নিউক্লীয়াস বা দুইটা পুংগ্যামেট থাকে। পরাগ নালী গর্ভদণ্ডের মধ্যে দিয়ে গিয়ে (চিত্র 59a) ডিম্বক রন্ধ্রের কোষগুলিকে ভেদ করে ভ্রূণস্থলীতে (*embryo sac*)প্রবেশ করে (চিত্র 59b)। ডিম্বাণুর সাথে একটা পুংজনন কোষের মিলনের ফলে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট এবং সেকেণ্ডারী নিউ-

চিত্র 58
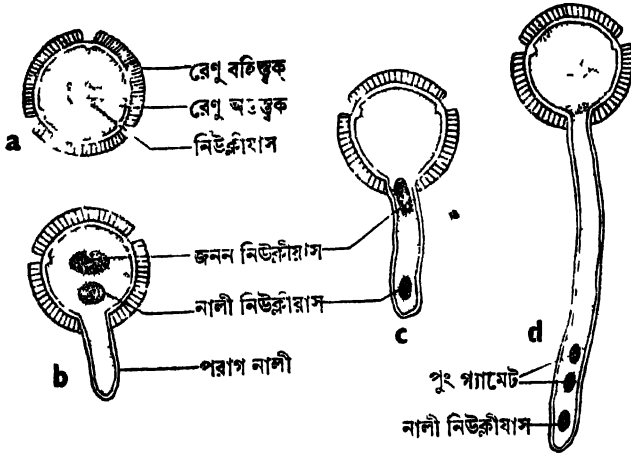
পরাগরেণুর অংকুরোদ্গম ও পুংগ্যামেটের উৎপত্তি
a—পরাগরেণু; b-c—দ্বিনিউক্লীয়াসযুক্ত অবস্থা ও পরাগরেণুর অংকুরোদ্গম;
d—জনন কোষটা বিভক্ত হযে দুইটা পুংগ্যামেটের সৃষ্টি হয়েছে

ক্লীয়াসেব সাথে অন্য পুংজনন কোষের মিলনের ফলে ট্রিপ্লয়েড (3n) সস্য *(endosperm)* নিউক্লীয়াস গঠিত হয় (চিত্র 59c)। ফার্টিলাইজেশন বা নিষেকে দুইটা জনন কোষই অংশ নেয় বলেই এই প্রক্রিয়াকে *double fertilization* বা দ্বি-নিষেক বলে।

নিষেকের পর জাইগোট থেকে ভ্রূণ *(embryo)* এবং সস্য নিউক্লীয়াস থেকে সস্য গঠিত হয় (চিত্র 59c-e)। ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় সস্য পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে। সাধারণতঃ পরাগনালীর এমব্রিয়ো স্যাকে প্রবেশের সময় একটা সহকারী কোষ নষ্ট হয়ে যায়, অন্য সহকারী কোষটা নিষেকের পরই লুপ্ত হয়। সস্য গঠনের সময় প্রতিপাদ কোষ সমষ্টিও নষ্ট হয়ে যায়।

বিভিন্ন উদ্ভিদেব পরিণত বীজে সস্যের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। ভুট্টার বীজের বেশীর ভাগ অংশই সস্য দিয়ে তৈরী। এখানে সস্যের রঙ বিভিন্ন রকমের হয় এবং নির্দিষ্ট জীন সস্যের রঙ নিয়ন্ত্রণ করে। মটরশুঁটির পরিণত বীজে সস্য থাকে না কারণ ভ্রূণের পরিণতির সময় সস্য জীর্ণ হয়ে যায়। এই বীজের বীজপত্রে *(cotyledon)* খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকে।
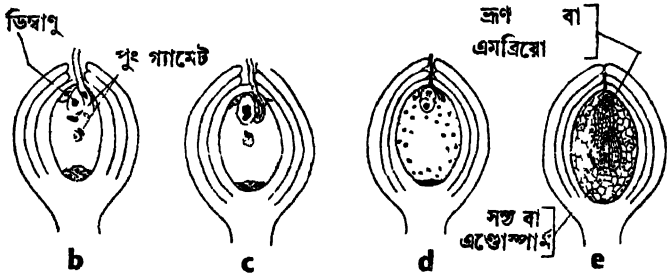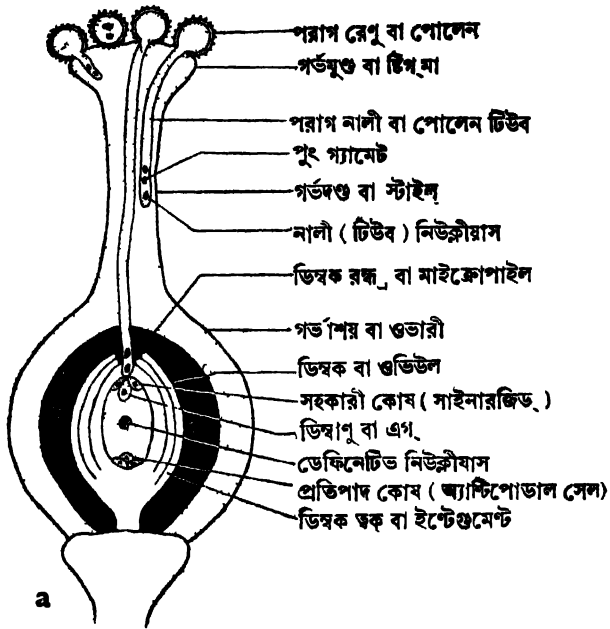
চিত্র 59

নিষেক বা ফার্টিলাইটজেশন a—স্ত্রী স্তবক (*gynoecium*) ও পরাগরেণুর অঙ্কুরোদ্গম, একটা পরাগ নালী গর্ভদণ্ডের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ডিম্বব রন্ধ্রের কোষগুলি ভেদ করে ভ্রূণস্থলীতে প্রবেশ করছে ; b—পরাগ নালী থেকে দুইটা পুংগ্যামেট ভ্রূণস্থলীতে প্রবেশ করছে ; c—একটা পুং গ্যামেট ডিম্বাণুর সাথে এবং আরেকটা পুংগ্যামেট ডেফিনেটিভ নিউক্লীয়াসের সাথে মিলিত হচ্ছে ; d—দ্বিকোষী ভ্রূণ ও মুক্ত নিউক্লীয় অবস্থা ; e—দুইটা বীজপত্রযুক্ত ভ্রূণ ও বহুকোষী সস্য

গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বীজের জেনেটিক গঠন মিশ্র ধরণের কারণ এটা বিভিন্ন জেনেটিক গঠনযুক্ত টিসু (যেমন ডিপ্লয়েড এমব্রিয়ো, ট্রিপ্লয়েড এণ্ডোস্পার্ম, ইত্যাদি) দিয়ে তৈরী।

অ্যাপোমিক্সিস (*apomixis*)

অনেক জীব যৌন জননের পরিবর্তে আংশিক কিম্বা সম্পূর্ণভাবে অযৌন জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এইরকমের জননকে অ্যাপোমিক্সিস বলে। **Fagerlind** ও **Stebbins** অ্যাপোমিক্সিসকে প্রধানতঃ দুইটা শ্রেণীতে (চিত্র 60) ভাগ করেছেন— (1) অঙ্গজ (*vegetative*) অ্যাপোমিক্সিস,
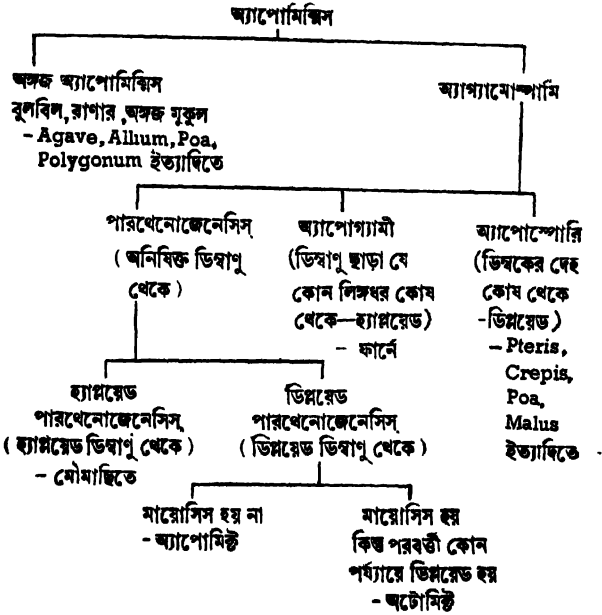
চিত্র 60
অ্যাপোমিক্সিসের বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখান হয়েছে

(2) অ্যাগ্যামোস্পার্মি (*agamospermy*) বা বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে অ্যাপোমিক্সিস।

(1) অঙ্গজ অ্যাপোমিক্সিস

বুলবিল (*bulbil*), রানার (*runner*), অঙ্গজ মুকুল (*vegetative bud*) ইত্যাদির মাধ্যমে অঙ্গজ অ্যাপোমিক্সিস হয়। *Agave, Allium, Festuca, Poa, Polygonum, Saxifraga* প্রভৃতিতে অঙ্গজ অ্যাপোমিক্সিস দেখা যায়।

(২) অ্যাগামোস্পার্মি

এখানে ফার্টিলাইজেশন ছাড়াই বীজ তৈরী হয়। অ্যাগামোস্পার্মিকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(*a*) কোন কোন সময় ডিম্বাণু নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি কোন জীবের সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতিকে পারথেনোজেনেসিস (*parthenogenesis*) বা অপুংজনি বলে। অনেক নিম্নশ্রেণীর প্রাণী এবং কিছু উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে পারথেনোজেনেসিসের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। কৃত্রিম উপায়েও পারথেনোজেনেটিক (*parthenogenetic*) জীবের সৃষ্টি করা সম্ভব।

পারথেনোজেনেসিসকে আবার দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস ও ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস।

হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিসে মায়োসিস স্বাভাবিকভাবে হয়। হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুটা ফার্টিলাইজেশন ছাড়াই নূতন জীবের (n) সৃষ্টি করে। মৌমাছি ও অন্যান্য কোন কোন পতঙ্গে নিয়মিতভাবে হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস হয় এবং এইরকমের জননের ফলে পুরুষ পতঙ্গের সৃষ্টি হয়।

ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিসে মায়োটিক বিভাগ অস্বাভাবিক হয় কিম্বা হয় না। এর ফলে ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু তৈরী হয়। এই ডিম্বাণু থেকে পারথেনোজেনেসিসের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হয়। কোন কোন নিম্নশ্রেণীর প্রাণী কেবল এই উপায়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিসের ফলে স্ত্রী পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। কিছু উদ্ভিদে নিয়মিতভাবে ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস হয়। অনেক সময় এইরকম জননকে অ্যাপোমিকটিক পারথেনোজেনেসিসও (*apomictic parthenogenesis*) বলে। কিছু পলিপ্লয়েড প্রাণীতেও এরকমের জনন দেখা গিয়েছে।

অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে (যেমন পিঁপড়া, মৌমাছি ইত্যাদি) অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে হ্যাপ্লয়েড পুরুষ এবং নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ডিপ্লয়েড স্ত্রীর সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিকে হ্যাপ্লোডিপ্লয়ডি (*haplodiploidy*) বলে।

কোন কোন প্রাণীতে পুরুষেরা জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে অথবা অনুপস্থিত থাকে। এই সব ক্ষেত্রে স্ত্রীতে মায়োসিস স্বাভাবিক হয় ও ডিম্বাণু সরাসরি নূতন জীবের সৃষ্টি করে। ডিম্বাণুটা হ্যাপ্লয়েড হলেও পরবর্তী কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় ও এর ফলে সৃষ্ট জীবটা ডিপ্লয়েড হয়। এই জননকে অটোমিকটিক (*automictic*) পারথেনোজেনেসিস বলে। এইরকমের জনন উদ্ভিদে বিরল।

অনেক সময় পুংজনন কোষটা ডিম্বাণুতে প্রবেশ করেই নষ্ট হয়ে যায় এবং মাতৃনিউক্লীয়াসযুক্ত ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ তৈরী হয়। এইরকমের জননকে গাইনোজেনেসিস (*gynogenesis*) বলে।

কখনও কখনও মাতৃনিউক্লীয়াসটা নষ্ট হবার ফলে হ্যাপ্লয়েড পিতৃনিউক্লীয়াস থেকে ভ্রূণ তৈরী হয়। এই ধরনের জননকে অ্যান্ড্রোজেনেসিস (*androgenesis*) বলে।

অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ফল উৎপন্ন হ'লে ঐ প্রক্রিয়াকে পারথেনোকার্পি (*perthenocarpy*) বলে। কলা, লেবু আঙ্গুর ইত্যাদিতে পারথেনোকার্পি দেখা যায়। টমেটো, তামাক, মরিচ প্রভৃতিতে কৃত্রিম উপায়ে পারথেনোকার্পিয় ফলের সৃষ্টি করা হয়েছে।

(*b*) রেণু গঠন ছাড়াই ডিম্বকের (*ovule*) যে কোন দেহ কোষ থেকে উদ্ভিদের সৃষ্টি হ'লে ঐ প্রক্রিয়াকে অ্যাপোস্পোরি (*apospory*) (চিত্র 61A) বলে। *Dryopteris, Pteris, Pellaea* ইত্যাদি ফার্ণে এবং *Crepis, Poa, Potentilla, Mallus* প্রভৃতি গুপ্তবীজী উদ্ভিদে এইরকমের জনন দেখা যায়। যদি ডিপ্লয়েড রেণুধারণ কোষ থেকে উদ্ভিদ গঠিত হয় তবে ঐ পদ্ধতিকে ডিপ্লোস্পোরি (*diplospory*) বলে। এখানে মায়োসিস ও নিষেক হয় না। *Chondrilla, Erigeron, Taraxacum* ইত্যাদিতে ডিপ্লোস্পোরি দেখা যায়।

(*c*) ডিম্বাণু ছাড়া অন্য যে কোন লিঙ্গধর কোষ থেকে সরাসরি রেণুধর উদ্ভিদ তৈরী হ'লে ঐ জননকে অ্যাপোগ্যামি (*apogamy*) বলে। ফার্ণে অ্যাপোগ্যামি (চিত্র 61B) দেখা যায়। কোন কোন ফার্ণে অ্যাপোগ্যামির পর অ্যাপোস্পোরি হয়।

অ্যাপোমিক্সিসের মাধ্যমে যেসব উদ্ভিদে জনন হয় তাদের কোন কোনটাতে পরাগযোগ না হ'লে ভ্রূণ পরিণত হয় না। এইসব উদ্ভিদকে সিউডোগ্যামাস (*pseudogamous*) উদ্ভিদ এবং জনন প্রক্রিয়াকে সিউডোগ্যামি (*pseudogamy*) বলে।

Fagerlind (1940), Gustafson (1946-48), Stebbins (1941, 1950), Nygren (1954) প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ উদ্ভিদের এবং White

(1954) প্রাণীর অ্যাপোমিক্সিস নিয়ে গবেষণা করেছেন। পলিপ্লয়েড ফার্ণ ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদে অ্যাপোমিক্সিসের প্রাচুর্য্য লক্ষণীয়। অনেকগুলি প্রচ্ছন্ন *(recessive)* জীন অ্যাপোমিক্সিসকে প্রভাবিত করে। এইসব জীনের মিলিত প্রভাবে অ্যাপোমিক্সিস পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হয়। Gustafson-এর মতে পলিপ্লয়েড স্তরে এই জীনগুলির কার্যকারিতা আরও বেশী হয়। কিছু অ্যাপোমিক্ট উদ্ভিদ সংকরণের *(hybridization)* মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। যেসব প্রজাতিতে অ্যাপোমিক্সিস হয় তাদের মায়োসিসে জটিলতা দেখা যায়। কখনও কখনও যৌন জননশীল উদ্ভিদ
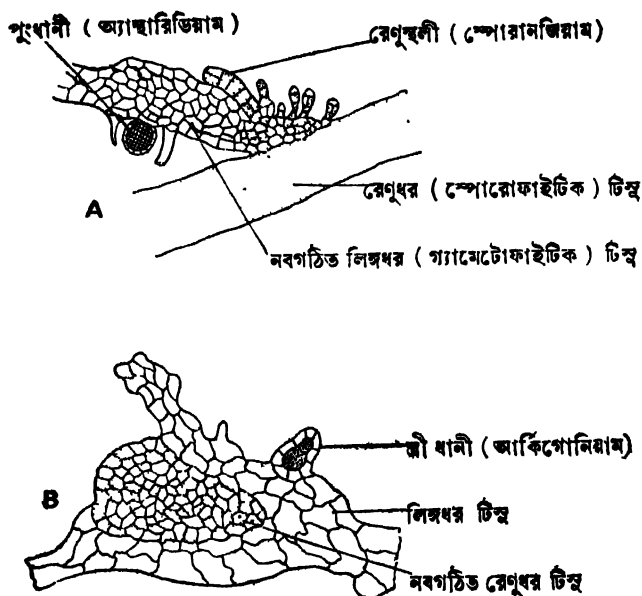
চিত্র 61

A-ফার্ণে অ্যাপোস্পোরি, রেণুধর টিস্যু থেকে সরাসরি লিঙ্গধর টিস্যু ও পুংধানীর উৎপত্তী, B-ফার্ণে অ্যাপোগ্যামি, লিঙ্গধর টিস্যু থেকে সরাসরি রেণুধর টিস্যুর উৎপত্তি

ও অ্যাপোমিক্ট উদ্ভিদ একসাথে থাকে। এই উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে অ্যাগ্যামিয় গোষ্ঠী *(agametic complex)* বলে। *Crepis, Hieracium, Anten-*

naria, Taraxacum, Rubus, Poa, Potentilla, Perthenium ইত্যাদিতে অ্যাগ্যামিয় গোষ্ঠী দেখা যায়।

অ্যাপোমিক্সিসের সুবিধা ও অসুবিধা

যৌন জননকারী উদ্ভিদের (*sexually reproducing plant*) সাথে অ্যাপোমিক্ট উদ্ভিদের তুলনা করলে অ্যাপোমিক্সিসের তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। অ্যাপোমিক্ট উদ্ভিদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নীচে দেওয়া হ'ল।

(1) অ্যাপোমিক্সিস যৌন জননের চেয়ে অনেক সহজ ও সরল হওয়ায় এই প্রক্রিয়ায় অনেক বেশী সংখ্যক জীবের সৃষ্টি হয়। কোন সবল উদ্ভিদ অ্যাপোমিক্সিসের সাহায্যে খুব দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে এবং এর ফলে ঐ একই জেনেটিক গঠন যুক্ত অনেক সবল উচ্চপ্রাণশক্তিযুক্ত উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এই উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে আইসোজীনীয় ক্লোন (*isogenic clone*) বলে। Babcock ও Stebbins-এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে উত্তর আমেরিকার *Crepis*-এর ডিপ্লয়েড যৌন জননকারী প্রজাতির তুলনায় পলিপ্লয়েড অ্যাপোমিক্টদের বিস্তার অনেক বেশী। *Taraxacum*-এর যৌন জননকারী প্রজাতি সবল অ্যাপোমিক্ট প্রজাতির সাথে প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য হয়।

(2) যেখানে প্রজাতিগুলির মধ্যে সংকরণ (*hybridization*) বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সেখানে অ্যাপোমিক্সিস হেটারোজাইগাস অবস্থাকে স্থায়ী করতে সাহায্য করে। Darlington-এর (1939) মতে অ্যাপোমিক্সিসের মাধ্যমে অনুর্বর উদ্ভিদ বা প্রাণীর জনন সম্ভবপর হয়। হিমালয়ের বেশীর ভাগ অ্যাপোমিক্ট ফার্ণই (*Pellaea sagittata, P. atropurpurea, Adiantum lunulatum, Dryopteris atrata, D. remota, D. Borreri* ইত্যাদি) ট্রিপ্লয়েড (Mehra 1961)। এর থেকে বোঝা যায় যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদকে স্থায়ী করার ক্ষেত্রে অ্যাপোমিক্সিসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

(3) অ্যাপোমিক্ট উদ্ভিদে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (*natural selection*) ফলে অসফল জীন গোষ্ঠী বাতিল হয়ে যায়।

(4) কোন কোন জীবে পারথেনোজেনেসিস সেক্স নির্ধারণ করে। মৌমাছি, পিঁপড়া, প্রভৃতিতে ডিম্বাণুটা নিষিক্ত হ'লে স্ত্রী পতঙ্গের ও পারথেনোজেনেসিস হ'লে পুরুষ পতঙ্গের সৃষ্টি হয়।

(5) অ্যাগামোস্পার্মির (*agamospermy*) মাধ্যমে সৃষ্ট জীবের প্রাণশক্তি সাধারণতঃ বেশী হয়।

(6) অ্যাপোমিক্ট জীবের অনেক সুবিধা থাকলেও এখানে বিভিন্ন জীনের নতুন সংযোগ অর্থাৎ জেনেটিক রিকমবিনেশন (*genetic recom-*

bination) হতে পারে না ব'লে এরা পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। অ্যাপোমিক্টদের জেনেটিক গঠন কোন একটা বিশেষ পরিবেশের পক্ষে উপযোগী থাকে এবং ঐ পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে এইসব জীব সাধারণতঃ বিলুপ্ত হয়।

কোন কোন উদ্ভিদে যেমন *Rubus, Poa, Potentila* ইত্যাদিতে অ্যাপোমিক্সিস ও যৌন জনন পর্যায়ক্রমে হয়। এখানে যৌন জননের ফলে রিকম্বিনেশন হয় ও অ্যাপোমিক্সিসের মাধ্যমে এরা সহজেই সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এইসব উদ্ভিদ যৌন জনন এবং অ্যাপোমিক্সিসের সব সুবিধা পায়। Clausen-এর (1954) মতে সম্পূর্ণ অ্যাপোমিক্সিস সচরাচর দেখা যায় না। অধিকাংশ উদ্ভিদেই অ্যাপোমিক্সিস আংশিক হয় এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে কোন উদ্ভিদ এক সময় যৌন উপায়ে এবং অন্য সময় অ্যাপোমিক্সিসের মাধ্যমে জনন সম্পন্ন করে।

গ্রাফটিং (*grafting*) ও কাইমিরা (*chimaera*)

মিশ্র জেনেটিক গঠনযুক্ত উদ্ভিদকে কাইমিরা বলে। এইরকম উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। গ্রাফটিং বা কলম করে *chimaera*-র সৃষ্টি করা যায়। কোন একটা গাছকে অন্য আরেকটা গাছের উপর কলম করলে প্রথমোক্ত গাছকে সীওন (*scion*) ও শেষোক্ত গাছকে স্টক
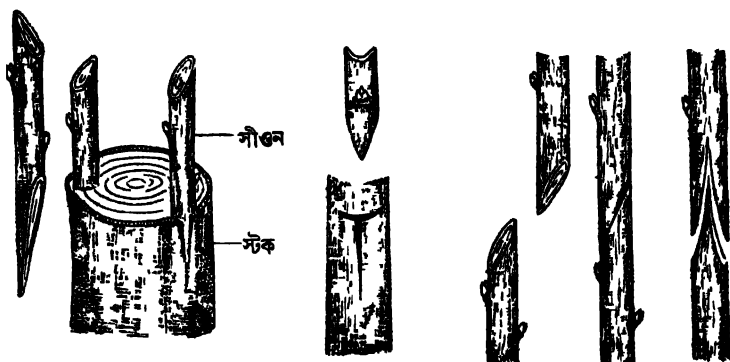
চিত্র 62
গ্রাফটিং বা কলম করার বিভিন্ন পদ্ধতি

(*stock*) বলে (চিত্র 62)। এই দুইটা উদ্ভিদের মধ্যে প্রোটপ্লাজমীয় সংযোগ স্থাপিত হয়। যেসব শাখা *stock* ও *scion* উভয় কোষ থেকে তৈরী হয়

তাদের জেনেটিক গঠন মিশ্র ধরনের হয় অর্থাৎ ঐ শাখাগুলি কাইমিরীয় ধরনের। এইসব শাখা অঙ্গজ জননের মাধ্যমে কাইমিরীয় উদ্ভিদের (চিত্র 63) সৃষ্টি করে। মিশ্র জেনেটিক গঠনের প্রাণীকে মোজাইক (*mosaic*) বলে। পতঙ্গের গাইন্যানড্রমর্ফে (*gynandromorph*) দেহের এক অংশ স্ত্রী বাকী অংশ পুরুষের মত হয়। কলম ছাড়াও অনেক সময় মিউটেশনের জন্য স্বাভাবিকভাবে কাইমিরার সৃষ্টি হয়। ক্রোমোসোমের মিউটেশনের জন্য যেসব কাইমিরার সৃষ্টি হয় তাদের ক্রোমোসোমীয় কাইমিরা বলে। যেসব কাইমিরায় দুইটার চেয়ে বেশী জেনেটিক গঠনের কোষ থাকে তাদের পলিক্লিন্যাল কাইমিরা (*polyclinal chimaera*) বলে। স্টক ও সীওনের কোষের বিন্যাসের উপর নির্ভর করে কাইমিরাকে তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছেঃ—

1. **সেকটরীয় কাইমিরা** (*sectorial chimaera*)

এখানে দুই রকমের জেনেটিক গঠনের টিস্যু দুইটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে থাকে।
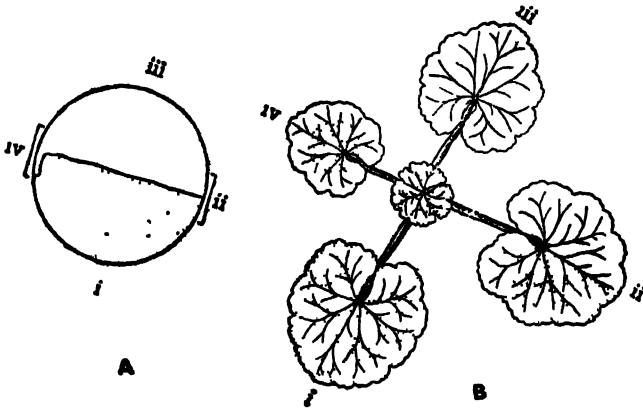
চিত্র 63
Pelargonium zonale-এ সেকটরীয় কাইমিরার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন রকমের পাতা A র i, ii, iii ও iv অংশ থেকে যথাক্রমে B-র i, ii, iii ও iv পাতার সৃষ্টি হয়েছে

টিস্যু দুইটা চিত্র 63A এবং 64a, b অনুসারে বিভিন্নভাবে সাজান থাকতে পারে।

2. পেরিক্লিন্যাল কাইমিরা (*periclinal chimaera*)

একরকমের জেনেটিক গঠনের টিস্যুকে অন্য রকমের জেনেটিক গঠনের টিস্যু সম্পূর্ণভাবে আবৃত রাখলে ঐ কাইমিরাকে *periclinal chimaera* বলে (চিত্র 64c)।
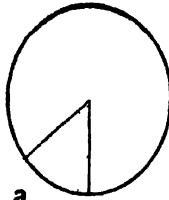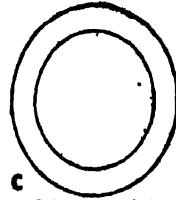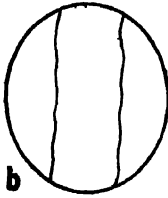
চিত্র 64
বিভিন্ন ধরণের কাইমিরা

3. **হাইপার-কাইমিরা** (*hyper-chimaera*)

এখানে স্টক ও সীওনের কোষগুলি এলোমেলোভাবে মিশে থাকে (চিত্র 64d)।

কাইমিরায় স্টক ও সীওনের কোষগুলি পাশাপাশি থাকলেও তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে। স্টক সীওনকে খাদ্য ও জল সরবরাহ করে এবং ফুলের আকার, পুষ্পোৎপাদনের সময় ও উর্বরতাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু উদ্ভিদ দুইটা পরস্পরকে জেনেটিকভাবে প্রভাবিত করে না।

অষ্টম অধ্যায়

ক্রোমোসোম (Chromosome)

গত শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের (Strasburger, Bütschli, Balbiani, Pfitzner, von Beneden, Bovari প্রভৃতি) গবেষণার ফলে ক্রোমোসোম আবিষ্কৃত হয়েছিল। Waldeyer 1888 খৃষ্টাব্দে ক্রোমোসোম শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। ক্রোমোসোম শব্দের অর্থ হ'ল বর্ণযুক্ত বস্তু। বিশেষ প্রক্রিয়ায় এদের রঞ্জিত করা যায় বলেই এই নাম। কোষ বিভাগের সময় ক্রোমোসোমগুলি যথাযথভাবে বিভক্ত হয়। অনেকবার বিভাগের পরেও ক্রোমোসোমের সব ধর্মই অপরিবর্তিত থাকে। *Drosophila*-র উপর Morgan-এর গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে ক্রোমোসোমই হ'ল বংশধারার বাহক।

যে কোন জীবের প্রত্যেক দেহ কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা একই থাকে তবে কখনও কখনও এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যাকে সোমাটিক (*somatic* ; *soma* = দেহ) সংখ্যা বলা হয়। সাধারণতঃ দেহ কোষে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যেক ক্রোমোসোমের একটা জোড়া থাকে। এইরকমের কোষকে ডিপ্লয়েড (2n) কোষ বলে। জনন কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা দেহ কোষের সংখ্যার অর্ধেক হয় অর্থাৎ জনন কোষ হ'ল হ্যাপ্লয়েড (n)। পেঁয়াজের (*Allium cepa*) পরাগরেণু (*pollen*) ও ডিম্বাণুর (*egg*) ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল আট ও এর দেহ কোষে ষোলটা ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। বিভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ কোষে ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোসোম সংখ্যা দেখা যায়, যেমন—ভুট্টার (*Zea mays*) ক্রোমোসোম সংখ্যা $2n = 20$, গম (*Triticum aestivum*)-এ $2n = 42$, *Trillium*-এ $2n = 10$, *Tradescantia*-এ $2n = 12$, 6 (চিত্র 65a) *Punica granatum*-এ $2n = 16$ (চিত্র 65b), *Pterotheca falconeri*-তে $2n = 6$ (চিত্র 65c), *Datura*-এ $2n = 12$, *Drosophila melanogaster*-এ $2n = 8$ (চিত্র 66) এবং মানুষে $2n = 46$ ইত্যাদি। সবচেয়ে কম ক্রোমোসোম সংখ্যা পাওয়া যায় *Ascaris megalocephala* নামের প্রাণীতে, এদের ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল $n = 1$। উদ্ভিদ *Haplopappus gracilis*-এর হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল $n = 2$। আবার কোন কোন জীবের একটা কোষে হাজারের চেয়ে বেশী ক্রোমোসোম দেখা যায়। *Ophioglossum petiolatum*-এর হ্যাপ্লয়েড সংখ্যা 510। এছাড়া অন্য অনেক ফার্ণেও খুব বেশী ক্রোমোসোম সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে।
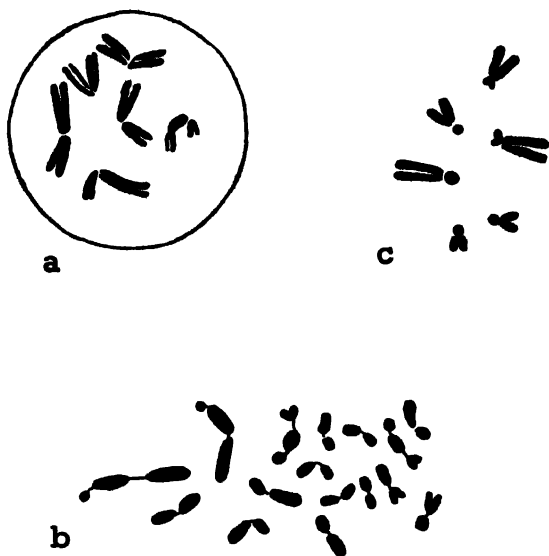
চিত্র 65

a—*Tradescantia paludosa*-এ প্রথম মেটাফেজে n = 6টা ক্রোমোসোম, b—*Punica granatum*-এ মেটাফেজে 2n = 16টা ক্রোমোসোম, c—*Pterotheca falconeri*-তে মেটাফেজে 2n = 6টা ক্রোমোসোম

কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর একটা নিউক্লীয়াসে যেসব বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোম থাকে তাদের একসাথে ক্রোমোসোম কমপ্লিমেন্ট (*chromosome complement*) বা ক্রোমোসোম সমষ্টি বলে। সবচেয়ে সাধারণ ক্রোমোসোম কমপ্লিমেন্টে বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোম প্রত্যেকটা একটা করে থাকে অর্থাৎ এখানে ঐ জীবের ভিন্ন ভিন্ন জীনের কেবল একটা সম্পূর্ণ সেট (*set*) থাকে। এইরকমের ক্রোমোসোম কমপ্লিমেন্টকে জীনোম (*genome*) বলে। উদ্ভিদে প্রাচীন (*primitive*) ধরনের জীনোমে সাতটা ক্রোমোসোম থাকে।

যে প্রাথমিক ক্রোমোসোম সংখ্যা থেকে কোন একটা পলিপ্লয়েড প্রাণী বা উদ্ভিদ তৈরী হয়েছে সেই সংখ্যাকে *basic number* বা মূল সংখ্যা (x) বলে। গমের বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল n = 7, 14, 21 ইত্যাদি। অতএব গমের মূল বা বেসিক সংখ্যা হ'ল 7। 2n = 28, 42 ক্রোমোসোমযুক্ত গমের প্রজাতি দুইটা যথাক্রমে টেট্রাপ্লয়েড (4n) ও হেক্সাপ্লয়েড (6n)।
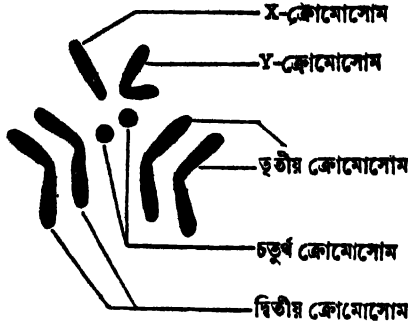
চিত্র 66
Drosophila melanogaster-এ 2n = 8টা ক্রোমোসোম

ক্রোমোসোমের গঠন

ক্রোমোসোমে সর্পিলভাবে পেঁচান লম্বা সূক্ষ্ম সূত্র অর্থাৎ ক্রোমোনিমা (*chromonema, Pl. chromonemata*) থাকে। ক্রোমোনিমার চারিদিকে ম্যাট্রিক্স থাকে (চিত্র 67)। Darlington, Ris ও অন্যান্য কিছু বিজ্ঞানীরা ম্যাট্রিক্সের উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু
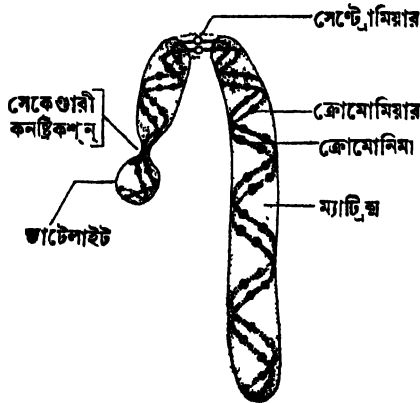
চিত্র 67
ক্রোমোসোমের গঠন

বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ম্যাট্রিক্সের উপস্থিতিকে সমর্থন করে। ইন্টারফেজে ম্যাট্রিক্সটা সংগঠিত থাকে না। প্রফেজের প্রথম দিকে এটা খুব হালকা রঙ নেয় কিন্তু প্রফেজের শেষ দিকে কিম্বা মেটাফেজে ম্যাট্রিক্সটা ঘনীভূত (*condensed*) অবস্থায় থাকে ও গাঢ় রঙ নেয়। ম্যাট্রিক্সের বাইরের দিকে একটা আবরণ থাকে ও এই আবরণকে সীদ (*sheath*) বলে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন গবেষণা কিন্তু সীদের উপস্থিতি সমর্থন করে না। কোষ বিভাগের সময় ম্যাট্রিক্স ক্রোমোনিমাকে সীমানার মধ্যে রাখে ও কোষ বিভাগ যথাযথভাবে হ'তে সাহায্য করে। ম্যাট্রিক্সে কোন জীন থাকে না, জীনগুলি ক্রোমোনিমায় থাকে। ম্যাট্রিক্স জীনগুলির চারিদিকে একটা আবরণ সৃষ্টি করে ও জীনগুলিকে রক্ষা করে। ফালগেন বর্ণ (*Feulgen stain*) দিয়ে ম্যাট্রিক্সটা রঙ করা যায়। Mc Clintock-এর (1934) মতে নিউক্লীওলাস ম্যাট্রিক্স গঠনকারী পদার্থ সরবরাহ করে। নিউক্লীওলাস যত ছোট হয় ম্যাট্রিক্স ততই পূর্ণতা লাভ করে টেলোফেজে নিউক্লীয়লাসটা ম্যাট্রিক্সীয় পদার্থ থেকেই সেকেণ্ডারী কনষ্ট্রিকশনের প্রভাবে পুনর্গঠিত হয়। প্রফেজে ক্রোমোসোমগুলি লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়। ক্রোমোসোমের এই লম্বালম্বি অর্ধাংশকে ক্রোমাটিড (*chromatid*) বলে। একটা ক্রোমোসোমে এক বা একাধিক ক্রোমোনিমাটা থাকে। প্রতি ক্রোমোসোমে ক্রোমোনিমাটার সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে অ্যানাফেজে প্রত্যেক ক্রোমোসোমে অন্ততঃ 2টা ক্রোমোনিমা থাকে। Trosko ও Wolff (1964) মনে করেন যে প্রত্যেক ক্রোমোসোমে চারটা ক্রোমোনিমাটা থাকে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে একটা ক্রোমোসোমে অনেকগুলি সূত্র (128 বা 256) দেখা গিয়েছে। *Tradescantia*-র লেপ্টোটিন অবস্থায় প্রত্যেক ক্রোমোসোমে কতকগুলি সূত্র দেখা গিয়েছে। এই সূত্রগুলিকে মাইক্রো-ফাইব্রিল (*micro-fibril*) বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে মাইক্রো-ফাইব্রিল আবার বিভক্ত হয়ে দুইটা সাব-ফাইব্রিল (*sub-fibril*) গঠন করে। এদের ব্যাস 24—40Å। Swanson (1947), La Cour ও Rautishauser (1954), Crouse (1954), Sax ও King (1955) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা ক্রোমোসোমের বহুসূত্র প্রকৃতি সমর্থন করেছেন। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়েছে যে প্রত্যেক ক্রোমোনিমায় অনেকগুলি মাইক্রো-ফাইব্রিল থাকে ও এদের ব্যাস মোটামুটি 60Å। মাইক্রো-ফাইব্রিলের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে, তবে মনে করা হয় যে প্রতি সূত্রে 64টার চেয়ে বেশী মাইক্রো-ফাইব্রিল থাকে। ইন্টাফেজে প্রত্যেক ক্রোমোসোমে অন্ততঃ দুইটা গোছা (*bundle*) মাইক্রো-ফাইব্রিল থাকে। পরাগরেণুকে (*pollen*

grain) ইন্টারফেজ অবস্থায় রঞ্জনরশ্মি (*x-ray*) প্রয়োগ করলে ক্রোমোসোম-গুলিকে অখণ্ডিত মনে হয় কিন্তু প্রফেজে ক্রোমোসোমগুলিকে দ্বিখণ্ডিত দেখায় (Sax 1941)। Huskin-এর (1947) মতে বহুসূত্রযুক্ত ক্রোমোসোম দ্বি-সূত্রযুক্ত ক্রোমোসোমের মত আচরণ করে কারণ কোষ বিভাগের সময় ক্রোমাটিডই হল ক্রোমোসোমের কার্যকরী একক।

1875 খৃষ্টাব্দে Balbiani দেখেছিলেন যে ক্রোমোনিমাটা পুঁতির মালার মত। এই পুঁতির মত অংশকে ক্রোমোমিয়ার বলে। স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোমে ও ল্যাম্পব্রাস (*lampbrush*) ক্রোমোসোমে ক্রোমোমিয়ার-গুলিকে ভালভাবে দেখা যায়। Ris-এর (1945) মতে ক্রোমোনিমার পেঁচগুলি যেখানে খুব পাশাপাশি থাকে সেখানে ক্রোমোমিয়ার দেখা যায় কারণ যদি একটা ক্রোমোনিমাকে টানা যায় তাহলে ক্রোমোমিয়ারগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। Kufmann-এর (1948) মতে ক্রোমোমিয়ার অংশে নিউক্লীক অ্যাসিড বা নিউক্লীওপ্রোটীন প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। Belling (1928) বলেছিলেন যে এই ক্রোমোমিয়ার অংশেই জীনগুলি অবস্থিত। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে যে কোন কোন জীন ক্রোমোমিয়ার অংশে থাকে আবার অন্যান্য জীন অক্রোমোমিয়ারীয় অংশে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক ক্রোমোসোমের একটা বিশেষ স্থান সঙ্কুচিত (প্রাথমিক সঙ্কুচিত স্থান বা *primary constriction*) ও বর্ণহীন থাকে। এই স্থানকে সেন্ট্রোমিয়ার (*centromere*) বা কাইনেটোকোর (*kinetochore*) বা কাইনোমিয়ার (*kinomere*) বলা হয়। সেন্ট্রোমিয়ারের দুই দিকে ক্রোমো-সোমের অংশকে বাহু বা *arm* বলে। সেন্ট্রোমিয়ারই কোষ বিভাগের সময় স্পিণ্ডলে ক্রোমোসোমের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে কারণ স্পিণ্ডল তন্তুর সাথে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলটাই যুক্ত থাকে। ভুট্টার প্যাকিটিন অবস্থায় সেন্ট্রোমিয়ার বর্ণহীন ও ডিম্বাকৃতির দেখায় এবং সেন্ট্রোমিয়ারটা ক্রোমোসোমের অন্যান্য অংশ থেকে বেশী চওড়া থাকে (Mc Clintock 1939) (চিত্র 68)। Darlington-এর (1965) মতে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে কতকগুলি একই রকম জীন থাকে।

Tradescantia-এ মায়োসিস বিভাগের মেটাফেজে ও অ্যানাফেজের প্রারম্ভে সেন্ট্রোমিয়ারে কতকগুলি ক্রোমাটিন দানা (*chromatin granules*) ও সংযোগকারী সূত্র দেখা যায়। Tjio ও Levan (1950) উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর সেন্ট্রোমিয়ারের গঠন বর্ণনা করেছেন। মেটাফেজে সেন্ট্রোমিয়ারের গঠন (চিত্র 69) হ'ল— (*a*) চারটা অনুরূপ অর্থাৎ একই রকম ক্রোমোমিয়ার, (*b*) প্রত্যেক ক্রোমাটিডের ক্রোমোমিয়ার দুইটার মধ্যের সংযোগকারী সূত্র, (*c*) ক্রোমোমিয়ার ও ক্রোমোসোমের বাহুর মধ্যে
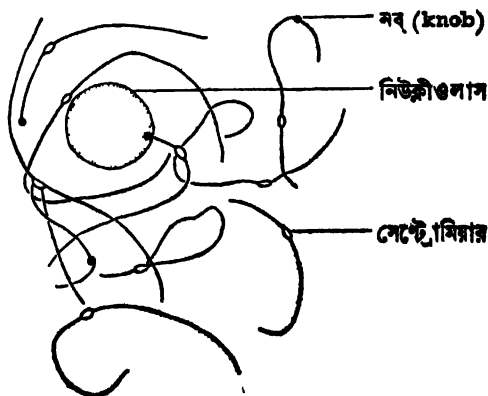
চিত্র 68

ভুট্টার প্যাকিটিন অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি ও নিউক্লীওলাস দেখা যাচ্ছে

সংযোগকারী সূত্র। Lima-de-Faria (1958) বলেন যে দুইটা ক্রোমোমিয়ারের মধ্যের সংযোগকারী সূত্রে ও ক্রোমোমিয়ার ও ক্রোমোসোমের বাহুর মধ্যে সংযোগকারী সূত্রে ছোট ছোট ক্রোমোমিয়ার থাকে। 1966 খৃষ্টাব্দে Gall বলেন যে বড় ক্রোমোমিয়ারগুলি দুই বা ততোধিক ক্রোমোমিয়ারের সংযোগে তৈরী। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল থেকে এক গুচ্ছ (*bundle*) মাইক্রোটিউবিউল (*microtubule*) বা ক্ষুদ্রনল উৎপন্ন হয় ও ক্রোমোসোমকে স্পিণ্ডলের সাথে যুক্ত রাখে। সুতরাং সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে প্রত্যেক ক্রোমাটিডে কতকগুলি ছোট ছোট ক্রোমোমিয়ার এক বা একাধিক সূত্র
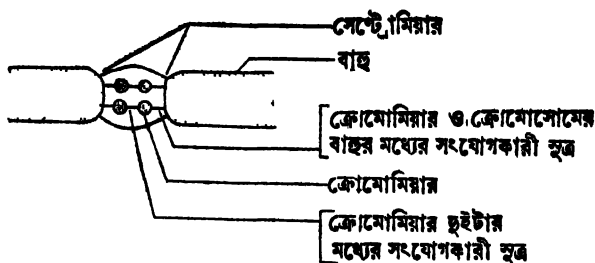
চিত্র 69

সেন্ট্রোমিয়ারের গঠন (ক্রোমাটিড দেখান হয় নাই)

দিয়ে যুক্ত থাকে। এই সূত্রগুলি থেকে মাইক্রোটিউবিউলগুলি বের হয় ও লুপ (*loop*) বা ফাঁস গঠন করে।

মেটাফেজ ও অ্যানাফেজের ক্রোমোসোমের আকৃতি সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোসোমের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

(1) সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোসোমের মাঝামাঝি থাকলে ঐ ক্রোমোসোমকে মেটাসেন্ট্রিক (*metacentric*) বা মধ্যবর্তী সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। এদের বাহু দুইটা সমান বা মোটামুটি সমান হয়। অ্যানাফেজে এইরকমের ক্রোমোসোম 'V'-আকৃতির দেখায় (চিত্র 70)।
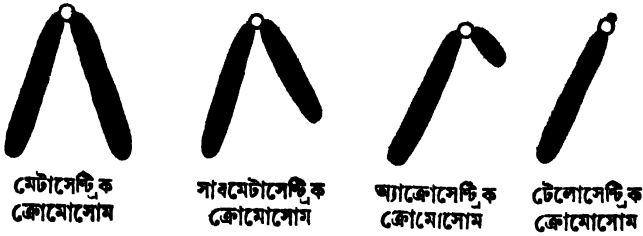
চিত্র 70
বিভিন্ন ধরণের ক্রোমোসোম

(2) সেণ্ট্রোমিয়ারটা ঠিক মাঝামাঝি না থেকে একটু পাশের দিকে থাকলে ঐ ক্রোমোসোমকে সাবমেটাসেণ্ট্রিক (*submetacentric*) ক্রোমোসোম বলে (চিত্র 70)। অ্যানাফেজে এই ধরনের ক্রোমোসোম 'L'-আকৃতির দেখায়।

(3) সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোসোমের প্রান্তের দিকে থাকলে ঐ ক্রোমোসোমকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (*acrocentric*) বা উপপ্রান্তীয় সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। অ্যানাফেজে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম 'J'-আকৃতির দেখায় (চিত্র 70)।

(4) ক্রোমোসোমের প্রান্তে যদি সেন্ট্রোমিয়ারটা থাকে তবে ঐ ক্রোমোসোমকে টেলোসেন্ট্রিক (*telocentric*) বা প্রান্তীয় সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। অ্যানাফেজে এই ক্রোমোসোম I-আকৃতির বা দণ্ডাকৃতির (*rod*) হয় (চিত্র 70)। সত্যিকারের টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম সচরাচর দেখা যায় না। প্রায় সব ক্ষেত্রেই সেন্ট্রোমিয়ারের অপর প্রান্তে একটা খুব ছোট বাহু থাকে।

যেসব ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না তাদের সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন বা অ্যাসেন্ট্রিক (*acentric*) ক্রোমোসোম বলে। এইসব ক্রোমোসোম সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।

সাধারণতঃ প্রত্যেক ক্রোমোসোমে কেবল একটা সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। কিন্তু কিছু উদ্ভিদে (যেমন গম) দুইটা সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম দেখা গিয়েছে। এইসব ক্রোমোসোমকে ডাইসেন্ট্রিক (*dicentric*) বা দ্বিসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। কোষ বিভাগের সময় ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম যে কোন একটা মেরুতে যেতে পারে কিম্বা 'ক্রোমোসোম সেতু' (*bridge*) গঠন করে। ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম সচরাচর দেখা যায় না। যেসব ক্রোমোসোমে দুইটার চেয়ে বেশী সেন্ট্রোমিয়ার থাকে তাদের পলিসেন্ট্রিক (*polycentric*) বা বহু সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। প্রাণীতে *Ascaris megalocephala*-এ, ও *Parascaris equorum*-এ পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম পাওয়া গিয়েছে।

সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা যাই হোক না কেন, কোন একটা ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান সাধারণতঃ নির্দিষ্ট থাকে। ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট স্থানে সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে তাদের লোকালাইজড (*localized*) বা স্থানিক সেন্ট্রোমিয়ার বলে। বেশীর ভাগ উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে লোকালাইজড সেন্ট্রোমিয়ার দেখা যায়। কিন্তু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীতে সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোসোমের সব অংশে ছড়ান থাকে। এই ধরনের সেন্ট্রোমিয়ারকে ডিফিউসড (*diffused*) বা পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার বলা হয়। *Juncaceae* গোত্রের উদ্ভিদ *Luzula perpurea*-তে বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ (Ostergren 1949, Brown 1954 এবং Malheiros, de Castro ও Camara 1974) ডিফিউসড সেন্ট্রোমিয়ার দেখেছিলেন। কিছু ছত্রাকে (Vaarama 1954), শৈবালে ও মসে ডিফিউসড সেন্ট্রোমিয়ার দেখা গিয়েছে। Ris (1970) *Philanthus*-এর পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোমে মাইক্রোটিউবিউল দেখতে পেয়েছিলেন।

Luzula-র সেন্ট্রোমিয়ার যে ডিফিউসড (*diffused*) বা পরিব্যাপ্ত ধরনের তার প্রমাণ বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে পাওয়া যায়।

(1) রঞ্জনরশ্মি (*x-ray*) প্রয়োগ করলে *Luzula*-র ক্রোমোসোম কয়েকটা অংশে ভেঙ্গে যায়। প্রত্যেকটা অংশ একটা স্বাধীন ক্রোমোসোমের মত আচরণ করে। সেন্ট্রোমিয়ারটা পরিব্যাপ্ত ধরনের হলেই কেবল এটা সম্ভব কারণ সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অর্থাৎ অ্যাসেন্ট্রিক (*acentric*) ক্রোমোসোম স্থায়ী হয় না।

(2) ক্রোমোসোমের খণ্ডিত হওয়া অর্থাৎ ফ্র্যাগমেন্টেশনের (*frag-*

mentation) সাথে *Luzula*-র প্রজাতির বিবর্তন জড়িত। *L. perpurea*-র ক্রোমোসোম সংখ্যা 2n = 6 কিন্তু উন্নত প্রজাতিগুলির ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল 2n = 12, 24, 48 ও 96 ইত্যাদি। দেখা গিয়েছে যে, *L. perpurea*-র ও বেশী ক্রোমোসোমযুক্ত উন্নত প্রজাতিগুলির ক্রোমাটিনের পরিমাণ সমান। কিন্তু যদি এইসব প্রজাতিগুলি পলিপ্লয়েড হ'ত তা হ'ল এদের ক্রোমাটিনের পরিমাণ *L. perpurea* তুলনায় বেশী হ'ত। সব প্রজাতিগুলির ক্রোমাটিনের পরিমাণ সমান হওয়া থেকে বোঝা যায় যে ফ্র্যাগমেন্টেশনের মাধ্যমেই *Luzula*-য় ক্রোমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(3) 2n = 6টা ক্রোমোসোমযুক্ত *L. perpurea*-র সাথে 2n = 12টা ক্রোমোসোমযুক্ত উন্নত প্রজাতির *Luzula*-র সংকরণ করলে *L. perpurea*-র প্রত্যেকটা ক্রোমোসোমের সাথে অন্য প্রজাতির দুইটা ক্রোমোসোমের যুগ্মতা হয় এবং এর ফলে ট্রাইভ্যালেণ্ট (*trivalent*) গঠিত হয়। উন্নত প্রজাতিটা ফ্র্যাগমেন্টেশনের মাধ্যমে সৃষ্টি হলেই কেবল এটা সম্ভব।

(4) কোষ বিভাগের সময় ডিফিউসড বা পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোম স্পিণ্ডিল তন্তুর সাথে তাদের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধরে আটকে থাকে। এই ক্রোমোসোমগুলি সোজা থাকে ও মেরুর দিকে সমান্তরালভাবে
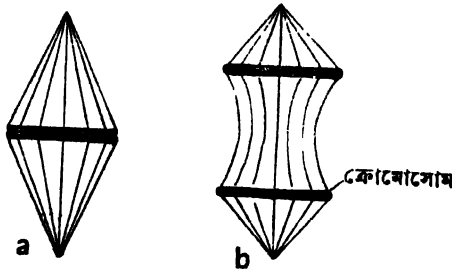
চিত্র 71

স্পিণ্ডিলে পরিব্যাপ্ত বা ডিফিউসড ক্রোমোসোমের আচরণ,
a—মাইটোটিক বিভাগের মেটাফেজ,
b—মাইটোটিক বিভাগের অ্যানাফেজে পরিব্যাপ্ত ক্রোমোসোমের সমান্তরাল পৃথকীকরণ

অগ্রসর হয় (চিত্র 71a, 71b)। সেন্ট্রোমিয়ারটা ক্রোমোসোমের সব অংশে ছড়ান থাকায় বাহু দুইটা আলাদাভাবে বোঝা যায় না। *Luzula*-এ ক্রোমোসোমের এরকম আচরণ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

Vaarama-র মতে ডিফিউসড বা পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার হ'ল প্রাচীন এবং এর থেকেই পরে লোকালাইজড (*localized*) বা স্থানিক সেন্ট্রোমিয়ারের সৃষ্টি হয়েছে।

ক্রোমোসোমের বিবর্তনে ডিফিউসড বা পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার একটা ধাপ নির্দেশ করে। ক্রোমোসোমের বিবর্তনে প্রধান ধাপগুলি হ'ল—

(*a*) মিক্সোফাইসী (*Myxophyceae*) বা নীলাভ সবুজ শৈবালে (*blue-green algae*) কোন সুগঠিত নিউক্লীয়াস থাকে না। নিউক্লীয়াসের জায়গায় 'সেন্ট্রাল বডি' (*central body*) থাকে। জেনেটিক পদার্থ সেন্ট্রাল বডিতে ছড়ান থাকে। সুতরাং বিবর্তনের প্রথম দিকে জীনগুলি পরিব্যাপ্ত ছিল।

(*b*) কোন কোন শৈবালে (*Conjugales*) ও প্রাচীন ধরনের উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে ডিফিউসড সেন্ট্রোমিয়ার পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে যদিও জীনগুলি ক্রোমোসোমে অবস্থিত, কিন্তু এখানে সেন্ট্রোমিয়ার নির্দিষ্ট স্থানে থাকে না।

(*c*) বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে দেখা যায় কিছু উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান নির্দিষ্ট হ'লেও একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। *Fritillaria* ও *Trillium*-এ একাধিক সেকেন্ডারী কনষ্ট্রিকশন (*secondary constriction*) ও হেটারোক্রোমাটিন (*heterochromatin*) দেখা যায়।

(*d*) পরবর্তী ধাপে দেখা যায় যে বেশীর ভাগ উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্রোমোসোমে একটা সেন্ট্রোমিয়ার, একটা সেকেন্ডারী কনষ্ট্রিকশন অঞ্চল থাকে।

Darlington 1940 খৃষ্টাব্দে সেন্ট্রোমিয়ার বা কাইনেটোকোরের (*kinetochore*) ভ্রান্ত বিভাগ (*mis-division*) বর্ণনা করেন। তিনি দেখেন যে কখনও কখনও সেন্ট্রোমিয়ারটা লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত না হয়ে পাশাপাশি বিভক্ত হয় (চিত্র 72)। সেন্ট্রোমিয়ারের এইরকমের বিভাগকে *mis-division* বা ভ্রান্ত বিভাগ বা অপবিভাগ বলে। এই ধরনের বিভাগের ফলে ক্রোমোসোমের একটা বাহুর দুইটা ক্রোমাটিড ও সেন্ট্রোমিয়ারের অর্ধেকটা নিয়ে একটা ক্রোমোসোম ও অন্য বাহুর দুইটা ক্রোমাটিড ও সেন্ট্রোমিয়ারের বাকী অর্ধেকটা নিয়ে আরেকটা ক্রোমোসোম গঠিত হয়। এই টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম স্থায়ী হয় কিম্বা আইসো-ক্রোমোসোম (*iso-chromosome*) গঠন করে (চিত্র 72)। আইসো-ক্রোমোসোমের দুইটা বাহুর আকৃতি ও প্রকৃতি একই হয়। রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করলে কখনও কখনও সেন্ট্রোমিয়ারের ভ্রান্তবিভাগ হয়।

কোন কোন ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার ছাড়া আরও একটা বর্ণহীন সংকুচিত স্থান দেখা যায়। এই স্থানকে সেকেন্ডারী কনষ্ট্রিকশন (*secondary constriction*) বলে (Heitz 1931)। সেকেন্ডারী কনষ্ট্রিকশন অঞ্চল ক্রোমোসোমের অন্য স্থানের সমান স্থূল কিন্তু এই স্থানটা দুর্বল হয়। ইন্টারফেজ ও প্রফেজে সেকেন্ডারী কনষ্ট্রিকশন নিউক্লীওলাসের সাথে যুক্ত থাকে। এই স্থানকে নিউক্লীওলাস গঠনকারী অঞ্চলও (*nucleolar organizer*) বলে। প্রফেজের শেষ দিকে নিউক্লীওলাস ক্রমশঃ অদৃশ্য হলে ক্রোমোসোমের যে স্থানে নিউক্লীওলাসটা যুক্ত ছিল সে স্থানটা সেকেন্ডারী কনষ্ট্রিকশন হিসাবে দেখা দেয়। টেলোফেজে নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের ঐ

চিত্র 72
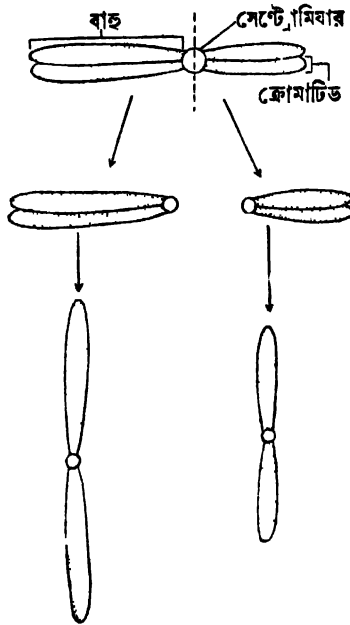
সেন্ট্রোমিয়ারের ভ্রান্তবিভাগ (*misdivision*), সেন্ট্রোমিয়ারের পাশাপাশি বিভাগের ফলে আইসো ক্রোমোসোম গঠিত হয়েছে

জায়গাতেই নিউক্লীওলাসটা পুনর্গঠিত হয়। যখন ক্রোমোসোমের প্রায় একপ্রান্তে সেকেন্ডারী কনষ্ট্রিকশন থাকে তখন ক্রোমোসোমের প্রান্তের যে ছোট

অংশটা মূল ক্রোমোসোমের সাথে ক্রোমাটিন সূত্র দিয়ে যুক্ত থাকে সেই অংশকে স্যাটেলাইট (*satellite*) বলে। যেসব ক্রোমোসোমে স্যাটেলাইট থাকে তাদের SAT ক্রোমোসোম বা স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোসোম বলে। ভুট্টার ষষ্ঠ ক্রোমোসোমে প্যাকিটিন অবস্থায় SAT ক্রোমোসোম ভালভাবে দেখা যায়। এছাড়া *Crinum, Aralia, Lagerstroemia* ও অন্যান্য অনেক উদ্ভিদে স্যাটালাইটযুক্ত ক্রোমোসোমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

Kaufmann 1948 খৃষ্টাব্দে বলেন যে নিউক্লীওলাস গঠনের সাথে জড়িত নয় এমন সেকেন্ডারী কনষ্ট্রিকশনও বিভিন্ন জীবে দেখা যায়। এই-সব অঞ্চল ক্রোমোসোমের কুন্ডলীকরণের (*coiling*) তারতম্য, নিউক্লীক অ্যাসিডের পরিমাণের পার্থক্য কিম্বা দুর্বলতার জন্য হয়ে থাকে।

Darlington ও La Cour-এর (1938, 1940) মতে খুব কম তাপমাত্রার ক্রোমোসোমে সেকেন্ডারী কনষ্ট্রিকশন দেখা দিতে পারে। তাঁদের মতে ক্রোমোসোমের এইসব অংশ হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরী। কম তাপ-মাত্রায় এরা যথাযথভাবে নিউক্লীক অ্যাসিড সৃষ্টি করতে পারে না ও হালকা রঙ নেয়।

প্রত্যেক ক্রোমোসোমের প্রান্তে টেলোমিয়ার (*telomere*) থাকে। Muller 1938 খৃষ্টাব্দে টেলোমিয়ার শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। টোলোমিয়ারের কতকগুলি বিশেষ চরিত্র আছে। কোন ক্রোমোসোম ভেঙ্গে গেলে ভগ্ন প্রান্তটা আরেকটা ভগ্ন প্রান্তের সাথে জোড়া লাগতে পারে কিন্তু কখনও টেলোমিয়ারযুক্ত প্রান্তের সাথে জোড়া লাগে না। একটা টেলোমিয়ার কখনও আরেকটা টেলোমিয়ারের সাথে যুক্ত হয় না। কোন ক্রোমোসোমের প্রান্তের টেলোমিয়ার অংশ নষ্ট হয়ে গেলে ঐ ক্রোমোসোমটা অস্থায়ী হয়।

ক্রোমোসোমের আয়তন

একবীজপত্রী (*monocot*) উদ্ভিদের ক্রোমোসোমগুলি সাধারণতঃ দীর্ঘ (চিত্র 135, 136) এবং দ্বিবীজপত্রী (*dicot*) উদ্ভিদের ক্রোমোসোমগুলি তুলনামূলকভাবে ছোট হয়। *Polyscias*-এর (*Araliaceae*) ক্রোমো-সোমগুলির দৈর্ঘ্য **1.2—2.95 μ** (চিত্র 73) (Guha, unpublished)। *Trillium*-এ 30 μ পর্যন্ত দীর্ঘ ক্রোমোসোম পাওয়া গিয়েছে। *Allium, Lillium, Tradescantia*-র ক্রোমোসোম 10—20 μ পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। *Liliaceae* ও *Amaryllidaceae* গোত্রের অধিকাংশ উদ্ভিদের ক্রোমোসোমগুলি বেশ লম্বা। বেশীরভাগ ছত্রাকের ক্রোমোসোম খুব ছোট। প্রাণীতে ফড়িং, ঝিঁঝিপোকা ইত্যাদিতে দীর্ঘ ক্রোমোসোম দেখা গিয়েছে। কোন কোন পাখীর ক্রোমোসোম

বেশ ছোট। মানুষের ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 4—6 μ। বিভিন্ন জীবের ক্রোমোসোমের মোটামুটি দৈর্ঘ্য 0.2—50 μ ও স্থূলতা 0.2—2 μ হয়। সাধারণতঃ একটা কোষের বিভিন্ন ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্যের মধ্যে বেশী
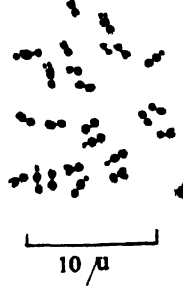
চিত্র 73

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ *Polyscias*-এর দেহ কোষে $2n = 24$ ক্রোমোসোম

পার্থক্য দেখা যায় না। সবচেয়ে ছোট ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড় ক্রোমোসোমের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ হয়। কিন্তু *Agavaceae*-তে বিভিন্ন ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্যের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। এখানে ডিপ্লয়েড কোষে 50টা খুব ছোট ও 10টা বেশ বড় ক্রোমোসোম (চিত্র 74) থাকে।
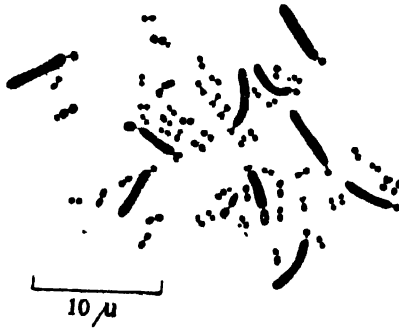
চিত্র 74

Agavaceae গোত্রের উদ্ভিদ *Furcraea watsoniana* ($2n = 60$) ক্রোমোসোমের আয়তনের পার্থক্য (Guha, unpublished)

বিশেষ ধরনের ক্রোমোসোম

স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের (*salivary gland*) ক্রোমোসোম

Balbiani 1881 খৃষ্টাব্দে দ্বিপক্ষযুক্ত (*diptera*) পতঙ্গের লালা গ্রন্থির বা স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের কোষে খুব বড় ক্রোমোসোম দেখতে পান। তবে এইসব ক্রোমাসোমের তাৎপর্য তখন ভাল করে বোঝা যায় নাই। অনেক পরে ত্রিশের দশকে Kostoff (1930), Painter (1933, 1934), Heitz ও Bauer (1933) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই ক্রোমোসোমের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোম (চিত্র 75) সাধারণ কোষের ক্রোমোসোমের চেয়ে 50—200 গুণ বড় হয়। ড্রসোফিলার দেহ কোষে মেটাফেজ অবস্থায় সব ক্রোমোসোমগুলির মোট দৈর্ঘ্য 7.5 μ হয়, কিন্তু স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোমগুলির মোট দৈর্ঘ্য 1,180—2,000 μ। স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ছাড়া চর্বি কোষে, মালপিঘীয় নলে (*malpighian tube*), গর্ভাশয়ের ধাত্রী কোষে (*nurse cell*), অন্ত্রের (*rectal*) এপিথিলিয়্যাল কোষে (*epithelial cell*) বড় ক্রোমোসোম দেখা যায়। তবে এসব জায়গার ক্রোমোসোম স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোমের মত অত বড় হয় না।

স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের প্রতি ক্রোমোসোম যুগ্ম অবস্থানকারী দুইটা হোমোলোগাস (সমসংস্থ) ক্রোমোসোমের সমন্বয়ে তৈরী। স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের প্রত্যেক ক্রোমোসোমে পর্যায়ক্রমে গাঢ় বর্ণযুক্ত ও বর্ণহীন বা হালকা বর্ণের অংশ থাকে। এই গাঢ় বর্ণযুক্ত অংশগুলিকে ব্যাণ্ড (*band*) ও বর্ণহীন অংশগুলিকে ইন্টারব্যাণ্ড (*interband*) বা ব্যাণ্ড মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে। ব্যাণ্ড অঞ্চলগুলি অতি বেগুনী রশ্মি (*ultra violet ray*) শোষণ করে ও ফালগেন (*feulgen*) দিয়ে রঙ করা যায়। কিন্তু ইন্টারব্যাণ্ড অঞ্চল অতি বেগুনী রশ্মি শোষণ করে না ও ফালগেন রঙ নেয় না। বিভিন্ন ব্যাণ্ডের আকার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয় (চিত্র 76)। কোন কোন ব্যাণ্ড চওড়া আবার কোনটা বা সরু। চওড়া ব্যাণ্ডগুলির গঠন জটিল ও এগুলি কয়েকটা সরু ব্যাণ্ড দিয়ে তৈরী। এইসব ব্যাণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল খুব ছোট থাকে। অনেক সময় একই ব্যাণ্ড পরপর দুবার থাকে, এদের ডাবলেট (*doublet*) বা ক্যাপসিউল (*capsule*) বলে। একটা ব্যাণ্ডের ক্রোমোমিয়ার পরের ব্যাণ্ডের ক্রোমোমিয়ারের সাথে সূক্ষ্ম ক্রোমোনিমা সূত্র দিয়ে যুক্ত থাকে। ব্যাণ্ড অংশের চেয়ে ইন্টারব্যাণ্ড অঞ্চল অনেক বেশী স্থিতিস্থাপক (*elastic*)। *Drosophila*-র সবচেয়ে লম্বা ক্রোমোসোমে
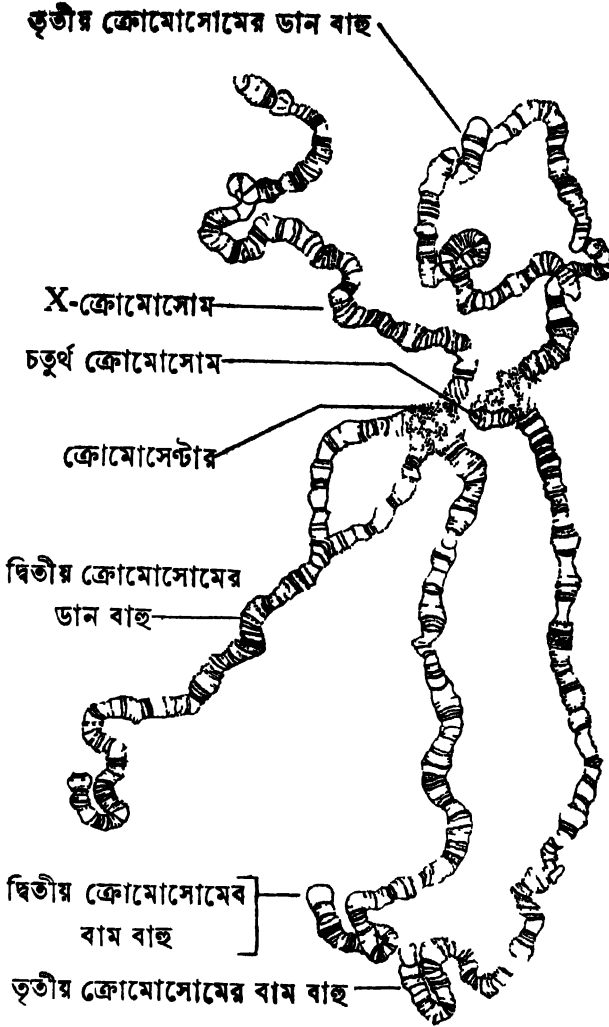
চিত্র 75

Drosophila-র স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোম

2000-এর চেয়ে বেশী ব্যান্ড দেখা যায়। কোন ক্রোমোসোমে ব্যাণ্ডের বিন্যাস অপরিবর্তিত থাকে। ব্যাণ্ডের আকৃতি, দুইটা ব্যাণ্ডের মধ্যে ব্যবধান ও অন্যান্য চরিত্র থেকে ক্রোমোসোমের কোন নির্দিষ্ট অংশকে

সহজেই চেনা যায় এবং এর থেকে ক্রোমোসোমের মানচিত্র (*chromosome map*) গঠন করা সম্ভব হয়েছে। ক্রোমোসোমের মানচিত্রের সাহায্যে ক্রোমোসোমের কোন অস্বাভাবিকতা সহজেই নির্ণয় করা যায়। দুইটা প্রজাতির স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোমের তুলনা করে তাদের ব্যাণ্ডের গঠন ও
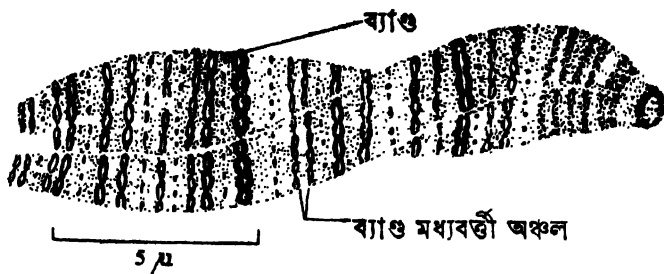
চিত্র 76
Drosophila melanogaster-এর স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের চতুর্থ ক্রোমোসোমের গঠন

বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে। নির্দিষ্ট জীনের অবস্থান কোন ব্যাণ্ডে তা নির্ণয় করা গিয়েছে। ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন স্বাভাবিক ও পরিবর্তিত স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমের তুলনা করে সহজেই বোঝা যায়।

স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের কোষে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি তাদের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধরে পাশাপাশি থাকে এরপর কোষ বিভাগ আর অগ্রসর হয় না ও কোষটা স্থায়ীভাবে প্রফেজের প্যাকিটিন অবস্থায় থাকে। ড্রসোফিলায় চার জোড়া ক্রোমোসোমের ($2n = 8$) সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল পরস্পর যুক্ত হয়ে ক্রোমোসেন্টারের (*chro-*
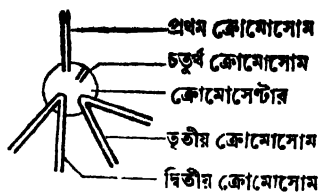
চিত্র 77
***Drosophila*-র** স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডে ক্রোমোসোমগুলি ক্রোমোসেন্টার অঞ্চলে যুক্ত থাকে

mocentre) (চিত্র 77) সৃষ্টি করে। ক্রোমোসোমের বাহুগুলি ক্রোমো-সেন্টার থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। 'Y' ক্রোমোসোমটা সম্পূর্ণভাবে হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরী হওয়ায় এটা ক্রোমোসেন্টারে পুরোপুরি যুক্ত থাকে। ক্রোমোসেন্টারের সাথে একটা বড় নিউক্লীওলাস সংযুক্ত থাকে। ড্রসোফিলার সব প্রজাতিতেই ক্রোমোসেন্টার দেখা যায়। বিভিন্ন প্রজাতিতে সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের হেটারোক্রোমাটিনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ক্রোমোসেন্টারের আয়তন ছোট বা বড় হয়। অন্যান্য দ্বিপক্ষ-যুক্ত পতঙ্গের স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের কোষে ক্রোমোসেন্টার দেখা যায় না।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক বিজ্ঞানীদের মতে স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোম বহুসূত্র-যুক্ত অর্থাৎ পলিটেনি (*polyteny*) প্রকৃতির। Hertwig (1935), Cooper (1938), Painter (1939), Beermann (1952) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতে এই ক্রোমোসোমের ক্রোমোনিমাটা বারবার লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে অনেক ক্রোমোনিমাটার (চিত্র 78) সৃষ্টি করে (এন্ডোমাইটোসিস)। স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের প্রত্যেক ক্রোমোসোমে কখনও কখনও এক হাজারের চেয়ে বেশী ক্রোমোনিমাটা থাকে। ক্রোমোসোমের এই বহুসূত্রযুক্ত
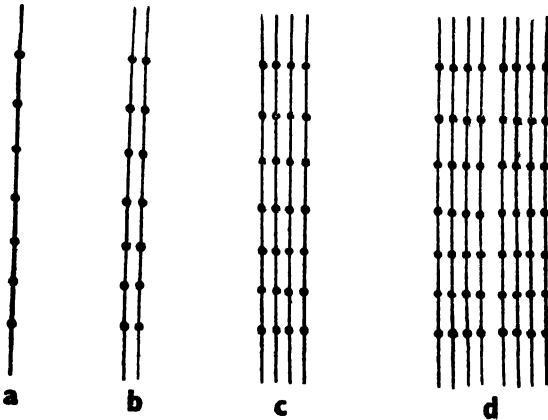
চিত্র 78
স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমের উৎপত্তি

অবস্থাকে পলিটেনি বলে। Painter (1941), Swift ও Rasch-এর (1954) মতে প্রত্যেক ক্রোমোসোমে 1024টা ক্রোমোনিমাটা থাকে। Kurnick ও Herskowitz-এর (1952) মতে একটা ক্রোমোসোমে

ক্রোমোনিমাটার সংখ্যা হ'ল 500 এবং Beermann-এর (1952) মতে ক্রোমোনিমাটার সংখ্যা 16,000 পর্যন্ত হয়।

স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতা হয়। ট্রিপ্লয়েড ড্রসোফিলায় তিনটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোম তাদের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধরে যুগ্ম অবস্থান করে। স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমের ব্যাণ্ডগুলি ক্রোমোমিয়ারেরই প্রতিনিধি। Painter-এর মতে এই বহু ক্রোমোনিমাটা-যুক্ত ক্রোমোসোমের প্রত্যেক ক্রোমোনিমাই একই ধরনের অর্থাৎ একটা অন্যটার যথার্থ প্রতিলিপি। প্রতিটি ক্রোমোনিমার কোন নির্দিষ্ট ক্রোমো-মিয়ার একই জায়গায় থাকে ও পাশাপাশি যুক্ত হয়ে একটা ব্যাণ্ডের সৃষ্টি করে। D' Angelo (1946, 1950) পলিটেনি মতকে সমর্থন করেন। তিনি দেখান যে একটা ব্যাণ্ডকে যদি পাশাপাশি টানা হয় তাহলে ঐ ব্যাণ্ডটা কতকগুলি পুঁতির মত অংশে অর্থাৎ ক্রোমোমিয়ারে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমের DNA-র পরিমাণও পলি-টেনি মতবাদের সমর্থন করে। Kurnick Harskowitz দেখেন যে ড্রসো-ফিলার স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের খুব বড় নিউক্লীয়াসে স্বাভাবিক নিউক্লীয়াসের চেয়ে প্রায় 420 গুণ বেশী DNA থাকে। Swift ও Rasch-ও (1955) স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমে বেশী DNA-র উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন। Dobzhansky (1936), Schultz (1941), White (1946) প্রভৃতি বিজ্ঞানীবা স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমেব বিভিন্ন পরিমাণের পলিটেনির উল্লেখ করেছেন। একই কোষের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে কিম্বা একই ক্রোমোসোমের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পলিটেনির পরিমাণের তারতম্য হয়। Metz-ও (1941) স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমের পলিটেনি প্রকৃতির সমর্থন করেছেন। তিনি ব্যাণ্ডের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে *alveolar hypothesis* গঠন করেন। Metz-এর মতে ব্যাণ্ড অঞ্চলগুলি দুইটা অ্যাল-ভিওলাইয়ের (*alveoli* বা ছোট ছিদ্র) সংযোগস্থলে ক্রোমাটিনের সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

তবে সব বিজ্ঞানীরা পলিটেনি মতবাদ সমর্থন করেন নাই। তাঁদের মতে স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমে কেবল চারটি সূত্র থাকে এবং এই ক্রোমো-সোমের ব্যাণ্ডমধ্যবর্তী অঞ্চল স্ফীত হওয়ার ফলে স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের অতিকায় ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়।

Ris ও Crouse-এর (1954) মত অনুসারে সাধারণ মাইটোসিস বা মায়োসিসের সময় ক্রোমোসোমে যতগুলি ক্রোমোনিমাটা থাকে স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোমেও একই সংখ্যক ক্রোমোনিমাটা থাকে। কিন্তু স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডে এইসব ক্রোমোনিমাটা অতিরিক্ত বস্তু সঞ্চিত করে বড়

হয়। Kodani (1942) ও Darlington (1949) মতে স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোম সাধারণ ক্রোমোসোমের চেয়ে বেশী পদার্থ গ্রহণ ক'রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে অতিরিক্ত বড় হয়।

পাফ (*puff*) **ও বালবিয়ানি রিঙ** (*Balbiani ring*)

Beermann (1952), Breuer, Pavan (1955) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা দেখেন যে লার্ভার বৃদ্ধির কোন পর্যায়ে স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমের কিছু ব্যাণ্ড ফুলে ওঠে (চিত্র 79a, b)। এই স্ফীত অংশকে পাফ (*puff*) বলে। পাফ অঞ্চলে জীনটা কর্মব্যস্ত থাকে ও এই অঞ্চলে প্রচুর RNA তৈরী হয় (Pavan ও Breuer 1955, Beermann 1962, Pelling 1964, ও Pavan 1965)। একটা ব্যাণ্ডের বা পাশাপাশি কয়েকটা ব্যাণ্ডের
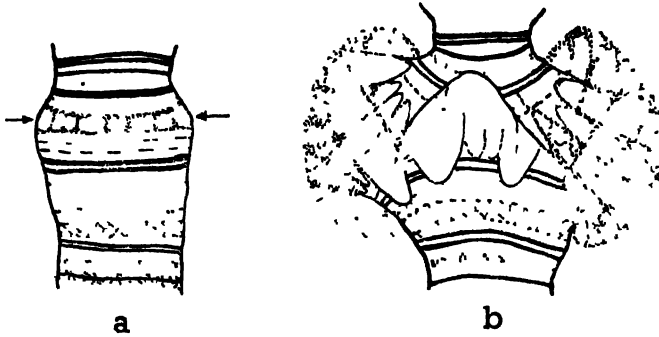
চিত্র 79

বালবিয়ানি রিঙ, a—*Drosophila*-র স্বাভাবিক স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোসোমের একাংশ, তীর চিহ্নিত স্থানে পরে বালবিয়ানি রিঙ গঠিত হয়েছে, b—বালবিয়ানি রিঙ

কর্মব্যস্ততার ফলে পাফের সৃষ্টি হয়ে থাকে। *Rhynchosciara angelae*-তে Breuer ও Pavan (1955) একাধিক ব্যাণ্ড থেকে পাফের উৎপত্তি লক্ষ্য করেছিলেন। পাফ অল্পক্ষণ বা বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। *Rhynchosciara*-এ পাফ মাত্র কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয় (Guaraciaba ও Teledo 1967)। *Chironomus*-এ প্রায় সম্পূর্ণ লার্ভা অবস্থায় পাফটা স্থায়ী হয় (Beermann 1957)। *Chironomus*-এর বিভিন্ন স্থানের কোষে একই রকমের পাফ দেখা যায় (Beermann 1957)। কিন্তু *Rhynchosciara*-র বিভিন্ন টিস্যুতে কখনও এক রকমের পাফ দেখা যায় না (Pavan 1965)। কোন

কোন পাফ প্রাণীর পরিণতির সময় কেবল একবার দেখা যায় আবার অন্যান্য পাফ জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বারবার দেখা দেয়। সুতরাং কিছু পাফ কোষের বিশেষ কাজের সাথে ও অন্যান্য পাফ কোষের স্বাভাবিক কাজের সাথে জড়িত। দেখা গিয়েছে যে ভিন্ন ভিন্ন হরমোন (*hormone*) প্রয়োগ করলে পাফ আবির্ভূত হয় বা অদৃশ্য হয় কিম্বা পাফ অঞ্চলে কর্ম-ব্যস্ততা হ্রাস পায়। হরমোন একডিসিনের প্রভাবে পাফ দেখা দেয়। *Rhynchoscuara angelae* ও অন্য কিছু দ্বিপক্ষ বিশিষ্ট পতঙ্গে (*diptera*) দেখা যায় যে কিছু পাফ কেবল RNA উৎপাদন করে ও অন্যান্য পাফ RNA ও মেটাবলিক (*metabolic*) DNA উৎ-পাদন করতে পারে। Breuer ও Pavan (1955), Swift (1962), Gebrusewycz-Gracia (1961) *Sciaridae*-তে DNA পাফ দেখে-ছিলেন। পাফ অঞ্চলে ক্রোমোসোমের সূত্রগুলি আলাদা হয়ে যায়। ক্রোমোনিমা সূত্রগুলি ক্রোমোসোম থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁস বা 'লুপ' (*loop*) গঠন করে। ক্রোমোসোমের চারিদিকের এই লুপ বা ফাঁসের মত গঠনকে বালবিয়ানি রিঙ (চিত্র 80) বলে। Balbiani 1881 খৃষ্টাব্দে প্রথম এই লুপ দেখতে পেয়েছিলেন।
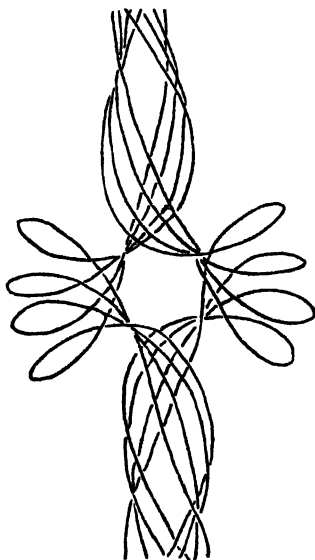
চিত্র 80

বালবিয়ানি রিঙে ক্রোমোসোমের গঠন

ল্যাম্প-ব্রাস ক্রোমোসোম (*lamp-brush chromosome*)

অনেক মেরুদণ্ডী (*vertebrate*) প্রাণীর ও কতকগুলি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ডিম্বাণু মাতৃকোষের পরিণতির সময় ডিপ্লোটিন অবস্থায় কোন কোন ক্রোমোসোম খুব লম্বা হয় এইসব ক্রোমোসোমের পাশ থেকে অসংখ্য ফাঁসের (*loop*) বা রোমের (*hair*) মত অংশ চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। এই ধরনের ক্রোমোসোমকে ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোম (চিত্র 81a) বলে। ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোম কেবল জনন কোষে দেখা যায়। 1882 খৃষ্টাব্দে Flemming এই ক্রোমোসোম প্রথম দেখেন। 1892 খৃষ্টাব্দে Rückert এই ক্রোমোসোমের সাথে বাতি পরিষ্কার করবার ব্রাশের আকৃতিগত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে এর ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোম নামকরণ করেন।
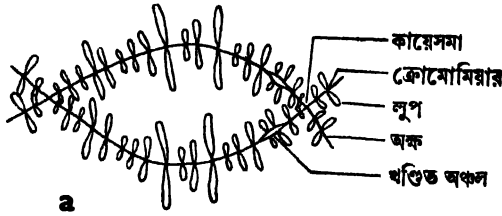
চিত্র 81a

ডিপ্লোটিনে ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোম

যেসব ডিম্বাণু মাতৃকোষ অনেকক্ষণ প্রফেজ অবস্থায় থাকে সেখানে দীর্ঘ ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোম দেখা যায়। ব্যাঙে এই প্রফেজ অবস্থা এক বৎসরের বেশী সময় স্থায়ী হতে পারে ও এখানে ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য 800 থেকে 1000 μ পর্যন্ত হয়। ডিপ্লোটিন অবস্থায় লুপ বা ফাঁসগুলির সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী হয়। ডিম্বাণু মাতৃকোষটা যতই মেটাফেজ অবস্থার দিকে অগ্রসর হয় ততই লুপগুলি ছোট হতে থাকে ও শেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোমে ক্রোমোনিমার সংখ্যা সাধারণ মাইটোসিস বা মায়োসিসের ক্রোমোসোমের ক্রোমোনিমার সংখ্যার সম ন হয় (Ris ও Crouse 1945)। ডিম্বাণু মাতৃকোষে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি পাশাপাশি থাকে ও কেবল কায়েসমা অঞ্চলে এরা পরস্পর যুক্ত থাকে। এই অবস্থায় ক্রোমোমিয়ার অঞ্চল থেকে লুপ (*loop*) বা ফাঁসগুলি গঠিত হয় ও পাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক ক্রোমোমিয়ারে সাধারণতঃ এক জোড়া লুপ থাকে (চিত্র 81b)। তবে লুপের সংখ্যা এক থেকে নয়

চিত্র 81b

ক্রোমোমিয়ার ও একটা লুপকে বড় করে দেখান হয়েছে

পর্যন্ত হতে পাবে। যে ক্রোমোমিয়ারে দুইটার চেয়ে বেশী সংখ্যক লুপ থাকে সেই ক্রোমোমিয়ারটা সম্ভবতঃ কয়েকটা ক্রোমোমিয়ারের মিলনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে কোন লুপ থাকে না। একটা ক্রোমোসোমে লুপের সংখ্যা ও একটা লুপ থেকে অন্য লুপেব দূরত্ব নির্দিষ্ট হয। বিভিন্ন লুপের দৈর্ঘ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ব্যাঙের ল্যাম্প-ব্রাস ক্রোমোসোমে লুপের দৈর্ঘ্য 9.5 μ থেকে 200 μ পর্যন্ত হয়। লুপ-গুলিব নির্দিষ্ট আকার ও বিন্যাস থাকায় ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোমেব মানচিত্র গঠন সম্ভব হয়েছে। ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোম স্থিতিস্থাপক। এই ক্রোমো-সোমকে টানলে ক্রোমোমিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল বড় হয় ও লুপগুলি দূরে দূরে সরে যায় ও ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসে। ক্যালসিয়াম ও অন্য কিছু রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোমটা সঙ্কুচিত হয়। লুপগুলিব অক্ষ DNA দিয়ে তৈরী। এই অক্ষ থেকে যে সূক্ষ্ম সূত্রগুলি চারিদিকে ছড়ান থাকে সেগুলি RNA এবং প্রোটীন দিয়ে তৈরী। Duryee মনে করেন যে লুপগুলি ক্রোমো-

মিয়ার থেকে সৃষ্ট ক্রোমাটিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। তাঁর মতে লুপগুলি ক্রোমোনিমার অংশ নয়, কারণ যদি ক্রোমোসোমটা কৃত্রিম উপায়ে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করা যায় তাহলেও লুপগুলি যথাস্থানে থাকে। কিন্তু Ris-এর (1945) মতে এগুলি ক্রোমোনিমারই অংশ। Gall (1956) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে নানা গবেষণা করে Ris-এর মতকেই সমর্থন করেছেন। Ris (1957) ও Gall-এর (1958) মতে লুপগুলি ক্রোমোসোমের অক্ষের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে এবং এর থেকে বোঝা যায় যে লুপগুলি ক্রোমোসোমীয় অক্ষের (*axis*) অংশ।

নিউক্লীওলাস গঠনকারী অঞ্চলযুক্ত ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোম থেকে অসংখ্য নিউক্লীওলাই গঠিত হতে পারে। কখনও কখনও প্রায় এক হাজারটা নিউক্লীওলাই নিউক্লীওপ্লাজমে ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। এর তাৎপর্য সঠিক বোঝা যায় নাই। Duryee-র মতে এই নিউক্লীওলাসগুলি সাইটোপ্লাজমে যায়। নিউক্লীওলাসগুলিতে প্রচুর পরিমাণে RNA এবং প্রোটীন থাকায় এরা ডিম্বাণুর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

B ক্রোমোসোম বা অতিরিক্ত ক্রোমোসোম

কোন কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোষে স্বাভাবিক ক্রোমোসোম ছাড়াও এক বা একাধিক অতিরিক্ত ক্রোমোসোম দেখা যায়। স্বাভাবিক ক্রোমোসোমগুলি জীবের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য এবং জীবের বৃদ্ধি, উর্বরতা ও অন্যান্য চরিত্রকে এরা প্রভাবিত করে। কিন্তু বংশধারার উপর অতিরিক্ত ক্রোমোসোমের কোন প্রভাব থাকে না। এজন্য এদের দ্বিতীয় বিভাগীয় ক্রোমোসোম বা ভৌতিক ক্রোমোসোম বা B ক্রোমোসোম বলে। *Metapodius* নামের একরকম পতঙ্গে Wilson (1905) প্রথম এইরকম ক্রোমোসোম দেখেন। এর পর B-ক্রোমোসোম অন্য অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীতে পাওয়া গিয়েছে।। Lutz (1908) *Diabrotica punctata*-য় এবং Kuwada (1905) *Zea mays*-এ এই ক্রোমোসোম দেখতে পেয়েছিলেন। এছাড়া *Allium, Centauria, Poa, Secale, Sorghum* ও *Trillium, Polyscias* (চিত্র 82) ইত্যাদি অনেক উদ্ভিদে B-ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। শতাধিক পতঙ্গে ও অন্যান্য প্রাণীতে B-ক্রোমোসোম পাওয়া গিয়েছে (White 1973)। দেড়শর বেশী সপুষ্পক উদ্ভিদে B-ক্রোমোসোমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়েছে (Muntzing 1967)। Longley 1927 খৃষ্টাব্দে এই ক্রোমোসোমকে B-ক্রোমোসোম বা অতিরিক্ত ক্রোমোসোম নামে অভিহিত করেন।

B-ক্রোমোসোম স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের চেয়ে বেশ ছোট। এদের
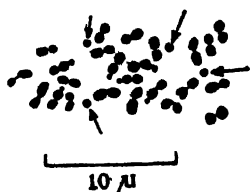
চিত্র ৪২
Polyscias-এ (২n = ২৪) চারটা B-ক্রোমোসোম (তীর চিহ্নিত) দেখা যাচ্ছে (Guha, unpublished)

সেন্ট্রোমিয়ারটা সাধারণতঃ উপপ্রান্তীয় বা প্রান্তীয় হয়। একই জীবের বিভিন্ন কোষে এদের সংখ্যার তারতম্য হয়। কোন কোন কোষে এরা অনুপস্থিত থাকে আবার অন্য কোষে একটা থেকে অনেকগুলি পর্যন্ত B-ক্রোমোসোম দেখা যায়। তবে এদের উপস্থিতির ফলে ফেনোটাইপের কোন পরিবর্তন হয় না। এই ক্রোমোসোম কখনও স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের সাথে যুগ্ম অবস্থান করে না। কখনও কখনও একই প্রজাতির কোন অঞ্চলের উদ্ভিদে B-ক্রোমোসোম থাকে আবার অন্য কোন অঞ্চলের উদ্ভিদে B-ক্রোমোসোম পাওয়া যায় না। পলিপ্লয়েড স্তরের চেয়ে ডিপ্লয়েড স্তরে B-ক্রোমোসোম বেশী দেখা যায়। B-ক্রোমোসোমযুক্ত ডিপ্লয়েড উদ্ভিদকে কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েড করে দেখা গিয়েছে যে ঐ উদ্ভিদ থেকে B-ক্রোমোসোম পর্যায়ক্রমে বাদ যায়।

B-ক্রোমোসোম সাধারণতঃ হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরী। তবে *Tradescantia* ও *Trillium*-এ B-ক্রোমোসোম সম্পূর্ণভাবে ইউক্রোমাটিন (*euchromatin*) দিয়ে গঠিত। ভুট্টার B-ক্রোমোসোম আংশিকভাবে হেটারোক্রোমাটিন ও আংশিকভাবে ইউক্রোমাটিন দিয়ে তৈরী।

কোন কোন প্রাণীতে B-ক্রোমোসোম সেক্স ক্রোমোসোম থেকে তৈরী হয়। *Metapodius terminalis*-এর 'Y' ক্রোমোসোমের কোন কোন অংশ ভেঙ্গে গেলে তা স্থায়ী হয় কারণ এখানে সেন্ট্রোমিয়ারটা *diffused* বা পরিব্যাপ্ত ধরনের। এই ভগ্ন Y ক্রোমোসোম থেকেই B ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। এছাড়া স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের ইউক্রোমাটিন অংশ নষ্ট হয়ে কিম্বা সেন্ট্রোমিয়ারের ভ্রান্ত বিভাগের (*mis-division*) ফলেও B-ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হতে পারে। Darlington শেষোক্ত মতের সমর্থক। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে কখনও কখনও কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা কমে যাওয়ার সময় B-ক্রোমোসোম উপজাত (*by-product*) হিসাবে উৎপন্ন হয়। এসব ক্ষেত্রে একটা ক্রোমোসোমের জেনেটিকভাবে সক্রিয় অংশ ট্রান্সলোকেশনের ফলে

অন্য ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত হয় এবং সেন্ট্রোমিয়ার ও তার কাছের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল B-ক্রোমোসোম গঠন করে।

অল্প সংখ্যায় B-ক্রোমোসোমের সাধারণতঃ কোন প্রভাব থাকে না। Randolph (1941) দেখেন যে ভুট্টায় অনেকগুলি B-ক্রোমোসোমের উপস্থিতি ক্ষতিকর। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে B-ক্রোমোসোম জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু Randolph-এর পরীক্ষা থেকে বলা যায় যে এরা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় নয়। রাই-এ (*Secale cereale*) অনেকগুলি B-ক্রোমোসোমের উপস্থিতি উর্বরতা ও সতেজতার পক্ষে ক্ষতিকর। অটোটেট্রাপ্লয়েড রাই-এ এদের উপস্থিতি বিশেষভাবে ক্ষতিকর। Rutishauser দেখেন যে *Trillium*-এর এণ্ডোস্পার্মে বা সস্যে তিনটা পর্যন্ত B-ক্রোমোসোমের উপস্থিতি ক্ষতিকর হয় না। কোন কোন গোষ্ঠীতে অতিরিক্ত ক্রোমোসোমের নিয়মিত উপস্থিতি তাদের বিশেষ কাজের ইঙ্গিত করে। Muntzing মনে করেন যে B-ক্রোমোসোমের কিছু নির্বাচনী ক্ষমতা আছে। *Poa* ও *Sorghum*-এ B-ক্রোমোসোম কোষ বিভাগের সময় *lagging*-এর (বা মন্থরগতিশীলতা) জন্য দেহ কোষ থেকে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু যেসব কোষ থেকে জনন কোষ তৈরী হবে সেখানে এদের দেখা যায়। ভুট্টার যেসব শুক্রাণুতে B-ক্রোমোসোম থাকে তারা ডিম্বাণুর সাথে ফার্টিলাইজেশনের (বা নিষেকের) ক্ষেত্রে যোগ্যতর বিবেচিত হয়। *Polycelis tenuis*-এ Melander (1950) দেখেন যে B-ক্রোমোসোম দেহ কোষ থেকে বিলুপ্ত হয় কিন্তু ডিম্বকের কোষে এরা উপস্থিত থাকে। কোন কোন পরিবেশে এই ক্রোমোসোম যৌন পরিণতি বিলম্বিত করে। এর ফলে B-ক্রোমোসোমযুক্ত *Polycelis* এবং B-ক্রোমোসোমবিহীন *Polycelis*-এর মধ্যে যৌন জনন সম্ভব হয় না। B-ক্রোমোসোমযুক্ত *Polycelis* নিজেদের মধ্যে যৌন জনন কৃতকার্যতার সাথে সম্পন্ন করে। নিকট সম্পর্কীয় প্রজাতি থেকে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদে B-ক্রোমোসোম ক্রোমোসোমের যুগ্মতাকে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে।

অতিরিক্ত বা B-ক্রোমোসোম তুলনামূলকভাবে অস্থায়ী। কোষ বিভাগের সময় এদের পৃথকীকরণ (*seggregation*) অস্বাভাবিকভাবে হয়। হেটারোক্রোমাটিক প্রকৃতির জন্য B-ক্রোমোসোম চটচটে হওয়ায় এদের নন-ডিসজাংশন (*non-disjunction*) হয়। এইভাবে কোন কোষ থেকে অতিরিক্ত ক্রোমোসোম বাতিল হয়ে যায়। ফ্র্যাগমেন্টেশনের (*fragmentation*) ফলে প্রায়ই B-ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন হয়। Muntzing (1945, 1946, 1950) *Secale*-এ এবং Randolph (1941) *Zea*-এ বিভিন্ন ধরনের B-ক্রোমোসোমের বর্ণনা দিয়েছেন।

নবম অধ্যায়

ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন

ক্রোমোসোমের প্রধান রাসায়নিক বস্তু হচ্ছে নিউক্লীক অ্যাসিড ও প্রোটীন। ক্রোমোসোমে দুই রকমের নিউক্লীক অ্যাসিড পাওয়া যায়, এগুলি হ'ল-- ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লীক অ্যাসিড (*deoxyribonucleic acid*) বা DNA এবং রাইবোনিউক্লীক অ্যাসিড (*ribonucleic acid*) বা RNA। RNA-র (*1.2—1.4%*) তুলনায় ক্রোমোসোমে DNA-এর (*45%*) পরিমাণ অনেক বেশী থাকে। ক্রোমোসোমের প্রোটীনও প্রধানতঃ দুই রকমের—বেসিক প্রোটীন (*basic protein*) এবং অবেসিক প্রোটীন (*non-basic protein*)। হিস্টোন (*histone*) ও প্রোটামাইন (*protamine*) হ'ল বেসিক প্রোটীন। অবেসিক বা অ্যাসিডিক প্রোটীন অম্লধর্মী। ট্রিপ্টো-ফ্যান (*tryptophane*) ও টাইরোসিন (*tyrosine*) প্রভৃতি অ্যামিনো অ্যাসিড অবেসিক প্রোটীনে পাওয়া যায়। এই প্রোটীনকে অবশিষ্ট প্রোটীনও (*residual protein*) বলা হয়ে থাকে। এছাড়া ক্রোমোসোমে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম ক্রোমসোমকে অটুট রাখতে সাহায্য করে। এটা DNA-র সাথে যুক্ত থাকে (Burton '51, Mazia '54)। ক্যালসিয়ামের অভাবে ক্রোমোসোমগুলি সহজেই ভেঙ্গে যায় (Steffensen 1955)। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমে লিপিড পাওয়া যায়। এই লিপিড সাধারণতঃ ফসফোলিপিড হিসাবে থাকে (Chayen 1959)। DNA প্রধানতঃ হিস্টোনের সাথে যুক্ত থাকে। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্রোমাটিনে DNA ও হিস্টোনের অনুপাত মোটামুটি 1:1। অ্যাসিডিক প্রোটীন উভয় প্রকার নিউক্লীক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত থাকে (Mirsky ও Ris 1947)।

Mazia-র (1952) মতে ক্রোমোসোমের দুইটা প্রধান অংশ হ'ল—(1) DNA—হিস্টোন অংশ এবং (2) RNA—অবশিষ্ট প্রোটীন অংশ। একটা ব্যস্ত মেটাবোলিক (*metabolic*) নিউক্লীয়াসে DNA 9 শতাংশ, হিস্টোন 11 শতাংশ এবং অবশিষ্ট প্রোটীন 14 শতাংশ থাকে (Pollister, 1952)।

1947 খৃষ্টাব্দে Mirsky ও Ris ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠনের যে বর্ণনা দেন তা হ'ল—

(1) DNA—হিস্টোন (লবণ দিয়ে নিষ্কাষিত)	90—92% —	DNA 45% হিস্টোন 55%
(2) অবশিষ্ট ক্রোমোসোম	8—10% —	RNA (12—14%) DNA (2%) হিস্টোন ছাড়া অন্যান্য প্রোটীন (82—84%)

Mirsky ও Ris-এর মতে এই অবশিষ্ট প্রোটীন অংশটাই ক্রোমোসোমের কাঠামো গঠন করে ও ক্রোমোসোমকে অটুট রাখে। কিন্তু Kaufmann এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ক্রোমোসোমের অখণ্ডতা কোন একটা বিশেষ পদার্থের উপর নির্ভর করে না।

নিউক্লীক অ্যাসিড (*nucleic acid*)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Meischer 'নিউক্লীন' (*nuclein*) আবিষ্কার করেছিলেন। এই নিউক্লীনকেই এখন নিউক্লীওপ্রোটীন (*nucleo-protein*) বলা হয়। নিউক্লীওপ্রোটীনে নিউক্লীক অ্যাসিড ও প্রোটীন থাকে।

সব কোষের নিউক্লীয়াসে নিউক্লীক অ্যাসিড পাওয়া যায়। সাইটো-প্লাজমের রাইবোসোমেও নিউক্লীক অ্যাসিড (RNA) থাকে। নিউক্লীক অ্যাসিডের অণুগুলি খুব দীর্ঘ এবং এদের আণবিক ওজন কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত হয়।

নিউক্লীক অ্যাসিড দুই রকমের— DNA ও RNA। অধি-কাংশ জীবেই DNA ও RNA থাকে। তবে কিছু ভাইরাস যেমন, তামাকের মোজেইক (*tobacco mosaic*) ও পোলিওমাইলিটিস (*polio-myelitis*) রোগের ভাইরাসে কেবল RNA থাকে। আবার ব্যাকটিরিয়ো-ফাজে (*bacteriophage*) এবং অ্যাডিনোভাইরাসে (*adenovirus*) কেবল DNA পাওয়া যায়। সব নিউক্লীক অ্যাসিডই কতকগুলি ছোট ছোট অংশ দিয়ে তৈরী, এদের নিউক্লীওটাইড (*nucleotide*) বলে। প্রত্যেক নিউক্লওটাইডে তিনটা পদার্থ থাকে। এই পদার্থগুলি হ'ল— নাইট্রোজেন ঘটিত বেস (*nitrogenous base*), পাঁচ কার্বনযুক্ত পেন্টোজ শর্করা (*pentose sugar*) এবং ফসফরিক অ্যাসিড। শর্করাটা ডিঅক্সি-রাইবোজ (*deoxyribose*) ধরনের হ'লে ঐ নিউক্লীক অ্যাসিডকে ডিঅক্সি-

রাইবোজ নিউক্লীক অ্যাসিড বলে। রাইবোজ (*ribose*) শর্করা থেকে রাইবোজ নিউক্লীক অ্যাসিড গঠিত হয়। নাইট্রোজেন ঘটিত বেসগুলি প্রধানতঃ দুই রকমের—পিউরিন (*purine*) ও পিরিমিডিন (*pyrimidin*)। পিরিমিডিনে কার্বন ও নাইট্রোজেনের পরমাণু দিয়ে তৈরী একটা ছয় সদস্য-যুক্ত রিঙ (*ring*) থাকে। পিউরিন পাঁচ ও ছয় সদস্যযুক্ত দুইটা রিঙ দিয়ে তৈরী। এই রিঙগুলিও কার্বন ও নাইট্রোজেনের পরমাণু দিয়ে গঠিত।

প্রধান দুইটা পিউরিন বেস হ'ল অ্যাডিনিন (*adenine*), গুয়ানিন (*guanine*) এবং পিরিমিডিন বেসগুলি হ'ল থাইমিন (*thymine*), সাইটোসিন (*cytosine*) ও ইউরাসিল (*uracil*) (চিত্র 83)। DNA-তে সাধারণতঃ অ্যাডিনিন (A), গুয়ানিন (G), থাইমিন (T) ও সাইটোসিন
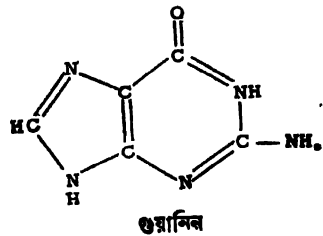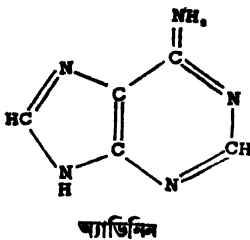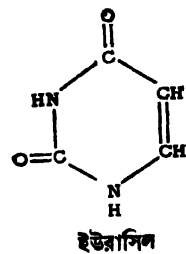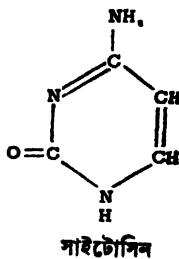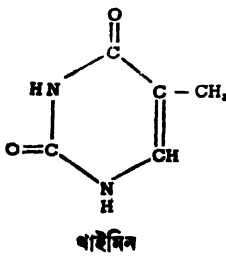
চিত্র 83

পিরিমিডিন বেস—থাইমিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল এবং পিউরিন বেস—অ্যাডিনিন ও গুয়ানিনের রাসায়নিক গঠন

(C) থাকে। কখনও কখনও সাইটোসিনের পরিবর্তে 5 মিথাইল সাইটোসিন (*5-methyl cytosine*) পাওয়া যায় (যেমন গমে)। RNA-তে

অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল (U) ও সাইটোসিন থাকে। শর্করা ও বেস একসাথে নিউক্লীওসাইড (*nucleoside*) গঠন করে। নিউক্লীওসাইডের সাথে ফসফরিক অ্যাসিড যুক্ত হ'লে নিউক্লীওটাইড তৈরী হয়। অনেকগুলি নিউক্লীওটাইড পরস্পর যুক্ত হয়ে একটা বহু নিউক্লীও-টাইডযুক্ত সূত্র বা পলিনিউক্লীওটাইড চেন (*polynucleotide chain*) গঠন করে। 'DNA নির্ভরশীল DNA পলিমারেজ' এনজাইম একটা নিউক্লীওটাইডের সাথে আরেকটা নিউক্লীওটাইডের সংযুক্তিকরণে সাহায্য করে (Kornberg 1968)। একটা নিউক্লীও-টাইডে ফসফরিক অ্যাসিড শর্করার সাথে ইস্টার বণ্ডের (*ester bond* অর্থাৎ C—O) মাধ্যমে যুক্ত হয়। শর্করার সাথে বেসগুলি গ্লুকোসাইড বণ্ড (অর্থাৎ N—C) দিয়ে যুক্ত থাকে।

ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লীক অ্যাসিড (*DNA*)

সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রোমোসোমে DNA পাওয়া যায়। তবে কিছু ভাইরাসে DNA-র বদলে RNA থাকে। ক্রোমোসোম ছাড়াও কোষের অন্য কোন কোন স্থানে DNA থাকে। মাইটোকণ্ড্রিয়ায়, প্লাস্টিডে এবং *Paramecium*-এর সেন্ট্রিওলে (*centriole*) DNA পাওয়া গিয়েছে। *Drosophila* এবং উভয়চর প্রাণীর ডিম্বাণুর নিউক্লীওলাসে DNA-র উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়েছে।

1953 খৃষ্টাব্দে Watson ও Crick DNA-র গঠন সঠিকভাবে বর্ণনা করেন। সব জীবের DNA-র গঠন মূলগতভাবে একই। DNA অণুতে দুইটা দীর্ঘ পলিনিউক্লীওটাইড সূত্র থাকে। এই সূত্র দুইটা একটা মধ্য-রেখার (*central axis*) চারিদিকে পরস্পর পেঁচিয়ে থাকে ও একটা ডবল হেলিক্স (*double helix*) তৈরী করে (চিত্র 84, 86) অর্থাৎ DNA অণুর আকৃতি একটা ঘুরানো সিঁড়ির মত। নিউক্লীওটাইড সূত্রের একটা পেঁচ সম্পূর্ণ করবার জন্য দশটা নিউক্লওটাইডের প্রয়োজন এবং একটা বেস থেকে পরের বেসের দূরত্ব 34Å। একটা DNA-তে 3000—4000টা নিউক্লীও-টাইড থাকে। তবে কখনও কখনও একটা DNA অণুতে 30,000টা পর্যন্ত নিউক্লীওটাইড থাকতে পারে। DNA অণুর প্রস্থ 20Å এবং এর দৈর্ঘ্য প্রস্থের হাজার গুণ হয়ে থাকে। DNA-র আণবিক ওজন 10^7।

DNA অণুর সূত্র দুইটার কাঠামো ফসফরিক অ্যাসিড ও শর্করা দিয়ে তৈরী এবং এই সূত্র দুইটা নাইট্রোজেন বেস দিয়ে হাইড্রোজেন বণ্ডের মাধ্যমে যুক্ত থাকে অর্থাৎ একটা সূত্রের একটা বেস অন্য সূত্রের আরেকটা বেসের সাথে যুক্ত থাকে। একটা সূত্রের নিউক্লীওটাইডের

শর্করা অংশ বিপরীত নিউক্লীওটাইডের (অপর সূত্রের) শর্করা থেকে সব সময় 11Å দূরে থাকে। এই নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য কোন জোড়ার একটা বেস যদি পিউরিন হয় তবে অন্য বেসটা পিরিমিডিন হবে।

চিত্র 84

DNA অণুর গঠন

অ্যাডিনিন (A) সব সময় থাইমিনের (T) সাথে (চিত্র 85) দুইটা হাইড্রোজেন বণ্ডের সাহায্যে এবং গুয়ানিন (G) সাইটোসিনের (C) সাথে তিনটা হাইড্রোজেন বণ্ডের সাহায্যে যুক্ত থাকে। এজন্য কোন প্রজাতির অ্যাডিনিনের পরিমাণ ও থাইমিনের পরিমাণ সমান হয়। একই ভাবে গুয়ানিন ও সাইটোসিনের অনুপাত 1:1 হয়। কিন্তু অ্যাডিনিন ও

থাইমিন

অ্যাডিনিন

চিত্র 85
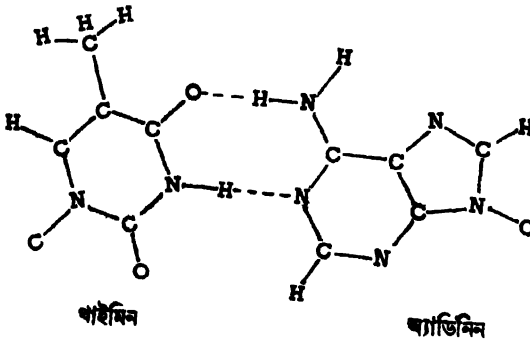
DNA অণুতে পিরিমিডিন বেস (যেমন থাইমিন) পিউরিন বেসের (যেমন অ্যাডিনিন) সাথে হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত থাকে

গুয়ানিনের অনুপাত বা থাইমিন ও সাইটোসিনের অনুপাতের তারতম্য হয়ে থাকে। এই অনুপাত সাধারণতঃ 0.7 থেকে 1.7 পর্যন্ত হয়। একটা DNA অণুতে বেস জোড়াগুলি (A–T, T–A, G–C, C–G) বিভিন্ন-ভাবে সাজান থাকতে পারে। DNA অণুর সূত্র দুইটার একটা অন্যটার পরিপূরক। একটা সূত্রের কোন অংশের বেসের ক্রম যদি CTGC ইত্যাদি হয় তবে অন্য সূত্রের ঐ অংশেব বেসের ক্রম হবে GACG ইত্যাদি (চিত্র 84)।

DNA অণু দ্বিগুণ হ'লে দুইটা একই আকৃতির ও প্রকৃতির DNA অণু গঠিত হয়। DNA উৎপাদন ইন্টারফেজের একটা বিশেষ পর্যায়ে হয় এবং এই পর্যায়কে S-অবস্থা (*S = synthesis*) বলে। ইন্টারফেজের S-অবস্থার আগের পর্যায়কে G_1 (*G = gap*) অবস্থা ও পরের পর্যায়কে G_2 অবস্থা বলে। DNA কি করে দ্বিগুণ হয় তা সঠিকভাবে Watson ও Crick প্রথম বর্ণনা করেন (চিত্র 87a-d)। পরে Korenberg, Stahl, Taylor প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ এ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। DNA সম্ভাব্য তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বিগুণ (*replication*) হতে পারে। এই পদ্ধতিগুলি হ'লঃ—

(*a*) আংশিক রক্ষণশীল (*semi-conservative*)

(*b*) রক্ষণশীল (*conservative*)

(*c*) বিক্ষিপ্ত (*dispersive*)
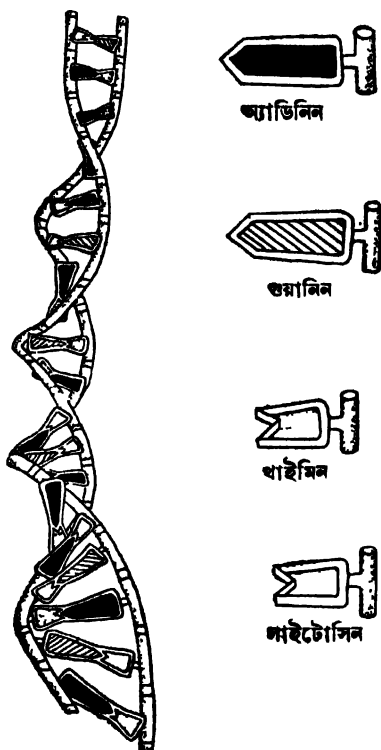
চিত্র 86
DNA অণুর একাংশের গঠন

(*a*) **আংশিক রক্ষণশীল** (*semi-conservative*) (চিত্র 87, 88a)

DNA অণুর সূত্র দুইটার পেঁচ খুলে যায় ও এরা আলাদা হয়। সূত্র দুইটা আলাদা হওয়ার সময় হাইড্রোজেন বণ্ডগুলি (*hydrogen bond*) ভেঙ্গে যায়। প্রত্যেকটা সূত্র একটা ছাঁচ হিসাবে কাজ করে। ঐ ছাঁচের উপর একটা পরিপূরক সূত্র (*complementary strand*) তৈরী হয় ও বেসগুলির বিন্যাস অপরিবর্তিত থাকে। ফলে নূতন DNA অণুটা পুরণো DNA-র অনুরূপ হয়। নূতন DNA অণুর একটা সূত্র পুরণো ও অন্য সূত্রটা নূতন থাকে।

একটা DNA অণু দ্বিগুণ হওয়ার সময় এর এক প্রান্ত থেকে সূত্র দুইটার পেঁচ ক্রমশঃ খুলতে থাকে। দেখা যায় যে একই DNA অণুর এক প্রান্তে যখন সূত্র দুইটা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তখন ঐ অণুরই অপর প্রান্তে

চিত্র 87a, b

DNA অণু দ্বিগুণ হচ্ছে, a — DNA অণুর সূত্র দুইটা আলাদা হতে সুরু করেছে,
b — নির্দিষ্ট বিন্যাস অনুযায়ী পরিপূরক বেসগুলি পুরণো DNA সূত্রের বেসের সাথে যুক্ত হচ্ছে ও এর ফলে দুইটা DNA অণু গঠিত হচ্ছে

নূতন সূত্র গঠিত হতে সুরু করেছে (Leewinthel ও Crane 1956)। এর ফলে DNA অণুটাকে এই অবস্থায় Y আকৃতির দেখায় (চিত্র 87b, c)।
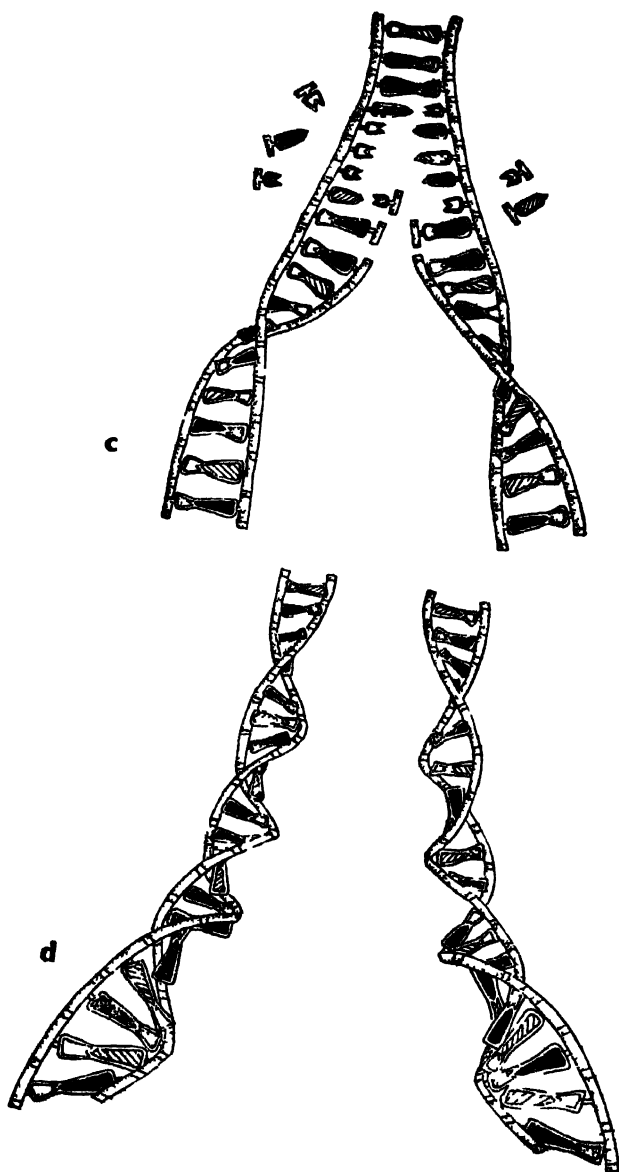
চিত্র 87c, d
DNA অণু দ্বিগুণ হচ্ছে, c—একটা DNA অণু থেকে দুইটা
DNA অণু তৈরী হচ্ছে,
d—দুইটা DNA অণু গঠিত হয়েছে

(*b*) **রক্ষণশীল** (*conservactive*) (চিত্র 88b)

এখানে DNA অণুর সূত্র দুইটা আলাদা হয় না কিন্তু এই DNA বেস জোড়াগুলি নূতন সূত্রের বেসের বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করে। অপত্য DNA অণু দুইটার একটা সম্পূর্ণভাবে পুরণো ও অন্যটা সম্পূর্ণভাবে নূতন হয়।

(*c*) **বিক্ষিপ্ত** (*dispersive*) (চিত্র 88c)

DNA অণুর সূত্র দুইটার মধ্যে পেঁচ খুলে যায়। প্রত্যেকটা সূত্র কতকগুলি অংশে ভেঙ্গে যায়। দুইটা নবগঠিত DNA অণুর প্রত্যেক সূত্রের কিছুটা অংশ পুরণো ও কিছু অংশ নূতন থাকে।

ব্যাক্টিরিয়া ও ভাইরাসের উপর গবেষণা থেকে জানা যায় যে DNA অণু আংশিক রক্ষণশীল পদ্ধতিতেই দ্বিগুণ হয়। তেজস্ক্রিয় থায়ামিডিন (*thymidine*) প্রয়োগ করে Taylor-এর (1957) পরীক্ষা DNA অণুর আংশিক রক্ষণশীল অর্থাৎ *semiconservative* পদ্ধতিতেই দ্বিগুণ হওয়াকে সমর্থন করে। ইন্টারফেজ অবস্থায় কোষগুলিকে অল্পক্ষণ তেজস্ক্রিয় থায়ামিডিন দেওয়ার পর দেখা যায় যে মেটাফেজ অবস্থায় ক্রোমো-সোমগুলির দুইটা অপত্য ক্রোমাটিডেই তেজস্ক্রিয় থায়ামিডিন থাকে। তেজস্ক্রিয় থায়ামিডিনের অনুপস্থিতিতে এইসব কোষের দ্বিতীয় বিভাগ হ'লে দেখা যায় যে কোষগুলি যখন মেটাফেজ অবস্থায় আসে তখন প্রত্যেক ক্রোমোসোমের একটা করে ক্রোমাটিডে তেজস্ক্রিয় থায়ামিডিন পাওয়া যায়। তৃতীয় বিভাগ হ'লে কেবল অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোমের একটা করে ক্রোমাটিডে তেজস্ক্রিয় থায়ামিডিন থাকে (Hughes 1958)। Messelson ও Stahl-এর পরীক্ষাও আংশিক রক্ষণশীল পদ্ধতিতে DNA-র দ্বিগুণ হওয়াকে সমর্থন করে। তাছাড়া এসব পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে প্রত্যেক ক্রোমাটিডে কেবল একটা দ্বিসূত্রযুক্ত DNA অণু থাকে।

কৃত্রিম মাধ্যমে DNA সূত্র দ্বিগুণ হতে পারে। DNA-র একটা ছাঁচের উপস্থিতিতে DNA পলিমারেজ, চারটা বেসের ট্রাইফসফেটগুলি (ATP, GTP, CTP, TTP), কিছু কোফ্যাক্টর (যেমন ম্যাগনেসিয়াম আয়ন) ইত্যাদি মিশালে ঐ ছাঁচের পরিপূরক DNA সূত্র গঠিত হয়।

DNA-**র গঠনগত পার্থক্য**

সাধারণতঃ DNA অণু দ্বিসূত্রযুক্ত ও পেঁচান থাকে। কিন্তু কিছু
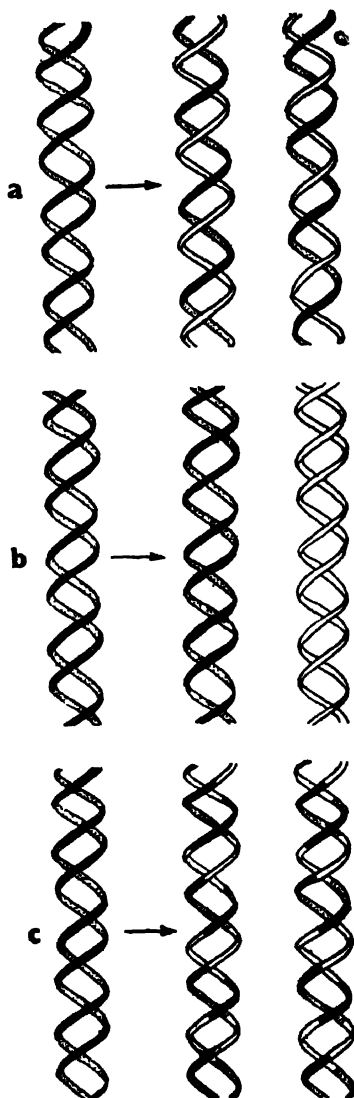
চিত্র ৪৫

DNA তিনটি সম্ভাব্য পদ্ধতিব মাধ্যমে দ্বিগ্ণ হতে পারে,
a — আংশিক বক্ষণশীল,
b — রক্ষণশীল এবং
c — বিক্ষিপ্ত

ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসের DNA একটা সূত্র দিয়ে তৈরী। এই সূত্রের রাসায়নিক গঠন দ্বিসূত্রযুক্ত DNA-র মতন। *Escherichia coli* ও কোন কোন ভাইরাসে বৃত্তাকার DNA অণু পাওয়া গিয়েছে।

সংকর *DNA*

DNA 100°C তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে DNA অণুর সূত্র দুইটা আলাদা হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে *denaturation* বলে। এরপর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করলে DNA অণুটা পুনর্গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে *renaturation* বলে। দুইটা প্রজাতির DNA উত্তপ্ত করার পর একসাথে মিশিয়ে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করলে সংকর (*hybrid*) DNA গঠিত হয়। এই পদ্ধতিকে আণবিক সংকরণ (*molecular hybridizaton*) বলে। দুইটা বিভিন্ন DNA অণুর সাদৃশ্যের মাত্রার উপর যুগ্মতার হার নির্ভর করে। মানুষ ও ইঁদুরের DNA-র মধ্যে যুগ্মতার হার 25%। DNA ও RNA সূত্রের মধ্যে সংকর গঠন সম্ভব হয়েছে (Parduc ও Gall, 1970)।

রাইবোনিউক্লীক অ্যাসিড (*RNA*)

রাইবোনিউক্লীক অ্যাসিড বা RNA নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজমে পাওয়া যায়। নিউক্লীয়াসের তুলনায় সাইটোপ্লাজমে RNA-র পরিমাণ বেশী থাকে। নিউক্লিওলাসে কখনও কখনও খুব বেশী পরিমাণে RNA থাকে। বিভিন্ন ধরনের কোষের নিউক্লীওলাসে DNA ও RNA-র অনুপাতের তারতম্য হয়। যকৃতের (*liver*) কোষে DNA ও RNA-র অনুপাত 10:1 আবার পেঁয়াজের ত্বকের কোষে এই অনুপাত 3:1 হয়। দ্রুত বিভাজনশীল টিউমার (*tumour*) কোষে সাধারণ কোষের চেয়ে অনেক বেশী RNA থাকে।

Caspersson প্রোটীন উৎপাদনে RNA-র গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। প্রোটীন উৎপাদনে RNA-র ভূমিকা এখন বিশদভাবে জানা গিয়েছে। RNA ক্রসিং ওভারেও (*crossing over*) সহায়তা করে। *Tradescentia*-র মায়োসিসে যুগ্মতা বা সাইন্যাপসিসের সময় প্রচুর RNA পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে RNA স্পিণ্ডল গঠনে সহায়তা করে।

RNA অণুর আণবিক ওজন 20,000 থেকে 10,000,000 পর্যন্ত হয়। অনেকগুলি নিউক্লীওটাইড যুক্ত হয়ে একটা RNA অণু গঠন করে। DNA-র সাথে RNA-র রাসায়নিক গঠনের কতকগুলি পার্থক্য আছে।

(*a*) DNA-র শর্করা হল ডিঅক্সিরাইবোজ (*deoxyribose*) ধরনের ও RNA-র শর্করা হ'ল রাইবোজ (*ribose*) ধরনের। (*b*) DNA-র থাইমিন বেসের পরিবর্তে RNA-তে ইউরাসিল থাকে। (*c*) DNA অণু দ্বিসূত্রযুক্ত হয় এবং RNA অণুতে একটা সূত্র থাকে।

রাইবোজ শর্করা ফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে RNA-র নিউক্লীওটাইডের কাঠামো তৈরী করে। শর্করার সাথে নাইট্রোজেন বেসগুলি যুক্ত থাকে। RNA অণু একটা সূত্র দিয়ে তৈরী হলেও কখনও কখনও এই দীর্ঘ সূত্রটা কোন কোন জায়গায় ভাঁজ হওয়ার ফলে দ্বি-সূত্রযুক্ত দেখায় (চিত্র 89, 90) এইসব অংশে বেসগুলি জোড়ায় অবস্থান করতে পারে অর্থাৎ সাইটোসিন গুয়ানিনের সাথে ও অ্যাডিনিন ইউরাসিলের সাথে যুগ্ম অবস্থান কবতে পারে। বেসগুলি হাইড্রোজেন বণ্ডের মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে। RNA অণুর সব জায়গায় ভাঁজ হয় না বলে সম্পূর্ণ RNAটা কখনই দ্বিসূত্রযুক্ত অবস্থায় থাকে না।

RNA-র যে অংশটা ভাঁজ হয় না সেই অংশটা প্রসারিত অবস্থায় থেকে ভাঁজ অংশগুলিকে পৃথক করে রাখে (চিত্র 89A) কিম্বা ভাঁজহীন অংশটা ভাঁজযুক্ত অংশের বাইরের দিকে অসংখ্য ছোট ছোট লুপ (*loop*) বা ফাঁস গঠন করে (চিত্র 90)। বিভিন্ন ধরনের RNA-কে আণবিক ওজন, থিতানর (*sedimentation*) হার ও কাজের উপর ভিত্তি করে প্রধানতঃ তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(1) ট্র্যান্সফার RNA (*transfer* RNA বা t-RNA) বা পরিবহক RNA,

(2) মেসেঞ্জার RNA (*messenger* RNA বা m RNA) বা বার্তাবহ RNA,

(3) রাইবোসোমীয় RNA (*ribosomal* RNA বা r-RNA)

(1) পরিবহক RNA বা ট্র্যান্সফার RNA (t-RNA)

এই RNA-কে দ্রবীভূত RNA ও (*soluble* RNA বা s-RNA বা *adaptor* RNA) বলা হযে থাকে। মোট RNA-র 10—15 শতাংশ হ'ল পবিবহক RNA। এর আণবিক ওজন 23,000—28,000 এবং দৈর্ঘ্য প্রায় 250Å। একটা ট্র্যান্সফার RNA অণুতে 70—80টা নিউ-ক্লীওটাইড থাকে।

t-RNA-র একটা প্রান্তে সব সময় সাইটোসিন-সাইটোসিন-অ্যাডিনিন (-C-C-A) বেস থাকে (চিত্র 91)। প্রান্তের অ্যাডিনিন বেস অংশেই অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়। কোন কোন t-RNA-তে প্রান্তের -C-C-A আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। এইসব t-RNA অ্যামিনো
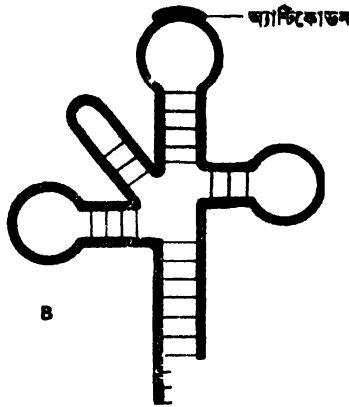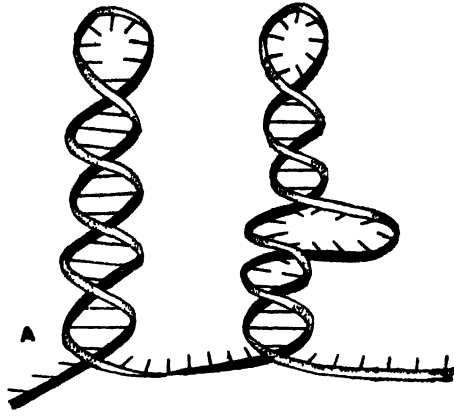
চিত্র 89
t-RNA-র গঠন
A -- t-RNA-র কোন কোন জায়গায় ভাঁজ হওয়ার ফলে বেসগুলি যুগ্ম অবস্থায় রয়েছে, ভাঁজহীন অংশটা প্রসারিত অবস্থায় রয়েছে; B — t-RNA অণুর একদিকে অ্যান্টিকোডন থাকে এই অ্যান্টিকোডনের সাহায্যে t-RNA m-RNA-র নির্দিষ্ট স্থানে যুক্ত হয়

অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হতে পারে না। এদের অকার্যকরী t-RNA বলে। বিভিন্ন এনজাইমের প্রয়োগ করে অকার্যকরী t-RNA-কে স্বাভাবিক কার্যকরী t-RNA-তে রূপান্তরিত করা যায়।

লুপ বা ফাঁস

ছোট লুপ (loop)

চিত্র 90
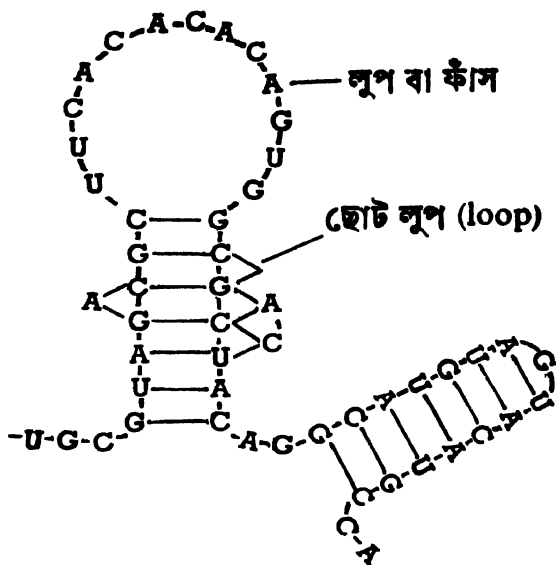
t-RNA-র একাংশের গঠন, এই অণুর কোন কোন জায়গায় ভাঁজ হয়েছে এবং ভাঁজহীন অংশগুলি লুপ বা ফাঁস গঠন করেছে

চিত্র 91
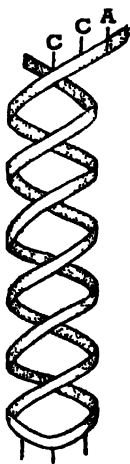
t-RNA-র গঠন,

এই অণুর একপ্রান্তে সব সময় -C-C-A বেস থাকে, এই প্রান্তের সাথেই নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়

ট্র্যান্সফার RNA-র সূত্রটা কোন কোন জায়গায় ভাঁজ অবস্থায় থাকে। এই-সব স্থানে পরিপূরক বেসগুলি যুগ্ম অবস্থান করে ও ঐসব স্থান দ্বিসূত্র-যুক্ত দেখায় (চিত্র 89A)।

ট্র্যান্সফার RNA বিভিন্ন রকমের হয়। প্রত্যেক অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট t-RNA থাকে। সুতরাং কোষের কুড়িটা অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য কুড়িটা বা তার চেয়ে বেশী সংখ্যক নির্দিষ্ট ট্র্যান্সফার RNA আছে। নির্দিষ্ট t-RNA নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে ঐ অ্যামিনো অ্যাসিডকে প্রোটীন উৎপাদনের স্থানে নিয়ে আসে। t-RNA-র একদিকে তিনটা বেস নিয়ে গঠিত অ্যান্টিকোডন থাকে (চিত্র 89B) এবং এই অংশটাই m-RNA-র নির্দিষ্ট স্থানে t-RNA-কে যুক্ত করে।

এই RNA DNA-র ছাঁচ থেকে তৈরী হয়। DNA-তে যে রকমের বেসগুলি থাকে t-RNA-তে তার পরিপূরক বেসগুলি থাকে। ট্র্যান্সফার RNA তৈরী হওয়ার পর সম্ভবতঃ এনজাইমের প্রভাবে -C-C-A প্রান্তটা গঠিত হয়।

(2) মেসেঞ্জার (*messenger*) *RNA* (*m-RNA*) **বা বার্তাবহ** *RNA*

মোট RNA-র 5 শতাংশ হল মেসেঞ্জার RNA। এই RNA-র আণবিক ওজন মোটামুটি 1000000 এবং প্রস্থ 10—15Å। এর দৈর্ঘ্য এক থেকে বহু সহস্র অ্যাংস্ট্রম পর্যন্ত হতে পারে। m-RNA সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণতঃ m-RNA ভাঁজ হয়ে দ্বি-সূত্রযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করে না। বার্তাবহ RNA নিউক্লীয়াসে ও সাইটোপ্লাজমে পাওয়া যায়। m-RNA প্রোটীনের সাথে একটা যৌগ (*complex*) গঠন করে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করতে পারে। এই যৌগকে ইনফর্মোসোম (*informosome*) বলে।

একই জীবের কিম্বা নিকট সম্পর্কীয় জীবের DNA এবং মেসেঞ্জার RNA-র (m-RNA) মধ্যে সংকর গঠনের প্রবণতা আছে। উত্তাপ প্রয়োগ করলে DNA-র সূত্র দুইটার মধ্যের হাইড্রোজেন বণ্ড ভেঙ্গে যায়। এই DNA-কে দ্রুত ঠাণ্ডা করলে কতকগুলি হাইড্রোজেন বণ্ড তৈরী হয় কিন্তু কিছু বেস আলাদা থাকে। এই বেসগুলি মেসেঞ্জার RNA-র সাথে যুক্ত হয়ে DNA-RNA সংকর গঠন করতে পারে।

মেসেঞ্জার RNA DNA-র ছাঁচের থেকে তৈরী হয়। DNA ছাঁচের বেসগুলির পরিপূরক বেস এই RNA-তে থাকে। যদি একটা DNA ছাঁচের বেসের বিন্যাস A-T-T-G-A-C- ইত্যাদি হয় তবে ঐ ছাঁচ থেকে তৈরী RNA-র বেসগুলি হবে U-A-A-C-U-G- ইত্যাদি। RNA তৈরীর

সময় DNA অণুর সূত্র দুইটার মাঝের হাইড্রোজেন বণ্ড ভেঙ্গে যায়। মুক্ত নিউক্লীওটাইডগুলি DNA সূত্রের যথাযথ স্থানে যুক্ত হয়ে m-RNA গঠন করে। এই m-RNA পরে সাইটোপ্লাজমে আসে ও প্রোটীন উৎপাদনে সাহায্য করে। প্রোটীনে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাস মেসেঞ্জার RNA-র মাধ্যমে DNA নিয়ন্ত্রণ করে। এই RNA DNA-র প্রোটীন উৎপাদনের সঙ্কেত বহন করে সাইটোপ্লাজমে নিয়ে আসে বলে Jacob ও Monod এদের বাতাবহ বা মেসেঞ্জার RNA নামকরণ করেন।

(3) **রাইবোসোমীয়** (*ribosomal*) *RNA* **বা** *r-RNA*

রাইবোসোমের RNA-কে রাইবোসোমীয় RNA বলে। r-RNA নিউক্লীয়াসে তৈরী হয় ও পরে সাইটোপ্লাজমে আসে। r-RNA ও t-RNA মাইটোকণ্ড্রিয়াতেও পাওয়া গিয়েছে। মোট RNA-র প্রায় ৮0 শতাংশ হল r-RNA। এর আণবিক ওজন 600000—1100000। আণবিক ওজন ও থিতানর (*sedimentation*) হারের উপর নির্ভর করে r-RNA-কে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। *Escherichia coli*-র 23S r-RNA-র আণবিক ওজন 1100000 এবং 16S RNA-র আণবিক ওজন 600000। r-RNA-র কোন কোন স্থানে ভাঁজ হয়ে দ্বিসূত্রযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। DNA ও r-RNA-র মধ্যে সংকর গঠিত হতে পারে। এই RNA-তে প্রচুর পরিমাণে গুয়ানিন ও সাইটোসিন থাকে। সম্ভবতঃ r-RNA ম্যাগনেসিয়াম বণ্ডের মাধ্যমে m-RNA ও t-RNA-কে রাইবোসোমের সাথে যুক্ত রাখে।

প্রোটীন (*Protein*)

প্রোটীনের আণবিক ওজন 10^5—10^6। প্রত্যেক প্রোটীন অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরী (চিত্র 93)। সব অ্যামিনো অ্যাসিডের একটা প্রান্তে অ্যামিনো গ্রুপ (*amino group*) অর্থাৎ NH_2 ও অন্য প্রান্তে একটা কার্বোক্সিল গ্রুপ (*carboxyl group*) অর্থাৎ COOH থাকে। একটা অ্যামিনো অ্যাসিডের NH_2 গ্রুপ অন্য অ্যামিনো অ্যাসিডের COOH গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়। এই বিক্রিয়ার (*reaction*) সময় একটা জলের অণু বের হয়ে যায় ও পেপটাইড বণ্ড (চিত্র 92) গঠিত হয়।

কুড়িটা বিভিন্ন রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডের নানা রকমের জোটের (*combination*) ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রোটীন গঠিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে ক্রোমোসোমে বেসিক ও অবেসিক প্রোটীন থাকে।

অ্যামাইড লিঙ্কেজ
পেপটাইড বণ্ড
$+ H_2O$
গ্লাইসিন অ্যালানিন গ্লাইসিল-অ্যালানিন
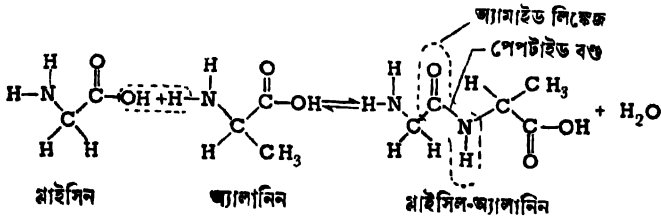
চিত্র 92
দুইটা অ্যামিনো অ্যাসিড—গ্লাইসিন ও অ্যালানিন পেপটাইড বণ্ডের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে

হিস্টোন (*histone*) সব জীবেই পাওয়া যায়। প্রোটামাইন (*protamine*) কোন কোন পাখী ও মাছে থাকে। এই দুই রকমের বেসিক প্রোটীনের মধ্যে হিস্টোনের গঠন বেশী জটিল। হিস্টোনে প্রধানতঃ আর্জিনিন (*arginine*) ও লাইসিন (*lysine*) প্রভৃতি অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। হিস্টোনের আণবিক ওজন প্রোটামাইনের তুলনায় বেশী। উচ্চতর জীবে DNA ও হিস্টোনের অনুপাত মোটামুটি 1:1 হয়। জীনের কাজ নিয়ন্ত্রণে হিস্টোনের সম্ভবতঃ একটা ভূমিকা আছে। প্রোটামাইন সরল ধরনের বেসিক প্রোটীন এবং এর আণবিক ওজন খুব কম। প্রোটামাইনে 90 শতাংশ আর্জিনিন থাকে।

আবেসিক প্রোটীনে ট্রিপ্টোফ্যান (*tryptophane*) বেশী থাকে ও আর্জিনিন কম থাকে। এই প্রোটীন ক্রোমাটিনে ও ইন্টারফেজ নিউ-ক্লীয়াসে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের কোষে এই প্রোটীনের পরিমাণের তারতম্য হয়। ব্যস্ত (*metabolically active*) কোষে প্রচুর পরিমাণে অবেসিক প্রোটীন পাওয়া যায়। কিছু অবেসিক প্রোটীন DNA-র সাথে যুক্ত থাকে। এছাড়া অন্যান্য প্রোটীন লবণ দিয়ে নিষ্কাষণ করার পর কিছু অবেসিক প্রোটীন অবশিষ্ট (অবশিষ্ট প্রোটীন) থাকে।

হেটারোক্রোমাটিন (*heterochromatin*) **ও ইউক্রোমাটিন** (*euchromatin*)

ক্রোমোসোমের একটা প্রধান উপাদান হল নিউক্লীক অ্যাসিড। নিউ-ক্লীক অ্যাসিড ক্রোমোসোমকে রঙ নিতে সাহায্য করে। একটা ক্রোমো-সোমের বিভিন্ন অংশের রঙ নেবার ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য দেখা যায় অর্থাৎ ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক গঠন এক হয় না। ক্রোমো-সোমের কোন অংশ স্বাভাবিক অংশের তুলনায় গাঢ় বা হালকাভাবে রঙ নিলে ঐ অবস্থাকে হেটারোপিকনোসিস (*heteropycnosis*) বলে। গাঢ়

চিত্র 93
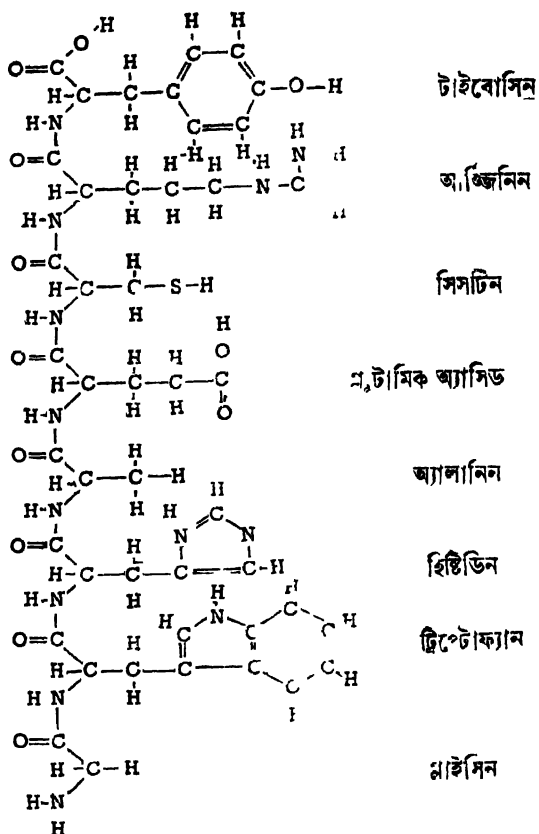
প্রোটীন অণুর একাংশ। প্রোটীন অণুর একপ্রান্তে সব সময় কার্বোক্সিল গ্রুপ (COOH) ও অপর প্রান্তে অ্যামিনো (NH) গ্রুপ থাকে

রঙ নিলে পজিটিভ (*positive*) বা ধনাত্মক হেটারোপিকনোসিস ও হালকা রঙ নিলে নেগেটিভ (*negative*) বা ঋণাত্মক হেটারোপিকনোসিস বলা হয়। একই ক্রোমোসোম কোষ বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতে পারে অর্থাৎ একই ক্রোমোসোমে কখনও পজেটিভ আবার কখনও বা নেগেটিভ হেটারোপিকনোসিস দেখা যায়। ক্রোমোসোমের যে অংশে কোন অবস্থাতে হেটারোপিকনোসিস দেখা যায় সে অঞ্চলকে হেটারোক্রোমাটিন বলে। ক্রোমোসোমের যে অংশে হেটারো-পিকনোসিস দেখা যায় না সে স্থানকে ইউক্রোমাটিন বলে। ক্রোমোসোমের

যেসব অংশ কোষ বিভাগের সব অবস্থাতেই গাঢ় রঙ নেয় ও ঘনীভূত অবস্থায় থাকে তাদের বর্ণনা করবার জন্য Heitz (1924-28) হেটারো-ক্রোমাটিন শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। ক্রোমোসোমের এই অংশে টেলোফেজ অবস্থায় পেঁচ খুলে যায় না। কিন্তু ক্রোমোসোমের ইউক্রোমাটিন অঞ্চলে টেলোফেজে স্বাভাবিকভাবে পেঁচ খুলে যায়। হেটারোক্রোমোসোম (*hetero-chromosome*) বা সেক্স ক্রোমোসোম থেকে হেটারোক্রোমাটিন শব্দটা নেওয়া হয়েছে কারণ সেক্স ক্রোমোসোম অন্য ক্রোমোসোমের চেয়ে বেশী রঙ নেয়। Darlington ও La Cour দেখেন যে হেটারোক্রোমাটিন অংশ মেটাফেজে নেগেটিভ হেটারোপিকনোসিস ও ইন্টাফেজ অবস্থায় পজেটিভ হেটারোপিকনোসিস দেখায়। এই রকমের আচরণকে অ্যালো-সাইক্লিক (*allocyclic*) আচরণ বলে। কোন কোন হেটারোক্রোমাটিন অংশ কোন অবস্থাতেই রঙ নেয় না, যেমন—সেকেণ্ডারী কনষ্ট্রিকশন অঞ্চল। অতএব হেটারোক্রোমাটিনের আচরণের তারতম্য হয়, যেমন— (*a*) সব অবস্থায় গাঢ় বর্ণ নেয় (Heitz যেমন দেখেছিলেন) বা (*b*) সব অবস্থায় বর্ণহীন দেখায় (যেমন সেকেণ্ডারী কনষ্ট্রিকশন অঞ্চল) কিম্বা (*c*) অ্যালোসাইক্লিক প্রকৃতির হয় (Darlington ও La Cour যেমন দেখেছিলেন)।

সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের জায়গায় হেটারোক্রোমাটিন থাকে। এছাড়া অন্যান্য স্থানে যেমন সেকেণ্ডারী কনষ্ট্রিকশন, সেক্স (Y) ক্রোমোসোম ইত্যাদিতে এবং কোন কোন জীবে ক্রোমোসোমের প্রান্ত ভাগে হেটারো-ক্রোমাটিন থাকে। *D. melanogaster* এর স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমো-সেণ্টার অঞ্চল হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরী।

হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলকে দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যেমন, গঠনকর বা অপরিহার্য (*constitutive*) হেটারোক্রোমাটিন এবং আনু-ষঙ্গিক বা ফ্যাকালটেটিভ (*facultative*) হেটরোক্রোমাটিন। দুইটা হোমোলোগাস (সমসংস্থ) ক্রোমোসোমের একই জায়গায় কনস্টিটিউটিভ বা অপরিহার্য হেটারোক্রোমাটিন উপস্থিত থাকে এবং এই হেটারোক্রোমাটিন উত্তরাধিকার সূত্রে এক বংশ থেকে পরের বংশে যায়। আনুষঙ্গিক বা ফ্যাকালটেটিভ হেটারোক্রোমাটিন দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের কেবল একটাতে দেখা যায়। এই ধরনের হেটারোক্রোমাটিন জীবের বৃদ্ধির কোন পর্যায়ে গঠিত হয় এবং স্বাভাবিক জীনের কাজকে কম বা বেশী সময়ের জন্য বন্ধ করে দেয়।

কনস্টিটিউটিভ বা অপরিহার্য হেটারোক্রোমাটিন ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে, যেমন, সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল, টেলোমিয়ার অঞ্চল, নিউক্লীওলাস

গঠনকারী অঞ্চল ইত্যাদি। সেন্ট্রোমিয়ারের দুই পাশে এই হেটারোক্রোমাটিন থাকে। এই অঞ্চল মেটাফেজে রঙ নেয় না। টেলোফেজের পর থেকে এই অঞ্চল রঙ নেয় এবং ইন্টারফেজ অবস্থায় গাঢ় বর্ণযুক্ত প্রোক্রোমোসোম হিসাবে দেখা দেয়। স্পিণ্ডিলে ক্রোমোসোমের সঞ্চলনকে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলের হেটারোক্রোমাটিন প্রভাবিত করতে পারে। *Drosophila melanogaster*-এর স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসেন্টার অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরী। কোন কোন উদ্ভিদে ক্রোমোসোমের প্রান্তের টেলোমিয়ার অঞ্চলের রঙ নেবার ক্ষমতা ক্রোমোসোমের অন্যান্য অংশের মত হয় না অর্থাৎ এই অঞ্চলটা হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরী। টেলোমিয়ার অঞ্চলটা আভ্যন্তরীণ কার্যকরী জীনকে রক্ষা করে। নিউক্লীওলাস গঠনকারী অঞ্চল বা সেকেন্ডারী কনষ্ট্রিকশন অঞ্চল কোষ বিভাগের কোন অবস্থাতেই রঙ নেয় না ও বর্ণহীন থাকে। এই অঞ্চলও কনস্টিটিউটিভ হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরী। ইউক্রোমাটিন অংশের মাঝে মাঝে ব্যান্ডের (*band*) আকারে হেটারোক্রোমাটিন থাকতে পারে। এদের মধ্যবর্তী বা *intercalary* হেটারোক্রোমাটিন বলা হয়। *Drosophila melanogaster*-এর ব্যান্ডগুলিতে এইরকম হেটারোক্রোমাটিন থাকে। এছাড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে সমগ্র ক্রোমোসোম হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়, যেমন, কোন কোন উদ্ভিদের সেক্স ক্রোমোসোম এবং অতিরিক্ত বা B-ক্রোমোসোম (যেমন রাইয়ে)।

আনুষঙ্গিক বা ফ্যাকালটেটিভ হেটারোক্রোমাটিন জীবের বৃদ্ধির সময় তৈরী হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের (*mammal*) স্ত্রীতে একটা X ক্রোমোসোম বৃদ্ধির সময় সম্পূর্ণভাবে হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়ে যায়। মানুষে, পুরুষদের XY সেক্স ক্রোমোসোম ও স্ত্রীদের XX সেক্স ক্রোমোসোম থাকে। পুরুষের X ক্রোমোসোম এবং স্ত্রীর একটা X ক্রোমোসোম ইউক্রোমাটিন প্রকৃতির থাকে। কিন্তু স্ত্রীতে জাইগোট থেকে ভ্রূণের পরিণতির সময় অন্য X ক্রোমোসোমটা পরিবর্তিত হয়ে হেটারোক্রোমাটিক (*heterochromatic*) প্রকৃতির হয়ে যায়। এই X ক্রোমোসোমটাকে হেটারোক্রোমাটিক X বা হট (*hot*) X বলা হয়। এই X ক্রোমোসোম সম্ভবতঃ কার্যকরী X ক্রোমোসোমের সাথে একটা ভারসাম্য বজায় রাখে কারণ যেসব অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে কয়েকটা X ক্রোমোসোম দেখা যায় সেখানেও কেবল একটা X ক্রোমোসোম কার্যকরী থাকে ও অন্যান্য X ক্রোমোসোমগুলি হেটারোক্রোমাটিক প্রকৃতির হয়। এছাড়া কোন কোন পোকার (যেমন, *Pseudococcus obscurus*) পুরুষে পিতার সব ক্রোমোসোমগুলি বৃদ্ধির সময় হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়ে যায়।

হেটারোক্রোমাটিন বিভিন্ন রকমের হয় এবং এজন্য এদের ধর্মেরও পার্থক্য দেখা যায়। হেটারোক্রোমাটিক অঞ্চল জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয় বলে আগেকার বিজ্ঞানীরা মনে করতেন কারণ এই অঞ্চলে কায়েসমা গঠিত হয় না এবং এই অঞ্চলের অবলুপ্তির ফলে জীবের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু পরে Muller-এর *Drosophila*-র উপর গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে সম্পূর্ণভাবে হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরী Y ক্রোমোসোমেও 'ববড্' চোখের জীন থাকে। এছাড়া পুরুষ পতঙ্গের উর্বরতার জন্য প্রয়োজনীয় জীনও Y ক্রোমোসোমে থাকে। মানুষের হেটারোক্রোমাটিক Y ক্রোমোসোমে রোমশ (*hairy*) কানের জীন অবস্থিত (Gates)। টমেটোতেও হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলে কার্যকরী জীন পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলেও কিছু কিছু কার্যকরী জীন থাকে। তবে ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের তুলনায় হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলে কার্যকরী জীনের সংখ্যা অনেক কম।

ক্রোমোসোমের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল খুব ঘনীভূত অবস্থায় থাকে (Ris ও Kubai, 1970) এবং এই অঞ্চলে ক্রোমাটিন সূত্রের পেঁচগুলি খুব কাছে কাছে থাকে। Coleman (1943) ও Ris (1945) মনে করেন যে যখন ইউক্রোমাটিন অংশে ক্রোমোনিমার পেঁচগুলি আলগা থাকে তখনও হেটারোক্রোমাটিন অংশের পেঁচগুলি খুব পাশাপাশি থাকে।

অপ্রয়োজনীয় জীনগুলি কিছু সময়ের জন্য হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়ে যেতে পারে। কোন কোন পতঙ্গে দেখা গিয়েছে যে ভ্রূণের পরিণতির সময় একটা ক্রোমোসোম হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়ে যায় এবং ঐ ক্রোমোসোমটা পরে আবার ইউক্রোমাটিন প্রকৃতির হয়। সুতরাং জীনের সাময়িক কর্মবিরতির সময় ঐ অঞ্চল হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হতে পারে।

তেজস্ক্রিয় থায়ামিডিন প্রয়োগ করে পরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের চেয়ে দেরীতে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের DNA দ্বিগুণ হয়। তবে ক্রোমোসোমের যেসব অঞ্চল কোন সময় ইউক্রোমাটিন প্রকৃতির এবং কখনও হেটারোক্রোমাটিন প্রকৃতির হয় সেখানের DNA অন্যান্য ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের DNA-র সাথে একই সময় দ্বিগুণ হয়।

ট্রান্সলোকেশনের ফলে বা অন্য কোন ভাবে যদি ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের কাছে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল যুক্ত হয় তবে ঐ হেটারোক্রোমাটিন নিকটবর্তী ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের জীনের প্রকাশকে প্রভাবিত করতে পারে। ভুট্টার Ac—Ds অঞ্চলে এইরকম অবস্থানের প্রভাব (*position effect*) দেখা গিয়েছে। কখনও কখনও আবার ইউক্রোমাটিন অঞ্চলের জীন পাশের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলকে প্রভাবিত করে। ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট

স্থানে অবস্থানকারী বিভিন্ন জীনের মধ্যে যে ভারসাম্য থাকে তা ব্যাহত হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ এইরকমের পরিবর্তন দেখা যায়।

যুগ্মতার ক্ষেত্রেও হেটারোক্রোমাটিনের সাথে ইউক্রোমাটিনের পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়েছে। হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলগুলির যুগ্ম অবস্থান করার প্রবণতা আছে। ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের বিভিন্ন ক্রোমোসোমের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল পরস্পর যুক্ত হয়ে ক্রোমোসেন্টার গঠন করে। সুতরাং এখানে ইউক্রোমাটিনের মত সুনির্দিষ্ট যুগ্মতা হয় না।

রঞ্জনরশ্মি (*x-ray*) এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন, ম্যালিক হাইড্রাজাইড (*malic hydrazide*) প্রয়োগ করলে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল সহজেই ভেঙ্গে যায়।

McClintock-এর মতে ক্রোমোসোমের কোন স্থানের মিউটেশন প্রবণতা ঐ স্থানে কি ধরনের ক্রোমাটিন আছে তার উপর নির্ভর করে।

হেটারোক্রোমাটিনের কাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। Darlington-এর মতে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হেটারোক্রোমাটিনের কিছু নির্বাচনী ক্ষমতা আছে, যদিও এই অঞ্চল অপরিহার্য নয়।

Mather-এর মতে প্রধান জীনগুলি (*oligogene*) যেগুলি ম্যান্ডেলীয় অনুপাত অনুযায়ী এক বংশ থেকে পরের বংশে যায় ও প্রধান প্রধান চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি ইউক্রোমাটিন অঞ্চলে থাকে। Mather (1943) ও Goldsmith-এর (1919) মতে হেটারোক্রোমাটিন অংশে অনেকগুলি জীন থাকে যাদের অল্প, একই ধরনের ও পরিপূরক প্রভাব আছে। একই উদ্ভিদের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায় তা এইসব জীনের জন্যই হয়। Mather এইসব জীন সমষ্টিকে পলিজীন (*polygene*) নাম দিয়েছেন।

Vanderlyn-এর (1949) মতে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল নিউক্লীয়ার মেমব্রেন বা নিউক্লীওলার মেমব্রেনের কাছে থাকে এবং নিউক্লীয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে RNA র সঞ্চলনকে সাহায্য করে। আঁখের B ক্রোমোসোমের বিভাগ থেকে মনে করা হয় যে অতিরিক্ত পরিমাণ হেটারোক্রোমাটিন কখনও কখনও কোষ বিভাগকে উদ্দীপিত করে।

জেনেটিক পদার্থ হিসাবে *DNA*

আগে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে জেনেটিক পদার্থ বা জীন হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

(A) Mazia, Mirsky প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণের মতে নিউক্লীক অ্যাসিডই হ'ল জেনেটিক পদার্থ। অনেকে এই মতের প্রতিবাদ করেছিলেন কারণ তাঁরা মনে করতেন যে—

(*a*) নিউক্লীক অ্যাসিড কোষের সব অবস্থায় বর্তমান থাকে না। কোষ বিভাগের কোন কোন পর্যায়ে কেবল এদের দেখা যায়।

(*b*) নিউক্লীক অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠনে বিভিন্নতা (*variability*) দেখা যায় না।

(B) Frey-Wyssling ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন যে প্রোটীনই হচ্ছে জীনীয় বস্তু এবং পলিপেপটাইড চেনে (শৃঙ্খল) বিভিন্ন রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতির জন্য জীনে বিভিন্নতা দেখা যায়।

(C) Schultz, Serra প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতে নিউক্লীও-প্রোটীনের অণু সামগ্রীকভাবে জীনের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীনের ও নিউ-ক্লীও-প্রোটীনের স্বজননের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে।

আধুনিক কালের নানা গবেষণা বিশেষ করে Avery-র নিউমোকক্কাসের রূপান্তরের (*Pneumococcal transformation*) আবিষ্কার থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে DNA-ই হচ্ছে জেনেটিক পদার্থ।

কোন বস্তুকে বংশধারার বাহক হতে হলে তার কতকগুলি বিশেষ ধর্ম থাকা দরকার। এই ধর্মগুলি হচ্ছে – (*a*) কোষের সব অবস্থায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, (*b*) স্ব-দ্বিগুণতায় (*self duplication*) সক্ষম হওয়া দরকার, (*c*) রাসায়নিক বিভিন্নতা (*chemical variability*) থাকা দরকার, (*d*) জেনেটিক তথ্যের বাহক হওয়া প্রয়োজন।

আধুনিক কালের বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে এইসব ধর্মই DNA র আছে। Mazia, Mirsky ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে DNA ই হচ্ছে জেনেটিক বস্তু। এই বস্তুই বিভিন্ন জীনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। মর্স কোডের (*Morse code*) বিভিন্ন বার্তা যেমন কেবল 'ডট' (*dot*) ও 'ড্যাসের (*dash*) উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় ঠিক তেমনিভাবে DNA-র বার্তা চারটা প্রধান বেস জোড়ার (A–T, G–C, T–A, C–G) উপর নির্ভরশীল।

যেসব বিভিন্ন প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে DNA-ই জেনেটিক বস্তু তার কতকগুলির বিবরণ দেওয়া হল।

1 (*a*) **নিউমোকক্কাসের রূপান্তর** (*Pneumococcal transformation*)

নিউমোনিয়া সৃষ্টিকারী ব্যাক্টিরিয়া *Diplococcus pneumoniae*-র [সাধারণতঃ নিউমোকক্কাস (*pneumococcus*) বলা হয়ে থাকে] বিভিন্ন রকমের স্ট্রেন (*strain*) হয়। Griffith 1928 খৃষ্টাব্দে দেখেন যে রোগ সৃষ্টিকারী নিউমোকক্কাসের কোষের চারিদিকে একটা আবরণ বা ক্যাপসিউল (*capsule*) থাকে। কোন কোন বিশেষ ধরনের *D. pneumoniae*-তে কোন আবরণ বা ক্যাপসিউল থাকে না কারণ এরা

িটরিয়ার কোষটাকে ধ্বংস ক'রে দেয়। যেসব ব্যাকটিরিয়ায় এইরকমের প্রোফাজ থাকে তাদের লাইসোজেনিক (*lysogenic*) ব্যাকটিরিয়া এবং ঐ প্রোফাজকে টেম্পারেট (*temparate*) ফাজ বলে। এই টেম্পারেট ফাজ প্রথম ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের DNA-র একটা অংশ আক্রমণের দ্বারা দ্বিতীয় ব্যাকটিরিয়ায় সঞ্চারিত করতে পারে। এইভাবে দুইটা ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের মধ্যে রিকম্বিনেশন (*recombination*) হতে পারে। প্রোফাজের DNA-র আচরণ এবং ব্যাকটিরিয়ার ক্রোমোসোমের সাথে অবস্থান এর (প্রোফাজের DNA) জীন প্রকৃতি নির্দেশ করে।

(4) *DNA* ও **ক্রোমোসোমের অখণ্ডতা**

ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোমে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লীয়েজ দিলে ঐ ক্রোমোসোমটা ভেঙে যায়। কিন্তু প্রোটীয়েজ বা রাইবোনিউক্লীয়েজ প্রয়োগ করলে ঐ সূত্রটা ভেঙে যায় না। এর থেকে বোঝা যায় ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোসোমের সূত্রগুলি DNA দিয়েই তৈরী। এই ক্রোমোসোমের দীর্ঘ লুপ (*loop*) বা ফাঁসগুলির কাছে RNA তৈরী হতে দেখা গিয়েছে এবং এই RNA সাইটোপ্লাজমে যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে DNA থেকেই RNA তৈরী হয়।

(5) *DNA*-**র পরিমাণ**

Mirskey ও Allfrey দেখেন যে কোন একটা প্রজাতির প্রত্যেক ডিপ্লয়েড কোষে একই পরিমাণ DNA থাকে। ঐ উদ্ভিদের হ্যাপ্লয়েড নিউক্লীয়াসে এর অর্ধেক পরিমাণ এবং টেট্রাপ্লয়েড নিউক্লীয়াসে ডিপ্লয়েড নিউক্লীয়াসের দ্বিগুণ পরিমাণ DNA পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক ক্রোমোসোম সেটের (*set*) জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ DNA থাকে। হ্যাপ্লয়েড নিউক্লীয়াসের মোট জীন সংখ্যা ডিপ্লয়েড নিউক্লীয়াসের জীন সংখ্যার অর্ধেক। সুতরাং DNA ও জীনের মধ্যে একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক নিউক্লীয়াসে DNA-র নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে বোঝা যায় যে এই অণুগুলি রাসায়নিকভাবে অত্যন্ত স্থায়ী।

(6) 1953 খৃষ্টাব্দে Watson, Crick ও Wilkin-এর বর্ণিত DNA-র গঠন থেকে জীনের স্ব-জনন, মিউটেশন ইত্যাদি সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। DNA অণুর পলিনিউক্লীওটাইড সূত্রে পিউরিন বা পিরিমিডিন বেসের ক্রম যে কোন ভাবে থাকতে পারে। যেমন থাইমিনের পর অ্যাডিনিন কিম্বা গুয়ানিন অথবা সাইটোসিন কিম্বা থাইমিন থাকতে পারে। একটা পলিনিউক্লীওটাইড সূত্রে অসংখ্য নিউক্লীওটাইড থাকে ব'লে

বেসের বিভিন্ন রকমের বিন্যাস সম্ভব। বেসের এই অসংখ্য রকমের বিন্যাসের জন্য DNA-এ অণুতে বিভিন্নতা (*variation*) দেখা যায়।

DNA স্ব-জনন করতে পারে অর্থাৎ একটা DNA থেকে একই গঠনের DNA তৈরী হয়ে থাকে।

কখনও কখনও DNA-র ছাঁচ থেকে পরিপূরক নিউক্লীওটাইড গঠনের সময় ভ্রান্ত প্রতিলিপি (*mis-copy*) হয়। যেমন অ্যাডিনিন থাইমিনের সাথে যুক্ত না হয়ে অন্য পিরিমিডিন বেস সাইটোসিন সাথে যুক্ত হতে পারে। বেসের এই পরিবর্তনের ফলে মিউটেশন হয়। কোন বেস জোড়া দ্বিগুণ হ'লে বা বাতিল হয়ে গেলেও মিউটেশন দেখা দেয়।

Crick-এর মতে বেসের সঠিক বিন্যাস একটা জীনীয় সঙ্কেত বা জেনেটিক কোড (*genetic code*) গঠন করে। এই সঙ্কেতের মাধ্যমে জীনীয় বার্তা সাইটোপ্লাজমে আসে ও কোষস্থ বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রোটীন উৎপাদন একটা জীন নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে DNA প্রোটীনের বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। RNA DNA-র থেকে তৈরী হয়। DNA-র প্রোটীন উৎপাদনের সঙ্কেত m-RNA সাইটোপ্লাজমে নিয়ে আসে ও প্রোটীন উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

এইসব বিভিন্ন তথ্য থেকে বোঝা যায় যে DNA-ই হ'ল জেনেটিক পদার্থ এবং এটাই কোষের সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

দশম অধ্যায়

ক্রোমোসোমের পরিবর্তন (মিউটেশন)

আকস্মিক বংশগত পরিবর্তনকে মিউটেশন (*mutation*) বলা হয়। এইরকম পরিবর্তনের ফলে কোন জীবে নূতন চরিত্র দেখা দিতে পারে। জীবের বৃদ্ধির সময় প্রত্যেক জীন অসংখ্যবার বিভক্ত হয়। সাধারণতঃ এইসব বিভাগ যথাযথভাবে হওয়ার ফলে অপত্য জীন মাতৃজীনের অনুরূপ হয়। কিন্তু আকস্মিকভাবে কোন বিভাগের সময় গোলযোগ দেখা দিলে পরিবর্তিত জীনের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মিউটেশন হয়।

1901 খৃষ্টাব্দে de Vries *Oenothera lamarckiana*-এ মিউটেশন আবিষ্কার করেন। তিনি *O. lamarckiana*-এ বিভিন্ন রকমের মিউটেশন পেয়েছিলেন। একটা মিউটেশনের ফলে গাছটা খুব বড় হয়েছিল। তিনি এই গাছটাকে '*gigas*' নাম দিয়েছিলেন। আরেকটা মিউটেশনের জন্য খর্বাকৃতির বা '*nanella*' ধরনের *O. lamarckiana*-র সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অন্যান্য ধরনের মিউটেশনের জন্য *O. lamarckiana*-র বিভিন্ন অঙ্গের আকার, আয়তন কিম্বা বর্ণের তারতম্য হয়। পরে জানা গিয়েছে যে de Vries-এর বর্ণিত *Oenothera*-র মিউটেশনগুলি বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের জন্য হয়েছিল।

মিউটেশন ছোট বা বড় সব রকমেরই হয়। কখনও কখনও বড় মিউটেশনের জন্য মাতাপিতার থেকে অপত্য উদ্ভিদের চরিত্রের অনেক তফাৎ দেখা যায় আবার কখনও বা মিউটেশনটা এত ছোট হয় যে তা সহজে চোখেই পড়ে না। মিউটেশনের ফলে যে কোন চরিত্রের পরিবর্তন হতে পারে। বেশীরভাগ মিউটেশনই ক্ষতিকর। তবে কখনও কখনও মিউটেশনের ফলে অনুকূল চরিত্রেরও সৃষ্টি হয়। ক্ষতিকর মিউটেশনযুক্ত জীব স্বাভাবিক জীবের সাথে প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য হয়ে বাতিল হয়ে যায়। সাধারণতঃ মিউটেশনের ফলে কোন জীবের প্রাণশক্তি কমে যায়।

মিউটেশনকে দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(1) জীন মিউটেশন—

জীনের প্রকৃতির পরিবর্তন হ'লে তাকে জীন মিউটেশন (*gene mutation*) বলে। জীন মিউটেশনের ফলে ক্রোমোসোমের কেবল একটা

নির্দিষ্ট স্থানে পরিবর্তন হয় ব'লে এইরকম মিউটেশনকে পয়েন্ট (*point*) মিউটেশনও বলা হয়।

(২) ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন দুই রকমের হয়, যেমন—

(*a*) ক্রোমোসোমের সংখ্যার পরিবর্তন।

(*b*) ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অংশের বিন্যাসের পরিবর্তন

ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলাচনা করা হয়েছে।

ক্রোমোসোমীয় মিউটেশনের ফলে জীনের সংখ্যার কিম্বা অবস্থানের পরিবর্তন হয় কিন্তু জীনের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং নূতন ধরনের জীন কেবল জীন মিউটেশনের মাধ্যমেই গঠিত হয় এবং ক্রমবিকাশে এই মিউটেশনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মিউটেশনের হার নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। কোন কোন মিউটেশনের ফলে এত কম পরিবর্তন হয় যে তা সহজে চোখে পড়ে না। সম্ভবতঃ এইরকম ছোট মিউটেশন সবচেয়ে বেশী হারে হয়। বিভিন্ন জীবে এবং একই জীবের ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোসোমে মিউটেশনের হারের তারতম্য হয়। মিউটেশনের হার নির্দিষ্ট প্রজাতি, জেনেটিক গঠন, জীনের প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন জীনে অন্য জীনের তুলনায় বেশী হারে মিউটেশন হয়। যেসব জীনে খুব সহজেই মিউটেশন হয় তাদের মিউটেশনপ্রবণ (*mutable*) জীন বলে। Emerson (1914) দেখেন যে ভুট্টায় সাদা বীজত্বকের নিয়ন্ত্রণকারী রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন) জীনটায় সহজেই মিউটেশন হওয়ায় ঐ জীনটা ডমিন্যান্ট (প্রবল) জীন লালে পরিবর্তিত হয়। এইরকম মিউটেশনের জন্য সাদা বীজত্বকের মধ্যে লাল দাগের সৃষ্টি হয়।

Delphinium-এ এরকম মিউটেশনপ্রবণ জীনের প্রভাবে গোলাপী ফুলের মধ্যে *purple* (লালচে বেগুনী) ছিট দেখা দেয়। রিসেসিভ জীন গোলাপী-'a' হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকার জন্য গোলাপী রঙের ফুলের সৃষ্টি হয়। মিউটেশনের ফলে এটা ডমিন্যান্ট জীনে পরিবর্তিত হলে "পারপেল" রঙের সৃষ্টি হয়। ফুলের পরিণতির সময় যত আগে এই মিউটেশন হয় ততই "পারপেল" (*purple*) দাগগুলি বড় দেখায়। জনন কোষেও এই গোলাপী-'a' জীনেব মিউটেশন দেখা গিয়েছে। *Mirabilis*-এও এই ধরনের মিউটেশনপ্রবণ জীনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়েছে। *Mirabilis*-এ মিউটেশনপ্রবণ জীনের প্রভাবে সাদা ফুলে লাল দাগ দেখা যায়।

মিউটেশনপ্রবণ জীন কখনও কখনও দ্বিতীয় মিউটেশনের ফলে স্বাভাবিক

অবস্থায় ফিরে আসে। এইরকমের মিউটেশনকে পূর্বানুবৃত্তিসম্পন্ন (*reverse*) মিউটেশন কিম্বা ফিরতি (*back*) মিউটেশন বলা হয়। *Drosophila*, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদিতে রিভার্স মিউটেশন দেখা গিয়েছে। স্বাভাবিক ব্যাকটিরিয়া স্ট্রেপটোমাইসিনের সরবরাহ ছাড়াই বাড়তে পারে। একটা মিউটেশনের ফলে কোন ব্যাকটিরিয়াটা স্ট্রেপটোমাইসিনবিহীন মাধ্যমে বাড়তে পারে না। কখনও কখনও ফিরতি মিউটেশনের ফলে স্ট্রেপটোমাইসিন নির্ভরশীল ব্যাকটিরিয়াটা স্ট্রেপটোমাইসিনবিহীন মাধ্যমে বাড়তে পারে অর্থাৎ তারা স্বাভাবিক ব্যাকটিরিয়ায় পরিবর্তিত হয়।

বিভিন্ন জীবে মিউটেশনের হারের যথেষ্ট তারতম্য হয়। Dobzhansky-র মতে *Drosophila*-এ প্রতি বংশে জীন মিউটেশনের হার হ'ল 10^{-5}। ছত্রাক *Neurospora*-এ মিউটেশনের হার হ'ল 3×10^{-8} থেকে 8×10^{-6}। মানুষে হোমোফিলিয়ার জন্য দায়ী মিউটেশনযুক্ত জীন প্রতি বংশে 10^{-5} থেকে 5×10^{-6} হারে দেখা দেয়। বিভিন্ন জীনের মিউটেশনের হার পরিবেশ দিয়ে প্রভাবিত হয়। বেশী তাপমাত্রায় ক্ষতিকর মিউটেশনের সংখ্যা বাড়ে। রঞ্জনরশ্মি (*x-ray*), অতি বেগুনী রশ্মি (*ultra-violet ray*), কিম্বা রেডিয়াম ইত্যাদি বিকিরণের প্রভাবে মিউটেশনের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় একটা জীনের মিউটেশন প্রবণতা অন্য জীন দিয়ে প্রভাবিত হয়। ভুট্টায় জীন *Dt*-র (*dotted*) প্রভাবে জীন a_1 (সবুজ উদ্ভিদ) সহজেই জীন A_1-এ (পারপেল উদ্ভিদ) পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য উদ্ভিদে এবং *Drosophila melanogaster*-এও একটা জীন অন্য জীনের মিউটেশন প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। বেশীর ভাগ জীন মিউটেশনই রিসেসিভ বা প্রচ্ছন্ন হয়। এজন্য হোমোজাইগাস অবস্থায় না থাকলে এইরকম মিউটেশন অপ্রকাশিতই থেকে যায়। তবে সেক্স ক্রোমোসোমে রিসেসিভ মিউটেশন হ'লে তা অসমগ্যামীয় অর্থাৎ *heterogametic* (যেমন XY বা ZW) সদস্যে প্রকাশ পায়। অটোসোমে রিসেসিভ মিউটেশন হ'লে তা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বংশের আগে প্রকাশিত হয় না।

উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীবন চক্রের যে কোন অবস্থায় মিউটেশন হতে পারে। রেণুধর উদ্ভিদ (*sporophyte*) বা লিঙ্গধর উদ্ভিদ (*gametophyte*), দেহ কোষে কিম্বা জনন কোষে মিউটেশন হয়ে থাকে। মিউটেশনযুক্ত কোষ থেকে সৃষ্ট সব কোষেই মিউটেশন দেখা যায়। দেহ কোষে মিউটেশন হ'লে তাকে সোমাটিক মিউটেশন (*somatic mutation*) বলে। সোমাটিক মিউটেশন সাধারণতঃ ঐ জীবের মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। তবে কিছু উদ্ভিদে এইরকম মিউটেশন অঙ্গজ জননের মাধ্যমে স্থায়ী

করা সম্ভব হয়েছে। কমলা লেবু, পীচ ইত্যাদিতে এইভাবে সোমাটিক মিউটেশন রক্ষা করা হয়েছে। মুকুলের ভাজক কলায় (*meristemetic tissue*) মিউটেশন হলে ঐ মিউটেশনকে মুকুল মিউটেশন (*bud mutation*) বলে। মিউটেশন স্বাভাবিক কিম্বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হতে পারে। কৃত্রিম বা স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিকর কিম্বা অনুকূল দুই রকমের মিউটেশনই তৈরী হয়। তবে কৃত্রিম উপায়ে অনেক বেশী সংখ্যায় মিউটেশন দেখা দেয়।

প্রাকৃতিক গামা (γ) ও কসমিক রশ্মির প্রভাবে কেবল অল্প পরিমাণ (0.1 শতাংশ) মিউটেশন হয়। কৃত্রিম উপায়ে রঞ্জনরশ্মি, অতি বেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করে, তাপমাত্রার পরিবর্তন করে, বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক বস্তু যেমন মাস্টারড্ গ্যাস, প্যারাক্সাইড ইত্যাদি প্রয়োগ করে মিউটেশনের সৃষ্টি করা হয়।

Muller 1927 খৃষ্টাব্দে *Drosophila*-এ রঞ্জনরশ্মির প্রয়োগ করে প্রথম কৃত্রিম মিউটেশনের সৃষ্টি করেছিলেন। Stadler (1928) যবে (*Avena*) রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করে মিউটেশন পেয়েছিলেন। এর পর বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীতে রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে কৃত্রিম মিউটেশনের সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্নভাবে রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করা হয়। উদ্ভিদে বীজে, অঙ্কুরিত বীজে, মুকুলে, পরাগরেণুতে বিকিরণ দেওয়া হয়। প্রাণীতে শুক্রাণু, ডিম্বাণুতে এবং কখনও কখনও দেহ কোষেও বিকিরণ দেওয়া হয়ে থাকে। রঞ্জনরশ্মির মাত্রার উপর মিউটেশনের হার নির্ভর করে। রঞ্জন এককের (বা r-একক) মাধ্যমে রঞ্জনরশ্মির পরিমাপ করা হয়। বিকিরণের শক্তি কম বেশী করে বা প্রয়োগের সময়ের তারতম্য ঘটিয়ে r-এককের পরিবর্তন করা যায়। Muller দেখেন যে রঞ্জনরশ্মির মাত্রা যত বাড়ান যায় ততই মিউটেশনের হার বাড়ে। বিকিরণের ফলে বিভিন্ন বকমের মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। কিছু মিউটেশন প্রাণনাশক (*lethal*) হয় অর্থাৎ এর প্রভাবে ঐ জীবটা বেঁচে থাকতে পারে না। অন্যান্য মিউটেশনের ফলে কোন চরিত্রের পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাণনাশক মিউটেশনের সাহায্যে মিউটেশনের হার সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। প্রাণনাশক মিউটেশনের হারের উপর রঞ্জনরশ্মির মাত্রার প্রভাব সরাসরিভাবে আনুপাতিক। রঞ্জনরশ্মির প্রভাবে বেশ কিছু ক্রোমোসোমীয় মিউটেশনের (ডিফিসিয়েন্সি, ডুপ্লিকেশন, ট্র্যান্সলোকেশন ও ইনভারশন) সৃষ্টি হয়। এইরকমের ক্রোমোসোমীয় অস্বাভাবিকতায় সাধারণতঃ ক্রোমোসোমের দুইটা স্থানে ভেঙ্গে যায়। এজন্য ক্রোমোসোমীয় মিউটেশনের শতকরা হার রঞ্জনরশ্মির মাত্রার বর্গের (*square*) সাথে আনুপাতিক। জীন মিউটেশনের

ফলে কেবল একটা স্থানে পরিবর্তন হয় বলে এরকম মিউটেশনের হার রঞ্জনরশ্মির মাত্রার সাথে সরাসরি আনুপাতিক হয়।

রঞ্জনরশ্মি ছাড়া অন্যান্য ধরনের বিকিরণ প্রয়োগ করেও মিউটেশনের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। রেডিয়াম থেকে আলফা (α), বিটা (β) ও গামা রশ্মি (γ) বিকীর্ণ হয়। আলফা ও বিটা রশ্মিকে রূপার চাদর সম্পূর্ণভাবে বাঁধা দেয় সেজন্য রেডিয়াম কোন রৌপ্যপাত্রে রাখলে কেবল গামা রশ্মি ঐ পাত্রের বাইরে আসতে পারে। গামা রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রঞ্জনরশ্মির চেয়ে কিছু কম। Blakeslee ও Gager গামা রশ্মি প্রয়োগ করে জীন মিউটেশন ও ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন পেয়েছিলেন।

আলফা রশ্মি ও নিউট্রনের বিকিরণের প্রভাবেও মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। নিউট্রনের প্রভাবে পুরুষ *Habrobracon*-এ ডমিন্যান্ট প্রাণনাশক (*lethal*) মিউটেশন পাওয়া গিয়েছে।

এছাড়া অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবেও মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। অতি বেগুনী রশ্মির ভেদ্যতা খুব কম হওয়ায় এরা বেশীরভাগ জীব দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য খুব ছোট জীবাণুতে এই রশ্মি সহজেই প্রবেশ করে ও এর প্রভাবে যথেষ্ট সংখ্যক মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে সাধারণতঃ জীন মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। Stadler দেখেন যে ভুট্টার পরাগরেণুতে 1800 থেকে 3100Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে মিউটেশনের সৃষ্টি হয় তবে ২600Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মিই সবচেয়ে বেশী কার্যকরী।

ব্যাকটিরিয়ায় পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে অনেক সময় অতি বেগুনী রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব আলো রোধ করতে পারে এবং এই প্রক্রিয়াকে আলোক প্রতিক্রিয়া (*photoreactivation*) বলে। কম মাত্রার অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে মিউটেশনের হার বিকিরণের পরিমাণের আনুপাতিক হারে বাড়ে। অতি বেগুনী রশ্মির পরিমাণ আরো বাড়ালে মিউটেশনের হার ধীরে ধীরে বাড়ে এবং বেশী মাত্রার অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে মিউটেশনের হার কমে যেতে পারে।

বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবেও মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। Auerbach ও Robson মাস্টারড গ্যাসের [$(ClCH_2CH_2)S$] ব্যবহার করে মিউটেশন পেয়েছিলেন। মাস্টরড গ্যাসের প্রভাবে সব রকমের মিউটেশনই হয় তবে ক্রোমোসোমের বড় অংশের রদবদল কম দেখা যায়। এই গ্যাসের প্রভাব অনেক সময় দেরীতে প্রকাশ পায়।

অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ, যেমন— প্যারাক্সাইড, ফরমালডিহাইড, পারমাঙ্গানেট, ক্যাফিন, ইউরেথেন ইত্যাদির প্রভাবেও মিউটেশন হয়। তবে

মাস্টারড গ্যাস ও প্যারাক্সাইড হ'ল শক্তিশালী মিউটেশন সৃষ্টিকারী পদার্থ। কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ জীবের বৃদ্ধির একটা বিশেষ পর্যায়ে কার্যকরী হয়। কতকগুলি পদার্থ আবার একটা জীবে মিউটেশন সৃষ্টি করে কিন্তু অন্য জীবে এদের কোন প্রভাব থাকে না। রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে বিভাজনশীল কোষে অবিভাজনশীল কোষের তুলনায় বেশী হারে মিউটেশন দেখা যায়।

তাপমাত্রার প্রভাবেও মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। Muller দেখেন যে তাপমাত্রা বাড়ালে মিউটেশন হয়। Plough, Child, Ives তাপমাত্রার পরিবর্তন করে *Drosophila*-এ মিউটেশন পেয়েছিলেন। তাঁরা দেখেন যে তাপমাত্রা বাড়ালে প্রাণনাশক (*lethal*) মিউটেশনের সংখ্যাও বাড়ে। বিভিন্ন অঞ্চলের ড্রসোফিলার উপর তাপমাত্রার প্রভাবের তারতম্য হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ক্রোমোসোমে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় মিউটেশনের হারের পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণতঃ তাপমাত্রা বাড়ালে মিউটেশনের হার বাড়ে কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। *Portulacca grandiflora*-এ তাপমাত্রা বাড়ালে কোন কোন জীনের মিউটেশনের হার কমে যায় (Laberge, Beale)। ভুট্টায়ও কোন কোন জীনে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে মিউটেশনের হার কমে যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে বেশী উত্তাপ বা তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন হ'লে মিউটেশনের হার বাড়ে। সেজন্য শীত প্রধান দেশের চেয়ে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অনেক বেশী সংখ্যক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া যায়। প্রায় 80% সরীসৃপের প্রজাতি ও 58% স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতি উষ্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন উপায়ে মিউটেশনের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। এখানে কতকগুলি প্রচলিত পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

1 যুক্ত-*X*-পদ্ধতি

Drosophila melanogaster-এর যেসব রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন) মিউটেশনের ফলে ফেনোটাইপ পরিবর্তিত হয় সেরকম মিউটেশনের উপস্থিতি যুক্ত-X পদ্ধতিতে বোঝা যায়। ড্রসোফিলার যুক্ত-X বংশে দুইটা X-ক্রোমোসোম পরস্পর যুক্ত অবস্থায় থাকে ও মায়োসিসের সময় একই মেরুতে যায়। যুক্ত-X স্ত্রী পতঙ্গে XXY ক্রোমোসোম থাকে। এইরকম স্ত্রী পতঙ্গের সাথে স্বাভাবিক পুরুষ পতঙ্গের (XY) মিলনের ফলে চার রকমের পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই পতঙ্গগুলি হ'ল— যুক্ত-X-স্ত্রী (XXY), স্বাভাবিক পুরুষ (XY), ট্রিপলো X স্ত্রী (XXX, *super female*) এবং

"বার" ও অ্যাপ্রিকট রঙের চোখ দেখা যায়। F_1-এর অর্ধেক স্ত্রী ও পুরুষে "বার" ও অ্যাপ্রিকট ধরনের চোখ থাকে। বিকিরণের ফলে কোন প্রাণনাশক মিউটেশন না হ'লে F_1-এ স্ত্রী ও পুরুষ ড্রসোফিলার অনুপাত হবে 1:1। কিন্তু কোন প্রাণনাশক (*lethal*) মিউটেশনের উপস্থিতিতে স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত ২:1 হয়, কারণ এইরকমের মিউটেশন হ'লে অর্ধেক পুরুষ প্রাণনাশক জীনের প্রভাবে বাঁচতে পারে না।

মিউটেশনের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। প্রধান দুইটা মতবাদ হ'ল—(1) প্রত্যক্ষ আঘাতের মতবাদ এবং (২) রাসায়নিক মতবাদ।

1. প্রত্যক্ষ আঘাতের মতবাদ (*Direct hit theory*) বা টারগেট থিওরী (*Target theory*)

রঞ্জন রশ্মি বা অন্যান্য বিকিরণ প্রয়োগ করলে ঐ রশ্মির ইলেকট্রনগুলি প্রত্যক্ষভাবে জীনকে আঘাত করে ও এর ফলে জীন মিউটেশন হয়। ইলেকট্রনের আঘাতের ফলে জীনে রাসায়নিক পরিবর্তন হয় এবং পরিশেষে কোন চরিত্রের পরিবর্তন হয়ে থাকে। Timoféeff-Ressovsky, Zimmer, Delbrück (1935), Lea (1936), Catcheside (১948) প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ প্রত্যক্ষ আঘাতের মতবাদ সমর্থন করেন। এই মতবাদ সঠিক হ'লে ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বাড়বে আঘাতের সংখ্যাও তত বেশী হবে এবং মিউটেশনের হারও বৃদ্ধি পাবে। ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমে রঞ্জনরশ্মির মাত্রা ও মিউটেশনের সংখ্যার মধ্যে এইরকম সম্পর্ক লক্ষ্য করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলেই কেবল মিউটেশনের সৃষ্টি হ'লে সব ধরনের (স্ট্রেইন) *Drosophila melanogaster*-এ একই মাত্রার রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করলে সমসংখ্যক মিউটেশন দেখা দিত। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের *D. melanogaster*-এ একই মাত্রার বিকিরণ দিলে মিউটেশনের হারের পার্থক্য দেখা যায়। এছাড়া এই মতবাদ অনুসারে বিকিরণের সময়ের পরিবেশ বা ঐ জীবের দৈহিক অবস্থা মিউটেশনের হারকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু Thoday, Giles, Riley এবং Becker দেখেন যে অক্সিজেন বা বাতাসের উপস্থিতিতে বিকিরণ দিলে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেনযুক্ত পরিবেশে বিকিরণের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় মিউটেশন তৈরী হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ আঘাত ছাড়াও অন্য কোন প্রক্রিয়া মিউটেশন সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

২. পরোক্ষ বা রাসায়নিক মতবাদ (*Indirect* বা *Chemical theory*)

এই মতবাদ অনুসারে বিকিরণের ফলে কোষে রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ায় মিউটেশনের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বিকিরণ পরোক্ষভাবে মিউটেশন

তৈরী করে। এই মতবাদের সাহায্যে ড্রসোফিলার বিভিন্ন স্ট্রেইনে একই মাত্রার রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করে যে মিউটেশনের হারের তারতম্য হয় তা ব্যাখ্যা করা যায়। একই প্রজাতির বিভিন্ন স্ট্রেইনে (*strain*) কোষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ আলাদা হতে পারে, ফলে রঞ্জনরশ্মির প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন রকমের রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ায় মিউটেশনের হারও এক হয় না। Rhoades ভুট্টার উপর গবেষণা করে রাসায়নিক মতবাদকে সমর্থন করেছেন।

Giles, Koller প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতেও বিকিরণের প্রভাব পরোক্ষ-ভাবে হয়। মিউটেশনের সৃষ্টিকারী বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সাইটোপ্লাজমকে পরিবর্তিত করে। এই পরিবর্তিত সাইটোপ্লাজমের প্রভাবে নিউক্লীয়াসে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ও ফলে ক্রোমোসোমে মিউটেশন হয়। রঞ্জনরশ্মি ও অন্যান্য ধরনের বিকিরণের প্রভাবে তৈরী মিউটেশন এবং রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে সৃষ্ট মিউটেশনের মধ্যে সামঞ্জস্য উভয় ক্ষেত্রেই একই পদ্ধতির মাধ্যমে মিউটেশনের সৃষ্টির ইঙ্গিত করে। Duryee-র নিউক্লীয়াসের স্থানান্তর করার পরীক্ষা রাসায়নিক মতবাদকেই সমর্থন করে। এই পরীক্ষায় Duryee *Paramecium*-এর ডিম্বাণুর অবিকিরণ-প্রাপ্ত নিউক্লীয়াসকে বিকিরণপ্রাপ্ত সাইটোপ্লাজমে স্থানান্তর করে ক্রোমোসোমের ভগ্নতা অর্থাৎ ফ্র্যাগমেন্ট (*fragment*) পান। কিন্তু যখন বিকিরণপ্রাপ্ত নিউক্লীয়াস বিকিরণহীন সাইটোপ্লাজমে স্থানান্তরিত করা হয় তখন ক্রোমো-সোমে পরিবর্তন হয় না। সুতরাং সাইটোপ্লাজমই ক্রোমোসোমে পরিবর্তন আনে। তাছাড়া *Tradescantia* ও অন্যান্য অনেক উদ্ভিদে বিকিরণের মাত্রা ও মিউটেশনের হার সরাসরি অনুপাতিক হয় না। Giles-এর মতে বিকিরণের ফলে জলের অণু বিভক্ত হয়ে H ও OH আয়নের সৃষ্টি হয়। অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার ফলে এর থেকে হাইড্রোজেন প্যার্যাক্সাইড তৈরী হয়। রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করার পব কোষ থেকে হাইড্রোজেন প্যার্যাক্সাইড পাওয়া গিয়েছে। এই হাইড্রোজেন প্যার্যাক্সাইড মিউটেশন সৃষ্টি করতে পারে। এখন দেখা গিয়েছে H_2O_2 ছাড়াও OH-এর প্রভাবেও মিউটেশন তৈরী হয়। এইসব বিভিন্ন তথ্য পরোক্ষ বা রাসায়নিক মতবাদকেই সমর্থন করে।

একাদশ অধ্যায়

ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন

(Structural Changes of Chromosomes)

সব উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রত্যেক দেহ কোষে নির্দিষ্ট আকৃতির নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। নির্দিষ্ট ধরনের যেসব ক্রোমোসোম কোন একটা জীবের কোষে পাওয়া যায় তাকে ক্যারিওটাইপ (*karyotype*) বলে। ক্যারিওটাইপকে নক্সাকারে (*digrammatic*) উপস্থাপিত করাকে ইডিওগ্রাম (*idiogram*) বলা হয় (চিত্র 97)। এক কোষ থেকে অন্য কোষে কিম্বা এক বংশ থেকে পরের বংশে ক্যারিওটাইপের অপরিবর্তনীয়তা
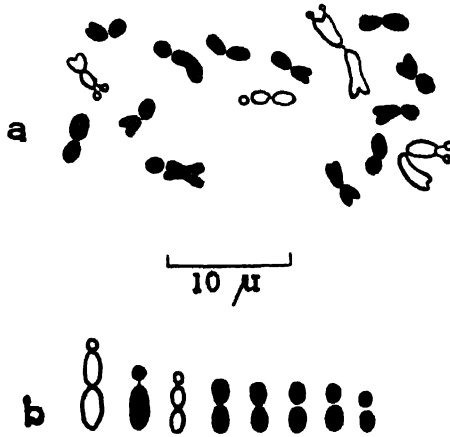
চিত্র 97
Punica granatum-এর দেহ কোষে 2n = 16টা ক্রোমোসোম (Guha);
a – ক্যারিওটাইপ, b – ইডিওগ্রাম

নির্ভর করে কোষ বিভাগের সময় ক্রোমোসোমের যথাযথ বিভাগের উপর। সাধারণতঃ কোষ বিভাগের ফলে সৃষ্ট দুইটা অপত্য কোষেই মাতৃকোষের অনুরূপ ও সমসংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। কিন্তু কখনও কখনও একটা কোষে ক্রোমোসোমের হঠাৎ আকৃতির কিম্বা সংখ্যার পরিবর্তন দেখা যায়। এই কোষ থেকে সৃষ্ট সব অপত্য কোষেই নূতন ক্যারিওটাইপ দেখা যায়

কারণ পরিবর্তিত ক্রোমোসোমগুলিও যথাযথভাবে বিভক্ত হয়। এই পরিবর্তন জনন কোষে দেখা দিলে নূতন ভ্যারাইটীর (*variety*) উদ্ভিদের সৃষ্টি হতে পারে।

ক্যারিওটাইপের পরিবর্তনকে দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(A) আকৃতির পরিবর্তন; (B) সংখ্যার পরিবর্তন।

উভয় ধরনের পরিবর্তনই প্রকৃতিতে দেখা যায় তবে এদের সংখ্যা খুব কম। রঞ্জনরশ্মি (*X-ray*) ও অন্যান্য ধরনের বিকিরণের (*radiation*) সাহায্যে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে ক্রোমোসোমের পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তনকে চারটা শ্রেণীতে (চিত্র 98) ভাগ করা হয়। এই শ্রেণীগুলি হ'লঃ—

(1) ঘাটতি (*deficiency*) ও ডীলীশন (*deletion*);
(2) দ্বিগুণতা বা ডুপ্লিকেশন (*duplication*);
(3) ইনভারশন (*inversion*) অর্থাৎ উল্টান অবস্থা;
(4) ট্রান্সলোকেশন (*translocation*) অর্থাৎ স্থান বদল।

1. ঘাটতি (*deficiency*) **ও ডীলীশন** (*deletion*)

ক্রোমোসোমের কোন অংশ বাদ গেলে তাকে ডিফিসিয়েন্সি বা ঘাটতি বলে। ক্রোমোসোমের কোন জায়গায় ভেঙ্গে গেলে সাধারণতঃ একটা সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত অংশ ও একটা সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশের সৃষ্টি হয়। সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন বা অ্যাসিন্ট্রিক (*acentric*) অংশটা স্থায়ী হয় না কারণ অ্যানাফেজে এই ক্রোমোসোমটা স্বাভাবিকভাবে মেরুর দিকে যেতে পারে না। সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত অংশটা স্থায়ী হয় ও এই ক্রোমোসোমকে ডিফিসিয়েন্ট (*deficient*) বা ঘাটতি ক্রোমোসোম বলে। তবে যদি অবলুপ্ত অঞ্চলটা বড় হয় ও ঐখানে অনেকগুলি জীন থাকে তবে সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত অংশটাও নষ্ট হয়ে যায়।

ডিফিসিয়েন্সিকে (*defeciency*) দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (*a*) ক্রোমোসোমের প্রান্তের অংশটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তাকে টারমিন্যাল ডিফিসিয়েন্স (*terminal deficiency*) বা প্রান্তীয় ঘাটতি বলা হয় (চিত্র 99a, b)। কখনও কখনও SAT ক্রোমোসোমের প্রান্তের স্যাটেলাইটটা বাদ যায়। এই রকমের ঘাটতিকে অ্যাম্ফিপ্লাষ্টি (*amphiplasty*) বলে।

(*b*) ক্রোমোসোমের মাঝের কোন অংশ বাদ গেলে তাকে ইন্টারক্যালারী ডিফিসিয়েন্স (*intercalary defeciency*) বা মধ্যবর্তী ঘাটতি বলে (চিত্র 100a, b)। কোন ক্রোমোসোমের দুইটা স্থান ভেঙ্গে গিয়ে দুই

চিত্র ৭৪
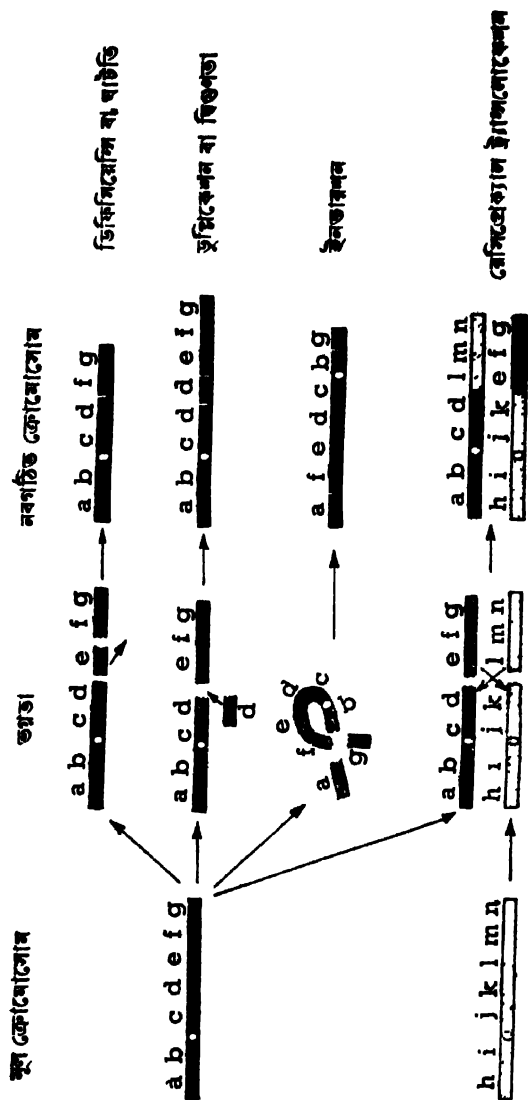
ক্রোমোসোমের বিভিন্ন রকমের ভগ্নতা ও সংযোগের ফলে ক্রোমোসোমের চার ধরনের আকৃতির পরিবর্তন, অর্থাৎ ডিফিসিয়েন্সি, ডুপ্লিকেশন, ইনভারশন ও ট্র্যান্সলোকেশন কিভাবে হয় তা দেখান হয়েছে
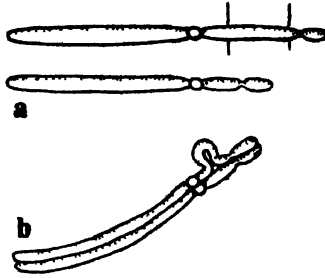
চিত্র 99
মধ্যবর্তী ঘাটতি,
a —উপরের ক্রোমোসোমের দুই জায়গায় ভেঙ্গে গিয়ে মাঝের অংশ বাদ যাওয়ার ফলে মধ্যবর্তী ঘাটতিযুক্ত নীচের ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে,
b —মায়োসিসে স্বাভাবিক ও মধ্যবর্তী ঘাটতিযুক্ত ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা
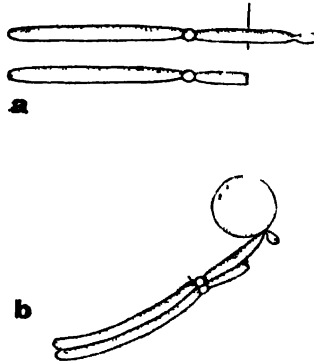
চিত্র 100
প্রান্তীয় ঘাটতি,
a —উপরের ক্রোমোসোমের প্রান্তের কিছু অংশ বাদ যাওয়ার ফলে প্রান্তীয় ঘাটতিযুক্ত নীচের ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে,
b —হেটারোজাইগাস ঘাটতিযুক্ত উদ্ভিদে মায়োসিসে স্বাভাবিক ও ঘাটতি ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা

পাশের অংশ দুইটার ভগ্ন প্রান্ত জোড়া লাগার ফলে মধ্যবর্তী ঘাটতির সৃষ্টি হয়। মধ্যবর্তী ঘাটতিকে ডীলীশন বলে।

প্রান্তীয় ঘাটতি মধ্যবর্তী ঘাটতির তুলনায় অনেক কম দেখা যায়। ড্রসোফিলায় প্রান্তীয় ঘাটতি বিরল। অনেকে মনে করেন এখানে সত্যিকারের প্রান্তীয় ঘাটতি হয় না। তবে ভুট্টায় বেশ কতকগুলি প্রান্তীয় ঘাটতি দেখা গিয়েছে। প্রান্তীয় ঘাটতি বা টারমিন্যাল ডিফিসিয়েন্সি ক্রোমোসোমের টেলোমিয়ার (*telomerc*) অংশটা বাদ যায়। সদ্য ভগ্ন প্রান্তটা সহজেই অন্য কোন ভগ্ন প্রান্তের সাথে জোড়া লাগে। কোন ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটা একই স্থানে ভেঙ্গে গেলে অনেক সময় সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমাটিডের অংশ দুইটা যুক্ত হয়ে একটা দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত বা ডাইসেন্ট্রিক (*dicentric*) ক্রোমোসোমের সৃষ্টি করে। সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশ দুইটাও যুক্ত হতে পারে ও পরে ঐ অংশটা নষ্ট হয়ে যায়। ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমাটিড পরের মাইটোসিস বিভাগের সময় একটা দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত সেতু বা ডাইসেন্ট্রিক ব্রীজের (*dicentric bridge*) সৃষ্টি করে। অ্যানাফেজে সেন্ট্রোমিয়ার দুইটা বিপরীত মেরুর দিকে যেতে চায় ফলে সেতুটা ভেঙ্গে যায়। সেন্ট্রোমিয়ার-যুক্ত দুইটা ভগ্ন অংশ দুইটা অপত্য নিউক্লীয়াসে যায়। অপত্য ক্রোমোসোমের ভগ্নী ক্রোমাটিডের (আগের অর্ধ-ক্রোমাটিড) দুইটা ভগ্ন প্রান্ত জোড়া লাগে ও পুনরায় সেতু গঠিত হয়। এইভাবে বারবার ভগ্নতা-সংযোগ-সেতু (*breakage-fusion-bridge*) গঠিত হতে থাকে। কয়েক বংশ পরে এই ক্রোমোসোমটা বা সম্পূর্ণ কোষটাই নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্য এইরকমের ভগ্নতা সাইটোলজিয় পরিবর্তন আনতে পারে না। **McClintock** এর (1941) মতে উদ্ভিদে প্রান্তীয় ঘাটতির ফলে গঠিত

চিত্র 101

বলয়াকার বা রিঙ ক্রোমোসোম।

উপরে—বাদিকে ইন্টারফেজ অবস্থায় বলয়াকার ক্রোমোসোম, মাঝে বলয়াকার ক্রোমোসোমের দুইটা ভগ্নী ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়েছে, ডানদিকে একটা দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত বলয়াকার ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে;

মাঝে—দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোমটা মাঝামাঝি অঞ্চলে ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে টেলোফেজে দুইটা সমান আকৃতির বলয়াকার ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে;

নীচে—দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোমটা অসমান অংশে ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে টেলোফেজে দুইটা অসমান আকৃতির বলয়াকার ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে

চিত্র 101 (চিত্রের বিবরণ ২২0 পৃঃ)
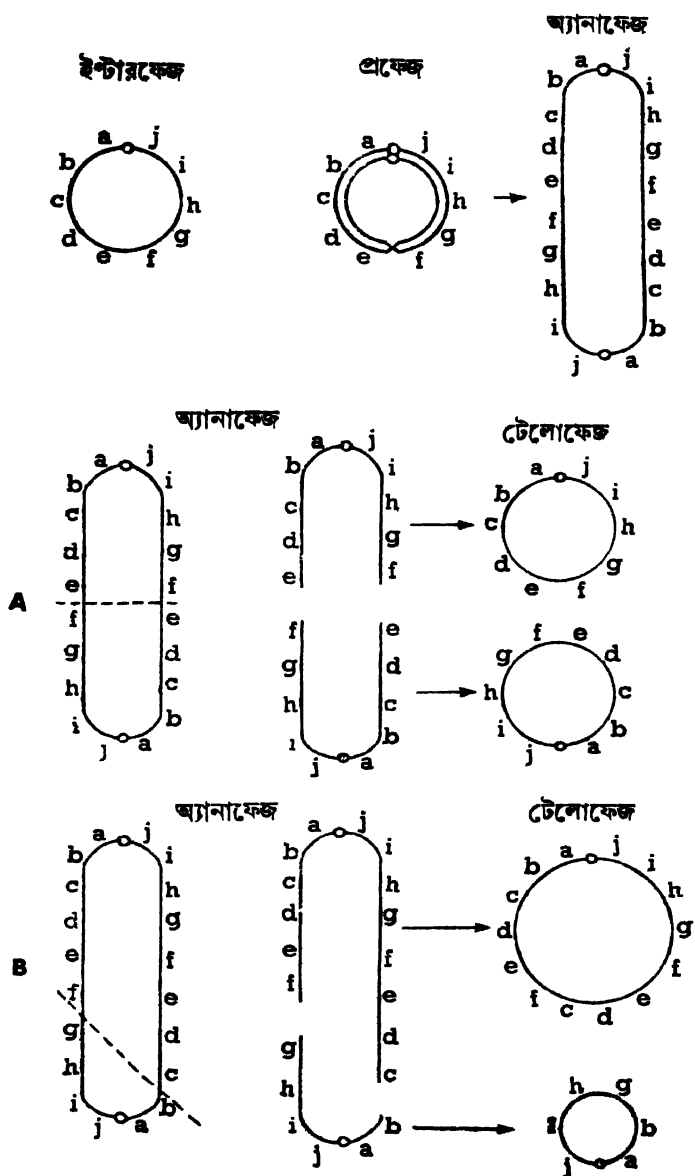
ভগ্ন প্রান্ত আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় ও ক্রোমোসোমটা স্থায়ী হয়। বিকিরণ প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে ক্রোমোসোমের ভগ্নতা কিরকম হবে তা নির্ভর করে কি অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলিকে বিকিরণ দেওয়া হচ্ছে তার উপর। (*i*) DNA দ্বিগুণ হবার আগে বিকিরণ প্রয়োগ করলে ক্রোমোসোমীয় ভগ্নতা দেখা যায়। (*ii*) DNA দ্বিগুণ হবার পর বিকিরণ পেলে সাধারণতঃ ক্রোমোসোমের দুইটা ক্রোমোটিডই একই জায়গায় ভেঙ্গে যায় (Catcheside ও Lea)। তবে কখনও কখনও কেবল একটা ক্রোমোটিড ভেঙ্গে যায়।

অনেক সময় একটা ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারের দুই দিকে ভেঙ্গে যায়। সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশ দুইটা যুক্ত হতে পারে কিম্বা আলাদা থাকতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রেই সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশ পরে নষ্ট হয়ে যায়। সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত অংশের দুইটা ভগ্ন প্রান্ত জোড়া লেগে বলয়াকার বা রিঙ (*ring*) ক্রোমোসোম (চিত্র 101) গঠিত হয়। ভুট্টায় এবং ড্রসোফিলায় বলয়াকার ক্রোমোসোম দেখা গিয়েছে। ড্রসোফিলায় রিঙ বা বলয়াকার X-ক্রোমোসোম পাওয়া যায় কিন্তু বলয়াকার অটোসোম (*autosome*) সচরাচর দেখা যায় না। মাইটোসিস বিভাগের সময় কখনও কখনও বলয়াকার ক্রোমোসোমের ভগ্নী ক্রোমোটিডের মধ্যে একটা ক্রসিং-ওভার (*crossing-over*) হয়। এর ফলে একটা দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত রিঙ বা বলয়াকার ক্রোমাটিডের সৃষ্টি হয় (চিত্র 101)। অ্যানাফেজে দুইটা সেন্ট্রোমিয়ার বিপরীত মেরুর দিকে যেতে চায় ফলে ঐ রিঙ বা বলয়াকার ক্রোমোসোমটা ভেঙ্গে যায়। একটা অংশ এক-মেরুতে এবং অন্য অংশটা অন্য মেরুতে যায়। দুইটা অপত্য নিউক্লীয়াসে সদ্য ভগ্ন ক্রোমোটিডের প্রান্ত দুইটা জোড়া লেগে নূতন রিঙ বা বলয়াকার ক্রোমোসোমের সৃষ্টি করে। এইজন্য কয়েকবার কোষ বিভাগের ফলে বিভিন্ন ধরনের ও আয়তনের বলয়াকার ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। বারবার এইরকমের ভগ্নতা-সংযোগ হওয়ার ফলে পরে ঐ কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্য প্রকৃতিতে রিঙ বা বলয়াকার ক্রোমোসোম সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

হোমোজাইগাস (*homozygous*) ডিফিসিয়েন্সিতে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটার কোন বিশেষ অংশ নষ্ট হয়ে যায়। হোমোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সিযুক্ত জীব সাধারণতঃ বেঁচে থাকতে পারে না। 1934 খৃষ্টাব্দে Creighton ভুট্টায় হোমোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সি দেখতে পেয়েছিলেন। McClintock-এর (1938, 1941, 1944) মতে ভুট্টায় খুব ছোট হোমো-জাইগাস ডিফিসিয়েন্সি হলে ঐ উদ্ভিদটা বেঁচে থাকতে পারে। *Droso-*

phula-এ X-ক্রোমোসোমের প্রান্তে ছোট ডিফিসিয়েন্সি হ'লে ড্রসোফিলাটা বে'চে থাকতে পারে।

হেটারোজাইগাস (*heterozygous*) ডিফিসিয়েন্সিতে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের যে কোন একটা সদস্যে ডিফিসিয়েন্সি দেখা যায় (চিত্র 99, 100)। কোন কোন জীবে হেটারোজাইগাস অবস্থায়ও ডিফিসিয়েন্সি খুব ছোট না হ'লে ঐ জীবের বে'চে থাকার সম্ভাবনা কম। হোমোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সির তুলনায় হেটারোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সি অনেক কম ক্ষতিকর। ভুট্টা, ধুতরা এবং অন্যান্য কিছু উদ্ভিদে কোন ক্রোমোসোমের বেশীর ভাগ অংশ এমন কি একটা সম্পূর্ণ ক্রোমোসোম বাদ (২n—1) গেলেও উদ্ভিদটা বে'চে থাকতে পারে। গ্যামেটোফাইট বা লিঙ্গধর উদ্ভিদে যে কোন ডিফি-সিয়েন্সিই মারাত্মক হয় কারণ লিঙ্গধর উদ্ভিদ হ্যাপ্লয়েড হওয়ায় ডিফিসিয়েন্সি হলেই ঐ জীবে কোন না কোন জীন অনুপস্থিত থাকে। ড্রসোফিলার 'Y'-ক্রোমোসোমের বেশ বড় অংশ বাদ গেলেও কোন ক্ষতি হয় না কারণ 'Y'-ক্রোমোসোমের বেশীর ভাগ অংশই জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয়।

প্রাণীতে ঘাটতি ক্রোমোসোমযুক্ত গ্যামেট ফার্টিলাইজেশনে অংশ নিতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদের ঘাটতি (*deficient*) গ্যামেট সচরাচর ফার্টিলাই-জেশনে অংশ নেয় না এবং পরে নষ্ট হয়ে যায়। তবে কিছু উদ্ভিদে ঘাটতি স্ত্রী গ্যামেট (ডিম্বাণু) নিষিক্ত হতে পারে কিন্তু ঘাটতি পুং গ্যামেট স্বাভাবিক গ্যামেটের সাথে প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য হয়। এইজন্য হোমোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সি কম দেখা যায়।

ঘাটতি বা ডিফিসিয়েন্সি স্বাভাবিকভাবে বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হয়। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের বিসদৃশ্য অংশের মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলে কিম্বা দুইটা হোমোলোগাস নয় এমন ক্রোমোসোমের মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলে ডিফিসিয়েন্সি দেখা যায়। Rick *Tradescantia*-এ রঞ্জনরশ্মির প্রয়োগ করে ডিফিসিয়েন্সি দেখতে পেয়েছিলেন। ভুট্টায় অতি বেগুনী রশ্মির প্রয়োগ করে প্রান্তীয় ঘাটতি ও রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করে মধ্যবর্তী ঘাটতি দেখা যায় (Stadler 1941, Stadler ও Roman 1948)। রঞ্জনরশ্মির (*X-ray*) প্রয়োগ করে Stadler ও Roman (1948) ভুট্টার 'A' স্থানে তিনটা হেটারোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সি পেয়েছিলেন। এইসব ডিফিসিয়েন্সির (ঘাটতির) জন্য উদ্ভিদে অ্যান্থোসায়ানিন (*anthocyanin*) ও ক্লোরোফিলের পরিমাণ হ্রাস পায় ও কোষের জীবনীশক্তি কমে যায়। রঞ্জনরশ্মির প্রয়োগ করে Stadler ভুট্টার দশম ক্রোমোসোমের প্রায় এক ষষ্ঠমাংশ ছাড়া একটা ঘাটতি ক্রোমোসোম পেয়েছিলেন। এইরকমের ক্রোমোসোমযুক্ত হেটারো-

জাইগাস ভুট্টার ঘাটতি পরাগরেণু (*pollen*) পরাগধানী (*anther*) থেকে বের হওয়ার অল্প পরেই নষ্ট হয়ে যায়।

Burton (1954) অতি বেগুনী রশ্মি (*ultra violet ray*) প্রয়োগ করে মধ্যবর্তী ঘাটতি পেয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের বিকিরণের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদে আলাদা হয়ে থাকে।

ড্রসোফিলায় স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের স্বাভাবিক ও ঘাটতি ক্রোমোসোমের গঠন তুলনা করে সঠিকভাবে অবলুপ্ত অংশগুলের অবস্থান নিরূপণ করা সম্ভব। হেটারোজাইগাস ডিফিসিয়েন্সি (চিত্র 102a, b, 103a, b, c) প্যাকিটিন
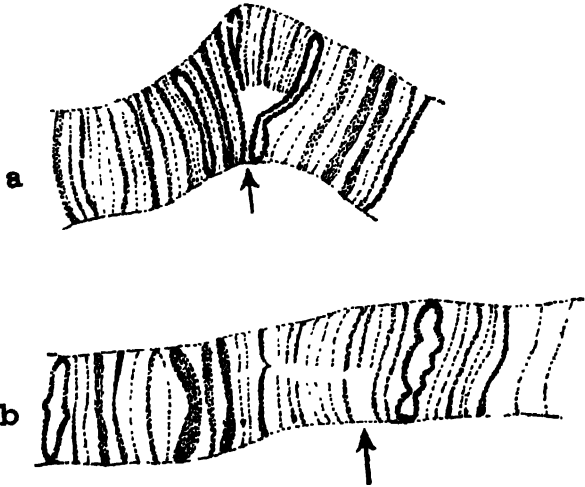
চিত্র 102

Drosophila melanogaster-এর স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের ক্রোমোসোমে হেটারোজাইগাস মধ্যবর্তী ঘাটতি।

a—তীর চিহ্নিত স্থানে দশ এগারোটা ব্যান্ডের মধ্যবর্তী ঘাটতি,
b—তীর চিহ্নিত স্থানে দুইটা ব্যান্ডের মধ্যবর্তী ঘাটতি

অবস্থায় খুব সহজেই বোঝা যায় কারণ অবলুপ্ত অংশ ও হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের স্বাভাবিক অংশের মধ্যে যুগ্মতা হতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদে যেখানে স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের মত বড় ক্রোমোসোম দেখা যায় না সেখানে খুব ছোট ডিফিসিয়েন্সি সাইটোলজির পদ্ধতিতে ধরা যায় না। জেনেটিক উপায়ে কেবল এই সব ডিফিসিয়েন্সির উপস্থিতি বোঝা যায়।
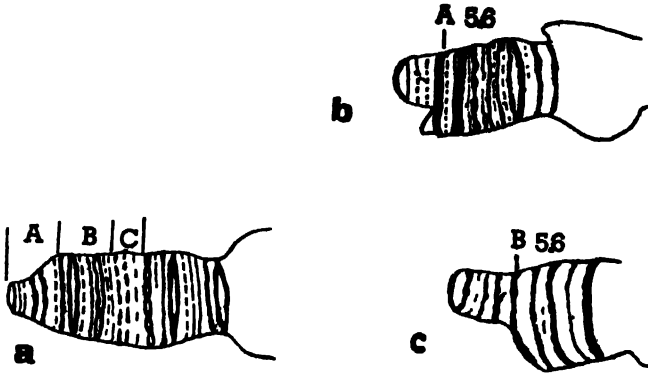
চিত্র 103
Drosophila melanogaster-এর X-ক্রোমোসোমের প্রান্তীয় ঘাটতি;
a — স্বাভাবিক X-ক্রোমোসোমের প্রান্তভাগ, b ও c — X-ক্রোমোসোমের
হেটারোজাইগাস প্রান্তীয় ঘাটতি,
b — চারটা প্রান্তীয় ব্যাণ্ডের ঘাটতি,
c — দশ, এগারটা প্রান্তীয় ব্যাণ্ডের ঘাটতি

যেহেতু ডিফিসিয়েন্সি বা ঘাটতির ফলে জীনীয় বস্তুর লোকসান হয় সে-জন্য এর প্রভাব জীবের পক্ষে ক্ষতিকর। বিনষ্ট জীনীয় বস্তুর পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর এই ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে।

ডুপ্লিকেশন (*duplication*) বা দ্বিগুণতা

1919 খৃষ্টাব্দে Bridges দেখেন যে একটা হোমোজাইগাস রিসেসিভ (*recessive* বা প্রচ্ছন্ন) জীনযুক্ত *Drosophila melanogaster*-এ ঐ রিসেসিভ চরিত্র প্রকাশিত না হয়ে ফেনোটাইপে ডমিন্যান্ট (প্রবল) চরিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন যে ঐ-সব ড্রসোফিলায় দুইটা রিসেসিভ জীন ছাড়াও নির্দিষ্ট চরিত্রের একটা ডমিন্যান্ট জীন রয়েছে। যখন ক্রোমোসোমের কোন অংশ নিয়মিত অংশের অতিরিক্ত থাকে তখন তাকে ডুপ্লিকেশন (*duplication*) বা দ্বিগুণতা বলে অর্থাৎ ডুপ্লিকেশনের ফলে একটা ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ বা প্রাণীতে কোন ক্রোমোসোমের একটা অংশ দুইবার থাকবার (দুইটা হোমোলোগে) জায়গায় তিনবার বা তার চেয়ে বেশীবার থাকে। এই অতিরিক্ত অংশ ক্রোমো-সোমের সাথে যুক্ত অবস্থায় কিম্বা পৃথক (*fragment*) অবস্থায় থাকতে পারে।

দ্বিগুণতা বা ডুপ্লিকেশন বিভিন্ন রকমের হয়।

(*a*) যদি অতিরিক্ত অংশটা যে ক্রোমোসোমের অংশ সেই ক্রোমোসোমেই অনুরূপ অংশের পাশে থাকে তবে তাকে ট্যানড্যাম ডুপ্লিকেশন (*tandem duplication*) বলে। ab cde fg ক্রোমোসোমের cde অংশটা যদি দ্বিগুণ হয ও abcde cde fg ভাবে থাকে তবে এই দ্বিগুণতাকে ট্যানড্যাম ডুপ্লিকেশন বলা হয। ড্রসোফিলাব "বাব" (*Bar*) চোখ (চিত্র 104) ও বোমশ পাখা এইরকম দ্বিগুণতার জন্য হয়।
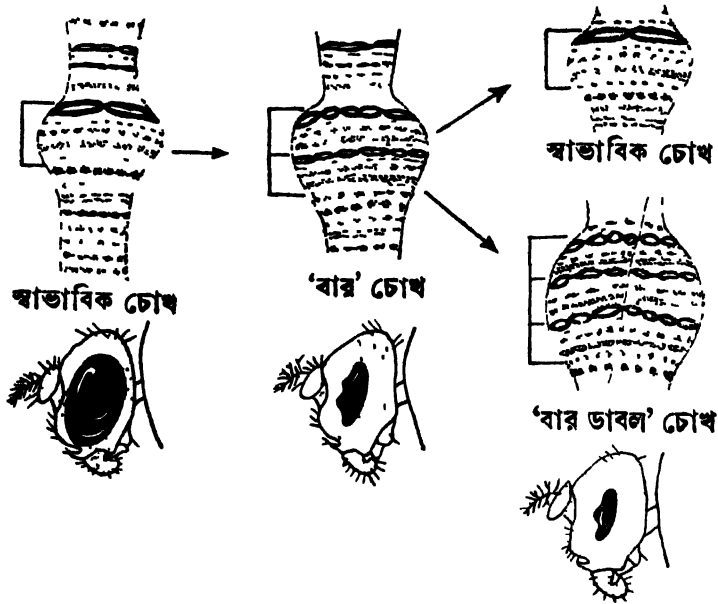
চিত্র 104

Drosophila melanogaster-এব X-ক্রোমোসোমেব 16A অঞ্চল (চিহ্নিত স্থান) একবাব থাকলে স্বাভাবিক চোখে, পবপব দুইবার থাকলে 'বাব' চোখ এবং পবপব তিনবাব থাকলে 'বার ডাবল' চোখের সৃষ্টি হয। নীচে ড্রসোফিলাব বিভিন্ন বকমেব চোখ (স্বাভাবিক, 'বার' এবং 'বাব ডাবল') দেখান হযেছে

(*b*) বিপবীত ট্যানড্যাম ডুপ্লিকেশন (*reverse tandem duplication*) আগেবটাব মতই কেবল এখানে দ্বিগুণ অংশটা উল্টোভাবে থাকে। cde যদি অতিবিক্ত অংশ হয তবে বিপরীত ট্যানড্যাম ডুপ্লিকেশন হবে ab cde edc fg। বিশেষ ধরনের বিপরীত দ্বিগুণতায় একটা মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমের দুইটা বাহুই অনুরূপ (*iso-chromosome*) হয়। এই-

রকমের আইসো-ক্রোমোসোম সেন্ট্রোমিয়ারের পাশাপাশি বিভাগের ফলে সৃষ্টি হতে পারে। ড্রসোফিলার যুক্ত-X ক্রোমোসোম এই ধরনের।

(c) ডিসপ্লেইসড ডুপ্লিকেশন (*displaced duplication*) বা স্থানান্তরিত দ্বিগুণতায় অতিরিক্ত অংশটা যে ক্রোমোসোমের অংশ সেখানে না থেকে অন্য ক্রোমোসোমে থাকে। যদি abcdefg ও klmnop দুইটা ক্রোমোসোম হয় ও cde অংশটা অতিরিক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে স্থানান্তরিত দ্বিগুণতায় cde অংশটা kl cde lmnop বা kl edc lmnop অবস্থায় থাকতে পারে।

অসমান ক্রসিং ওভারের জন্য দ্বিগুণতা দেখা যায় (চিত্র 105)। *Drosophila melanogaster*-এর 'X'-ক্রোমোসোমে বিভিন্ন রকমের কয়েকটা দ্বিগুণতা দেখা যায়। ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমের '16A' (সাতটা ব্যাণ্ডযুক্ত) অঞ্চল অতিরিক্ত থাকলে "বার" চোখের (*Bar-eye*) সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক পুরুষ ড্রসোফিলায় '16A' অঞ্চল একবার থাকে। এই '16A' অঞ্চল দুইবার থাকলে "বার"-পুরুষ এবং তিনবার থাকলে "বার-ডাবল" (*Bar-double*) পুরুষের সৃষ্টি হয়। "বার"-স্ত্রী ড্রসোফিলায় অসমান ক্রসিং ওভারের ফলে স্বাভাবিক কিম্বা "বার-ডাবল" ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়ে থাকে (চিত্র 104, 105)।

McClintock ভুট্টায় জীন *Bm*-এর দ্বিগুণতা দেখেছিলেন।
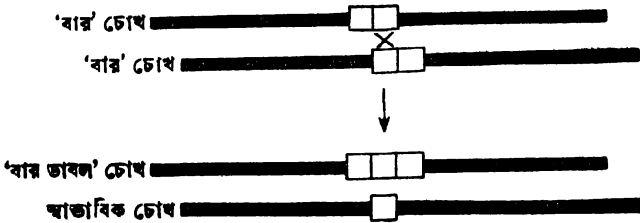
চিত্র 105

দুইটা ক্রোমোসোমের মধ্যে অসমান ক্রসিং ওভারের ফলে 'বার ডাবল' (দ্বিগুণ 'বার') ও স্বাভাবিক পতঙ্গের সৃষ্টি হয়।

ভুট্টায় জীন *bm* হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকলে পাতায় বাদামী মধ্যশিরার সৃষ্টি হয়। এই জীনের অ্যালীল (*allele*) *Bm*-এর উপস্থিতিতে পাতার মধ্যশিরা সবুজ হয়। McClintock দেখেন যে একটা হোমোজাইগাস *bm* জীনযুক্ত ভুট্টায় (*bm bm*) জীন *Bm* অতিরিক্ত থাকলে ঐ উদ্ভিদের পাতার মধ্যশিরা সবুজ হয়। এর কারণ হ'ল যে একটা *Bm*

জীন দুইটা *bm* জীনের উপর ডমিন্যান্ট। ভুট্টার এই অতিরিক্ত *Bm* জীনটা একটা ছোট বলয়াকার (*ring*) ক্রোমোসোমে থাকে। দেহ কোষের মাইটোসিস বিভাগের সময় এই ক্রোমোসোমের আচরণ অস্বাভাবিক হয়। কখনও কখনও এই ক্রোমোসোমটা লুপ্ত হয়ে যায় আবার কখনও বা এদের আয়তন পরিবর্তিত হয়। যেসব স্থানের কোষে ঐ ক্রোমোসোমটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেসব স্থানে মধ্যশিরাটা বাদামী হয়। এই বলয়াকার ক্রোমোসোম যদি উদ্ভিদটা খুব ছোট থাকতে নষ্ট হয়ে যায় তবে সব পাতায় বাদামী মধ্যশিরা দেখা যায়।

দ্বিগুণতার (*duplication*) ফলে যেহেতু ক্রোমোসোমের কোন অংশ অতিরিক্ত থাকে সেজন্য জেনেটিক অনুপাত ব্যাহত হয়। তবে ডিফিসিয়েন্সির তুলনায় ডুপ্লিকেশন অনেক কম ক্ষতিকর। হোমোজাইগাস অবস্থায় ডুপ্লিকেশন বা দ্বিগুণতা থাকলে, দ্বিগুণ অংশটা খুব ছোট না হলে ঐ জীবের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম। প্রকৃতিতে সাধারণতঃ ডুপ্লিকেশন বা দ্বিগুণতা হেটারোজাইগাস অবস্থায় দেখা যায়।

ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমে ব্যান্ডের বিন্যাস থেকে দ্বিগুণতা সহজেই বোঝা যায়। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদে মায়োসিসের যুগ্মতা থেকে দ্বিগুণতার উপস্থিতি বোঝা যায় কারণ কোন অংশ দ্বিগুণ অবস্থায় থাকলে ঐ অংশটা ও অনুরূপ অংশের মধ্যে যুগ্মতা হয়।

উদ্ভিদে ঘাটতি বা দ্বিগুণতাযুক্ত গ্যামেট অনুর্বর হয়।

ইনভারশন (*inversion*)

কোন ক্রোমোসোমের একটা অংশ ভেঙ্গে গিয়ে ঐ অংশটা উল্টোভাবে জোড়া লাগলে তাকে ইনভারশন (*inversion*) বলে। সাধারণতঃ একটা ক্রোমোসোমের দুই জায়গায় ভেঙ্গে যায় ও মধ্যবর্তী অংশে ইনভারশন হয়। ABCDEFGH ক্রোমোসোমের DEF অংশটা ভেঙ্গে গিয়ে আবার জোড়া লেগে ABCFEDGH ক্রোমোসোম গঠন করতে পারে অর্থাৎ ইনভারশন হয়। সাধারণতঃ ক্রোমোসোমের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইনভারশন হয়, ক্রোমোসোমের প্রান্তে ইনভারশন সচরাচর দেখা যায় না।

1921 খৃষ্টাব্দে Sturtevant ড্রসোফিলায় প্রথম ইনভারশন দেখতে পান। ড্রসোফিলা ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রাণী ও বহু উদ্ভিদ বিশেষতঃ *Tradescantia, Paris, Commelina zebrina, Triticum* ইত্যাদিতে ইনভারশন দেখা গিয়েছে। Sears *Triticum*-এ ইনভারশন ব্রীজ (*inversion bridge*) লক্ষ্য করেন। কোন কোন প্রাণী, যেমন, ফড়িঙের (*grasshopper*) কতকগুলি প্রজাতি, এনোফেলিস মশা ইত্যাদিতে সাধারণতঃ

ইনভারশন দেখা যায় না (White 1951)। ইনভারশনের ফলে কেবল জীনের অবস্থানের পরিবর্তন হয় এবং এর ফলে কোন কোন সময় ফেনো-টাইপের পরিবতন (যেমন বর্ণবৈচিত্র্য বা *variegation*) দেখা যায়।

ইনভারশন প্রধানতঃ দুই রকমের হয়—(a) যদি ক্রোমোসোমের একটা বাহুতে ইনভারশনটা সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাকে **প্যারাসেন্ট্রিক** ইনভারশন (*paracentric inversion*) বলে। এই ইনভারশন বেশী দেখা যায়। McClintock ভুট্টায় এবং Darlington, Stebbins ও অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন জীবে এই ইনভারশন দেখেছিলেন। প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন থাকলে মায়োসিস বিভাগের অ্যানাফেজে ক্রোমাটিড ব্রীজ (সেতু) ও সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশ দেখা যায়।

(b) যেসব ইনভারশনে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত থাকে তাদের **পেরিসেন্ট্রিক** ইনভারশন (*pericentric inversion*) বলে। পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন প্রতিসম (*symmetrical*) বা অপ্রতিসম (*asymmetrical*) হয়। প্রতিসম ইনভারশনের ক্ষেত্রে ইনভারশনযুক্ত অঞ্চলের মোটামুটি মাঝে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে কিন্তু অপ্রতিসম ইনভারশনের ক্ষেত্রে সেন্ট্রো-মিয়ারটা মাঝে থাকে না। অপ্রতিসম পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের জন্যে দেহ কোষের ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন হতে পারে (চিত্র 106)। একটা সমান বাহুযুক্ত V-আকৃতির ক্রোমোসোমে যদি সেন্ট্রোমিয়ারের
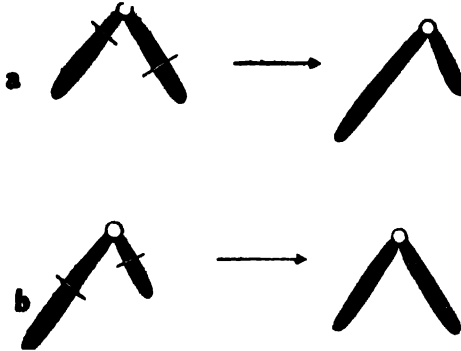
চিত্র 106

পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের ফলে ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন

দুইদিকে অসমান দূরত্বে বাহু দুইটা ভেঙ্গে গিয়ে উল্টোভাবে জোড়া লাগে তবে ঐ ইনভারশনের ফলে সৃষ্ট ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারটা প্রান্তের দিকে থাকবে। আবার একটা J বা I আকৃতির ক্রোমোসোম থেকে পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের ফলে V-আকৃতির ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হতে পারে।

পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনে ক্রসিং ওভারের ফলে মায়োসিস বিভাগের প্রথম মেটাফেজে ক্রোমাটিড ব্রীজ ও সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশ দেখা যায় না। তবে কোষ বিভাগের পর দুইটা স্বাভাবিক ও দুইটা পরিবর্তিত ক্রোমোসোম দেখা যায় (চিত্র 107)। শেষোক্ত ক্রোমোসোম দুইটায় কোন অংশের দ্বিগুণতা আবার অন্য অংশের ঘাটতি থাকে। যেসব গ্যামেটে এই-রকমের ক্রোমোসোম থাকে তারা অনুর্বর হয়।
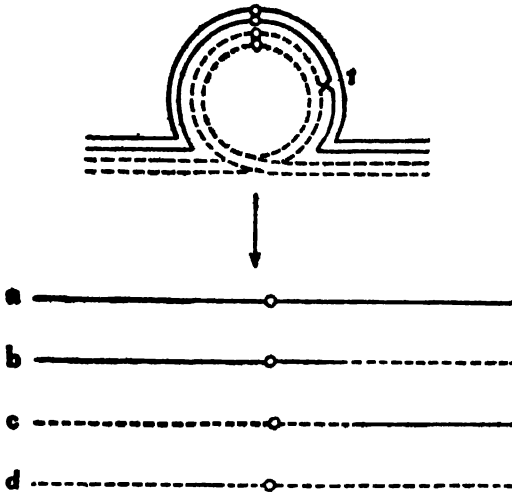
চিত্র 107
পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনে একটা ক্রসিং ওভারের ফলে দুইটা স্বাভাবিক ও দুইটা পরিবর্তিত ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে

একটা ক্রোমোসোমের দুইটা বা তারচেয়ে বেশী সংখ্যক ইনভারশন থাকলে ঐ ইনভাবশন স্বাধীনভাবে, অন্তর্ভুক্ত ভাবে বা উপরিপন্ন ভবে থাকতে পারে। Dobzhansky ড্রসোফিলায় বিভিন্ন রকমের ইনভারশনের বর্ণনা দিয়েছেন।

(*i*) ab cd ef gh ক্রোমোসোমে cd ও fg অংশে স্বাধীন ইনভারশনের ফলে ab dc e gf h ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। এই ইনভারশনকে কখনও কখনও পাশাপাশি (*adjacent*) ইনভারশনও বলা হয়।

(*ii*) ab cd ef gh ক্রোমোসোমে b cd ef অঞ্চলে প্রথম ইনভারশনের ফলে a f ed cb gh ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। edc অঞ্চলে দ্বিতীয়

ইনভারশন হ'লে af cdeb gh ক্রোমোসোম গঠিত হয়। এখানে দ্বিতীয় ইনভারশনটা প্রথম ইনভারশনের মধ্যে থাকে সেজন্য এইরকমের ইনভারশনকে অন্তর্ভুক্ত ইনভারশন (*included inversion*) বলে।

(*iii*) ab cd ef gh ক্রোমোসোমের bcd অঞ্চলে একটা ইনভারশনের ফলে a dcb ef gh ক্রোমোসোম গঠিত হয়। bef অঞ্চলে দ্বিতীয় ইনভারশনের ফলে adc f eb gh ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। এই ইনভারশন দুইটা ওভারল্যাপিং (*overlapping*) বা উপরিপন্ন ধরনের। *Drosophila pseudoobscura*-এ এইরকমের ইনভারশন দেখা যায়। কোন ইনভারশন হেটারোজাইগোটে ওভারল্যাপিং ইনভারশন থাকলে ইনভারশন লুপটা (*loop*) জটিল হয় (চিত্র 108)।

i a b c d e f g h i j k l

ii a b g f e d c h i j k l

iii a b g f j i h c d e k l
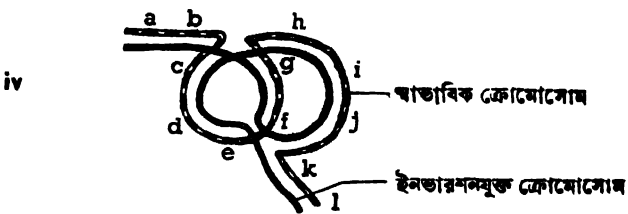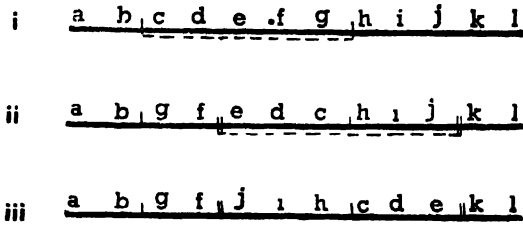
চিত্র 108

উপরিপন্ন (*overlapping*) ইনভারশন; ক্রোমোসোমের গঠন i—ইনভারশনের আগে, ii—প্রথম ইনভারশনের পর, iii—দ্বিতীয় ইনভারশনের পর, iv—উপরিপন্ন ইনভারশন হেটারোজাইগোটের মায়োসিসে জটিল লুপ বা ফাঁস

ইনভারশন ছোট বা বড় হয়। Horton 1939 খৃষ্টাব্দে *Drosophila*-এ একটা বা দুইটা ব্যান্ডের খুব ছোট ইনভারশন দেখতে পান। খুব বড়

ইনভারশন অনেক সময় ক্রোমোসোমের প্রায় সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধরে বিস্তৃত থাকে।

হেটারোজাইগাস অবস্থায় ইনভারশন থাকলে মায়োসিসে এদের আচরণ বিভিন্ন রকমের হয়।

(*a*) ইনভারশনযুক্ত ক্রোমোসোম এবং এর স্বাভাবিক হোমোলোগটা ইউনিভ্যালেন্ট (*univalent*) হিসাবে থাকে ও এদের মধ্যে যুগ্মতা হয় না। এর ফলে উর্বর গ্যামেটের সৃষ্টি হয়।

(*b*) ইনভারশনযুক্ত ক্রোমোসোম এবং এর স্বাভাবিক হোমোলোগটা যুগ্ম অবস্থান করে তবে ইনভারশন অঞ্চল ও স্বাভাবিক অঞ্চলটা যুগ্ম অবস্থান করে না। এই অঞ্চল দুইটা বিপরীত দিকে দুইটা ফাঁস বা *loop* গঠন করে। অ্যানাফেজে ক্রোমোসোম দুইটা নিয়মিতভাবে পৃথক হয় ও এর ফলে উর্বর গ্যামেটের সৃষ্টি হয়।

(*c*) প্যাকিটিনে ইনভারশনযুক্ত ক্রোমোসোম ও এর হোমোলোগাস স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের সব অনুরূপ অংশই যুগ্ম অবস্থান করতে চায়। স্বাভাবিক ক্রোমোসোমটা একটা লুপ (*loop*) বা ফাঁস গঠন করে ও ইনভারশনযুক্ত ক্রোমোসোমটা এই লুপের ভিতর একটা পেঁচান লুপ বা ফাঁসের সৃষ্টি করে। এর ফলে ইনভারশন লুপ (*inversion loop*) (চিত্র 109) গঠিত হয়। ইনভারশন অঞ্চলের মধ্যে ক্রসিং ওভার সাধারণতঃ হয় না। তবে কখনও কখনও ঐ অংশে একটা বা একাধিক ক্রসিং ওভার হয়। ইনভারশন অংশের দৈর্ঘ্য, অবস্থান এবং ঐ জীবের ক্রসিং ওভার চরিত্রের উপর ইনভারশন অঞ্চলের ক্রসিং ওভারের হার নির্ভর করে। ইনভারশন অংশের দৈর্ঘ্য যত বাড়বে ঐ অঞ্চলে ক্রসিং ওভারের সম্ভাবনা তত বেশী হবে।

হেটারোজাইগাস প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশনে (*paracentric inversion*) ইনভারশন লুপের দুইটা ক্রোমাটিডের মধ্যে কেবল একটা ক্রসিং ওভার হ'লে একটা দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত বড় ক্রোমাটিড ও একটা সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ছোট অংশের সৃষ্টি হয়। অন্য দুইটা ক্রোমাটিড যাদের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয় নাই সেই দুইটা অপরিবর্তিত থাকে (চিত্র 110b)। প্রথম মায়োসিস বিভাগের অ্যানাফেজে ক্রোমাটিড ব্রীজ (*chromatid bridge*) বা সেতু গঠিত হয়। সাধারণতঃ এই সেতু ভেঙ্গে গিয়ে দুইটা ভগ্ন অংশ বিপরীত মেরুতে যায়। কখনও কখনও ইনভারশন ব্রীজ বা সেতু কোন মেরুতে না গিয়ে দুই মেরুর মাঝখানে থাকে ও পরে নষ্ট হয়ে যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই সেতু যে কোন একটা মেরুতে যায় ও এইসব ক্ষেত্রে এক বংশ থেকে পরের বংশে ইনভারশন ব্রীজ স্থায়ী হয়। ক্রসিং ওভারের ফলে সৃষ্ট সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন অংশটা পরে নষ্ট হয়ে যায়। কোষ বিভাগের পর
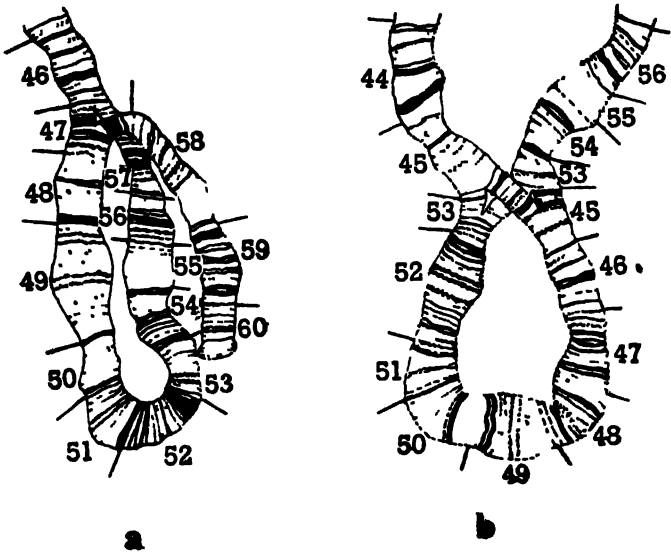
চিত্র 109
হেটারোজাইগাস ইনভারশনযুক্ত ড্রসোফিলার স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের ক্রোমোসোম।
a—স্বাভাবিক ক্রোমোসোমটা লুপের বাইরের দিকে রয়েছে;
b—লুপের ভিতরের দিকে স্বাভাবিক ক্রোমোসোমটা রয়েছে।

চারটা অপত্য কোষের দুইটাতে স্বাভাবিক ও দুইটাতে পরিবর্তিত ক্রোমোসোম থাকে।

ইনভারশন লুপে ক্রসওভার তিনটা বা চারটা ক্রোমাটিডের মধ্যে হ'লে গ্যামেটের উর্বরতা কমে যায়। ইনভারশন লুপের চারটা ক্রোমাটিডের মধ্যে দুইটা ক্রসিং-ওভার হ'লে অ্যানাফেজে দুইটা ক্রোমাটিড সেতু ও দুইটা ভগ্ন অংশ অর্থাৎ *fragment* (চিত্র 110c) দেখা যায়। প্রথম অ্যানাফেজে দুইটা সেতুই ভেঙ্গে যায়। দ্বিতীয় অ্যানাফেজ মোটামুটি স্বাভাবিক হয়। কোষ বিভাগের ফলে সৃষ্ট চারটা অপত্য কোষেই দ্বিগুণতা (*duplication*) ও ঘাটতি (*deficiency*) থাকে।

ইনভারশন লুপে তিনটা ক্রোমাটিডের মধ্যে দুইটা ক্রসওভার হ'লে একটা ক্রসওভারবিহীন (*non-crossover*) ক্রোমাটিড, একটা ক্রসওভার ক্রোমাটিড, একটা দ্বি সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত সেতু (*dicentric bridge*) ও একটা সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ভগ্ন অংশের সৃষ্টি হয় (চিত্র 110d)।

চারটা ক্রোমাটিডের মধ্যে তিনটা ক্রসিং ওভার হ'লে দুইটা দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ার-যুক্ত সেতু ও দুইটা ফ্র্যাগমেন্টের সৃষ্টি হয় (চিত্র 110e)।
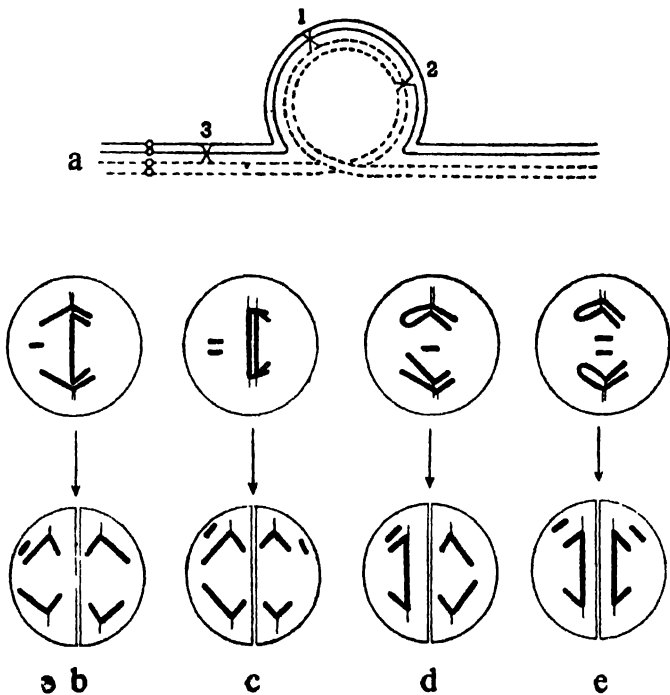
চিত্র 110

প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন হেটারোজাইগোটে ক্রোমোসোমের আচরণ, a—ইনভারশন লুপ, b, c, d, e—ইনভারশন লুপের বিভিন্ন স্থানে ক্রসিং ওভার হওয়ার ফলে নানা রকমের ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। উপরের চিত্রগুলিতে প্রথম অ্যানাফেজ এবং নীচের চিত্রগুলিতে দ্বিতীয় অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের আচরণ দেখান হয়েছে। b— ইনভারশন লুপের 1 অথবা 2 স্থানে ক্রসিং ওভার হয়েছে, c—ইনভারশন লুপের 1 ও 2 স্থানে ক্রসিং ওভারের ফলে গঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের আচরণ, d—2 ও 3 স্থানে ক্রসিং ওভারের ফলে সৃষ্ট ক্রোমোসোমের আচরণ, e—1, 2 ও 3 স্থানে ক্রসিং ওভারের ফলে গঠিত ক্রোমোসোমের আচরণ

জাইগোটিনে ইনভারশন লুপ ও অ্যানাফেজে ক্রোমাটিড ব্রীজ ও ফ্র্যাগমেন্টের উপস্থিতি থেকে ইনভারশন হেটারোজাইগোট চেনা যায়। তাছাড়া

অপ্রতিসম পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনের ফলে ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন হওয়ায় ইনভারশনের উপস্থিতি সহজেই বোঝা যায়। কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীতে হোমোজাইগাস ইনভারশন থাকলে দ্বি-সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত সেতু ও ফ্র্যাগমেন্ট দেখতে পাওয়া যায় না এবং এদের মায়োসিসের আচরণও স্বাভাবিক হয়। তবে স্বাভাবিক উদ্ভিদের সাথে ইনভারশন হোমোজাইগোটের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে ইনভারশনের জন্য লিঙ্কেজ মানচিত্র আলাদা হয়, অনেক সময় ফেনোটাইপের পরিবর্তনও দেখা যায়। ইনভারশন হেটারোজাইগোটে ইনভারশনটা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে ক্রসিং ওভার বন্ধ করে দেয়। ক্রসওভার হ'লেও যেসব গ্যামেটে ক্রসওভার ক্রোমাটিড যায় তারা সাধারণতঃ অনুর্বর হয়। ইনভারশন কখনও কখনও সংকরণের পথে বাধা হয় ও এইভাবে বিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্র্যান্সলোকেশন (*translocation*)

ক্রোমোসোমের কোন অংশের স্থান বদল বা দুইটা ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশ বিনিময়কে ট্র্যান্সলোকেশন বলা হয়। Bridges 1923 খৃষ্টাব্দে *Drosophila melanogaster*-এ ট্র্যান্সলোকেশন প্রথম দেখতে পান। ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে নানারকমের অস্বাভাবিকতা, অনুর্বরতা, ইত্যাদি দেখা যায়।

ট্র্যান্সলোকেশন বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন—(*a*) সরল (*simple*) ট্র্যান্সলোকেশন, (*b*) রেসিপ্রোক্যাল (*reciprocal*) বা পরস্পর বিনিময় ট্র্যান্সলোকেশন, (*c*) শিফট (*shift*) বা একই ক্রোমোসোমের কোন অংশের স্থান বদল, (*d*) সন্নিবিষ্ট ট্র্যান্সলোকেশন (*insertion*) অর্থাৎ ক্রোমোসোমের মধ্যবর্তী কোন অংশ ভগ্ন হয়ে ঐ অংশের অন্য ক্রোমোসোমের মধ্যবর্তী কোন স্থানে সংযুক্তি এবং (*e*) রবার্টসোনীয় (*Robertsonian*) ট্র্যান্সলোকেশন বা কেন্দ্রীয সংযোগ (*centric fusion*)।

(*a*) **সরল ট্র্যান্সলোকেশন**

এইরকমের ট্র্যান্সলোকেশনে ক্রোমোসোমের প্রান্তের অংশ ভেঙ্গে গিয়ে হোমোলোগাস নয় এমন কোন ক্রোমোসোমের প্রান্তে যুক্ত হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদে এই ধরনের ট্র্যান্সলোকেশন দেখা যায়। সম্ভবতঃ প্রান্তীয় হেটারোক্রোমাটিনের উপস্থিতি এই প্রক্রিয়াকে সুগম করে। ক্রোমোসোমের কেবল একটা জায়গায় ভেঙ্গে গিয়ে সরল ট্র্যান্সলোকেশন হয়।

সৃষ্টি হতে পারে। দ্বিসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোসোমটার সেন্ট্রোমিয়ার দুইটা খুব কাছে থাকলে এরা একটা সেন্ট্রোমিয়ারের মতন আচরণ করতে পারে।

কেন্দ্রীয় সংযোগের বিপরীত প্রক্রিয়া হ'ল কেন্দ্রীয় ফিশন (*fission*) বা বিযুক্ততা (*dissociation*)। একটা দীর্ঘ মেটাসেন্ট্রিক বা V-আকৃতির ক্রোমোসোমের সাথে একটা ছোট ক্রোমোসোমের অসমান অংশের ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে দুইটা অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (*acrocentric*) বা J-আকৃতির ক্রোমোসোমের (চিত্র 113) সৃষ্টি হতে পারে। এই রকমের ট্র্যান্সলোকেশনকে বিযুক্ততা (*dissocia-*
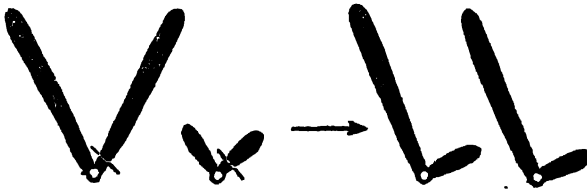
চিত্র 113
একটা V-আকৃতির ক্রোমোসোমের সাথে একটা ছোট ক্রোমোসোমের অসমান অংশের ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে দুইটা অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে

tion) বা কেন্দ্রীয় ফিশন (*centric fission*) বলে। কোন কোন উদ্ভিদে ও অনেক প্রাণীর বিবর্তনে কেন্দ্রীয় সংযোগ বা কেন্দ্রীয় ফিশনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় সংযোগ এবং কেন্দ্রীয় ফিশনের ফলে ক্রোমোসোমের আকৃতির এবং কখনও কখনও ক্রোমোসোমের সংখ্যার পরিবর্তন হয়।

ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে নূতন ক্রোমোসোমের একটা সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ও অন্যটা দ্বিসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত হ'লে কোষ বিভাগের সময় এদের আচরণ অস্বাভাবিক হয় ও এরা সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।

হোমোলোগাস (সমসংস্থ) নয় এমন দুইটা ক্রোমোসোমের মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলে ট্র্যান্সলোকেশনের সৃষ্টি হতে পারে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠীতে ট্র্যান্সলোকেশন পাওয়া যায় তবে এদের সংখ্যা খুব কম। কৃত্রিম উপায়ে রঞ্জনরশ্মি ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ করে অনেক উদ্ভিদে ট্র্যান্সলোকেশন পাওয়া গিয়েছে। Belling ও Blakeslee (1924) ধুতরার বিভিন্ন ধরনের ট্র্যান্সলোকেশন নিয়ে গবেষণা করেছেন। ট্র্যান্সলোকেশন হোমোজাইগোটে মায়োসিসের আচরণ স্বাভাবিক হয় সেইজন্য ট্র্যান্সলোকেশনের উপস্থিতি সহজে বোঝা যায় না। তবে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে লিঙ্কেজ গ্রুপের (*linkage*

group) পরিবর্তন হয় বলে এইরকমের অস্বাভাবিকতা জেনেটিক পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়। ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটের মায়োসিসের আচরণ অস্বাভাবিক হয় ও এই সময় ক্রুসাকার (চিত্র 111), বলয়াকার ও শৃংখলাকার (*cross, ring, chain*) ক্রোমোসোম জোট দেখা যায়। কোন উদ্ভিদে এইরকমের বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোসোম জোটের উপস্থিতি থেকে বলা যায় যে ঐ উদ্ভিদটা হ'ল ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট। *Rhoeo discolor, Oenothera lamerckiana, Datura stramonium* ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্ভিদে মায়োসিস বিভাগের সময় রিঙ (*ring*) বা বলয়াকার ক্রোমোসোম জোট (চিত্র 114) দেখা গিয়েছে।

চিত্র 114

Oenothera lamerckiana-এ ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে সৃষ্ট বলয়াকার ক্রোমোসোম জোট

ট্র্যান্সলোকেশন খুব ছোট না হলে ঐ অংশে এক বা একাধিক কায়েসমার সৃষ্টি হয়। কায়েসমার সংখ্যা ও অবস্থানের উপর মেটাফেজ ক্রোমোসোমের আকৃতি নির্ভর করে। প্রত্যেক বাহুতে অন্ততঃ একটা কায়েসমা গঠিত হ'লে ও কায়েসমার প্রান্তিকরণ (*terminalization*) সম্পূর্ণ হ'লে মেটাফেজে রিঙ বা বলয় দেখা যায় (চিত্র 115c)। কায়েসমার প্রান্তিকরণ অসম্পূর্ণ হলে ক্রুসাকৃতির (চিত্র 115b) ক্রোমোসোম জোট দেখা যায়। কোন একটা বাহুতে যদি কায়েসমা গঠিত না হয় তবে চারটা ক্রোমোসোমের একটা শৃংখল (*chain*) পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ অ্যানাফেজে বলয়াকার বা শৃংখলাকার ক্রোমোসোম জোটের
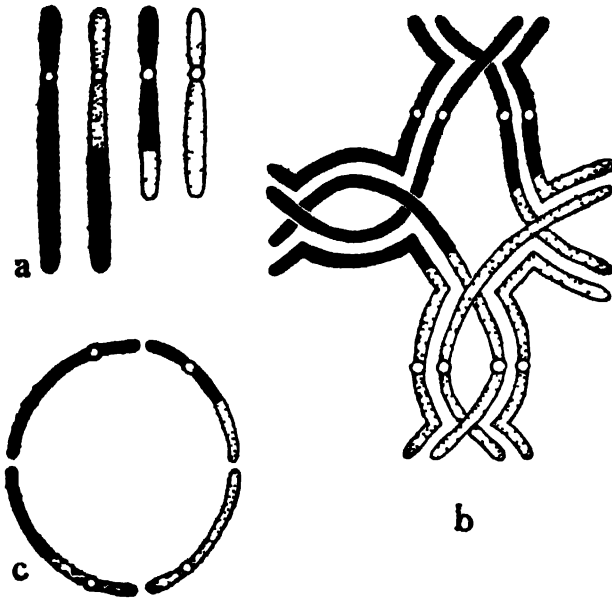
চিত্র 115

a—ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটে দুইটা স্বাভাবিক ও দুইটা পরিবর্তিত ক্রোমোসোম,

b—ডিপ্লোটিন অবস্থায় প্রত্যেক ক্রোমোসোমে দুইটা ক্রোমাটিড থাকে। এখানে বিভিন্ন ক্রোমাটিডের মধ্যে কয়েকটা কায়েসমা গঠিত হয়েছে,

c—মেটাফেজ অবস্থায় কায়েসমার প্রান্তিকরণ সম্পূর্ণ হ'লে একটা বলয় বা রিঙ দেখা যায়।

একটা ক্রোমোসোম এক মেরুতে ও তার পাশের ক্রোমোসোম বিপরীত মেরুতে পর্যায়ক্রমে যায়। এর ফলে একটা মেরুতে দুইটা স্বাভাবিক ক্রোমোসোম ও অন্য মেরুতে দুইটা ট্র্যান্সলোকেশনযুক্ত ক্রোমোসোম থাকে (চিত্র 116a)। এখানে অপত্য কোষ দুইটার কোনটাতে ক্রোমোসোমের কোন অংশের ঘাটতি বা দ্বিগুণতা না থাকায় গ্যামেটগুলি উর্বর হয় এবং এদের সমতাপূর্ণ বা সুষম (*balanced*) গ্যামেট বলা হয়।

এছাড়া কোন কোন সময় পাশাপাশি ক্রোমোসোম একটা মেরুতে যেতে পারে। a, b, c, d চারটা ক্রোমোসোমের a, c স্বাভাবিক ও b, d ট্র্যান্সলোকেশনযুক্ত ক্রোমোসোম হ'লে অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমগুলির বন্টন বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

(*i*) a, c একমেরুতে এবং b, d অন্য মেরুতে গেলে সুষম গ্যামেট তৈরী হয় (চিত্র 116a)।

(*ii*) পাশাপাশি দুইটা ক্রোমোসোম অর্থাৎ a, b একটা মেরুতে এবং c, d অন্য মেরুতে যেতে পারে (চিত্র 116b)।
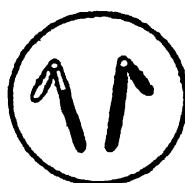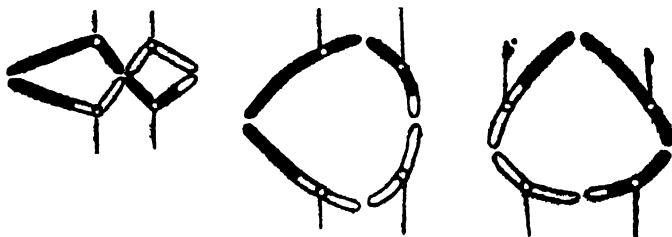
চিত্র 116

অ্যানাফেজে বলয়াকার ক্রোমোসোম জোটের বিভিন্ন রকমের পৃথকীকরণের ফলে নানা রকমের গ্যামেটের সৃষ্টি হয়েছে

(*iii*) b, c একটা মেরুতে এবং a, d অন্য মেরুতে যেতে পারে (চিত্র 116c)।

শেষোক্ত দুইটা উপায়ে সৃষ্ট গ্যামেটগুলি অনুর্বর হয় এবং এদের সমতা-

বিহীন (বা *unbalanced*) গ্যামেট বলা হয়। এইভাবে সৃষ্ট প্রত্যেক গ্যামেটেই ক্রোমোসোমের কোন অংশের ঘাটতি আবার অন্য কোন অংশের দ্বিগুণতা থাকে।

অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের বন্টন যদৃচ্ছভাবে হ'লে কেবল এক তৃতীয়াংশ গ্যামেট (i ধরনের) উর্বর হয়। তবে ভুট্টা এবং ড্রসোফিলার গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে অ্যানাফেজের বন্টন এমনভাবে হয় যাতে বেশী সংখ্যায় উর্বর গ্যামেট তৈরী হতে পারে। ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে সৃষ্ট বলয়টা (*ring*) যত নমনীয় হবে ততই পর্যায়ক্রমিক পৃথকীকরণের সম্ভাবনা বাড়বে। অ্যানাফেজে ক্রোমোসোমের বন্টন ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য, ট্র্যান্সলোকেশনের স্থান, কায়েসমার সংখ্যা ও অবস্থান, কায়েসমার প্রান্তিকরণ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

ট্র্যান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটে স্ব-পরাগযোগ হলে তিন রকমের উদ্ভিদ 1:2:1 অনুপাতে পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদগুলি হ'ল যথাক্রমে ট্র্যান্সলোকেশনবিহীন স্বাভাবিক হোমোজাইগোট, ট্র্যান্সলোকেশন হেটারো-জাইগোট এবং ট্র্যান্সলোকেশন হোমোজাইগোট। প্রথম ও তৃতীয় ধরনের উদ্ভিদের মায়োসিসের আচরণ স্বাভাবিক হয় ও ফলে উদ্ভিদটা উর্বর হয়। দ্বিতীয় ধরনের উদ্ভিদের মায়োসিসে বলয়াকার, শৃঙ্খলাকার বা ক্রুসাকৃতির ক্রোমোসোম জোট দেখা যায় ও এরা আংশিকভাবে উর্বর।

Datura, Oenothera, Pisum, Paeonia, Tradescantia, Triticum, Zea প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদে এবং ফড়িং ও অন্যান্য প্রাণীতে ট্র্যান্সলোকেশন দেখা গিয়েছে। Blakeslee ধুতরায় বিভিন্ন ধরনের ট্র্যান্সলোকেশন দেখতে পান। ধুতরার ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল $2n = 12$। এই বার জোড়া ক্রোমোসোমের প্রত্যেকটাকে দুইটা সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয় (1—2, 3—4, 5—6, 7—8, 9—10, 11—12, 13—14, 15—16, 17—18, 19—20, 21—22, 23—24)। *Datura stramonium*-এর (ধুতরা) যেসব বিভিন্ন রকমের গাছ দেখতে পাওয়া যায় তাদের "প্রাইম টাইপ" (*prime type*) বলে। প্রাইম টাইপ থেকে একটা ট্র্যান্সলো-কেশনের মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্ভিদকে "উদ্ভূত প্রাইম টাইপ" (*derived prime type*) বলে। দুই বা তারচেয়ে বেশী সংখ্যক ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদকে সেকেণ্ডারী টাইপ (*secondary type*) বলা হয়।

"প্রাইম টাইপ একে"র মায়োসিসে বার জোড়া স্বাভাবিক ক্রোমোসোম থাকে। প্রাইম টাইপ এক এবং দুইয়ের মধ্যে সংকরণ করলে সংকর উদ্ভিদের প্রথম মায়োসিস বিভাগের সময় দশ জোড়া ক্রোমোসোম বাইভ্যালেন্ট গঠন করে ও বাকী চারটা ক্রোমোসোম একটা বলয় (*ring*) গঠন করে। "প্রাইম

টাইপ দুইয়ের" দুইটা ক্রোমোসোমের মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশন হওয়ার ফলে এরা প্রাইম টাইপ একের ক্রোমোসোম থেকে আলাদা হয়। 1—2 ও 17—18 ক্রোমোসোমের 2 ও 18 প্রান্ত দুইটার মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে 1—18 এবং 17—2 ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাইম টাইপ এক ও দুইয়ের থেকে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদের বলয়াকার ক্রোমোসোম জোটটা চিত্র 117a-তে দেখান হয়েছে। প্রাইম টাইপ দুইয়ের মায়োসিস বিভাগের সময় কোন রিঙ পাওয়া যায় না অর্থাৎ এই উদ্ভিদটা হ'ল ট্র্যান্সলোকেশন হোমোজাইগোট (*translocation homozygote*)।

প্রাইম টাইপ তিনের মায়োসিসেও ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থান করে। এই উদ্ভিদের সাথে প্রাইম টাইপ একের সংকরণ করলে দশটা বাইভ্যালেন্ট ও চারটা ক্রোমোসোমের একটা রিঙ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাইম টাইপ তিন হ'ল ট্র্যান্সলোকেশন হোমোজাইগোট। প্রাইম টাইপ দুই ও তিনের ট্র্যান্সলোকেশনটা এক কিনা দেখবার জন্য এই দুইটা উদ্ভিদের মধ্যে সংকরণ করা হয়। এই সংকর উদ্ভিদের মায়োসিসে আটটা বাইভ্যালেন্ট ও চারটা ক্রোমোসোম দিয়ে তৈরী দুইটা রিঙ দেখা যায়। সুতরাং প্রাইম টাইপ দুই ও তিনের ট্র্যান্সলোকেশন দুইটা আলাদা। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে প্রাইম টাইপ তিনের পরিবর্তিত ক্রোমোসোম দুইটা হ'ল 11—21 এবং
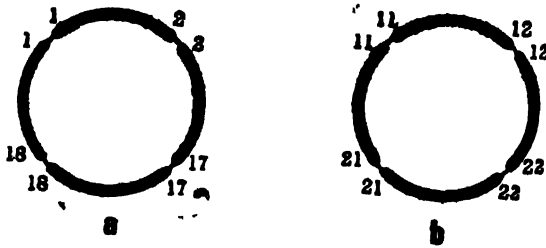
চিত্র 117

ধুতরায় বিভিন্ন ক্রোমোসোমের মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে গঠিত বলয় (*ring*); a — 1—2 এবং 17—18 ক্রোমোসোম দুইটার মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশন হয়েছে,
b — 11—12 ও 21—22 ক্রোমোসোমের মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশন হয়েছে

12—22। প্রাইম টাইম তিনের সাথে প্রাইম টাইপ একের সংকরণের ফলে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদের মায়োসিসের বলয়টা চিত্র 117b অনুযায়ী হয়।

প্রাইম টাইপ এক এবং সেকেন্ডারী টাইপ চুরানব্বইয়ের মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদের মায়োসিসে নয়টা বাইভ্যালেন্ট ও ছয়টা ক্রোমোসোমের একটা রিঙ পাওয়া যায়। সেকেন্ডারী টাইপ 94-এ ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে সৃষ্ট ক্রোমোসোমগুলি হ'ল 1—14, 13—18 ও 17—2 অর্থাৎ এখানে দুইবার ট্র্যান্সলোকেশন হয়েছে। এই উদ্ভিদের সাথে প্রাইম টাইপ (*prime type*) একের সংকরণের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদের মায়োসিসে ছয়টা ক্রোমোসোমের রিঙ (চিত্র 118) পাওয়া যায়।
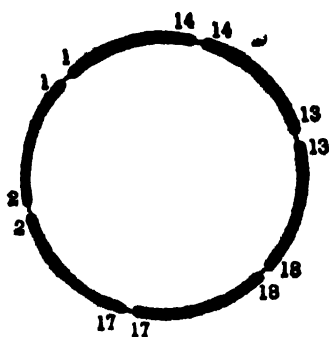
চিত্র 118

ধুতরার বিভিন্ন ক্রোমোসোমের (1—2, 13—14, 17—18) মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে গঠিত বলয়

প্রাইম টাইপ দুই ও চুরানব্বইয়ের মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদের মায়োসিসে দশটা বাইভ্যালেন্ট ও চারটা ক্রোমোসোম দিয়ে গঠিত একটা রিঙ পাওয়া যায়।

প্রাইম টাইপ তিন ও চুরানব্বই থেকে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদের মায়োসিসে সাতটা বাইভ্যালেন্ট, একটা চার ক্রোমোসোমের রিঙ ও একটা ছয় ক্রোমোসোমের রিঙ (চিত্র 119) পাওয়া যায়। ধুতরায় কায়েসমার প্রান্তিকরণ (*terminalization*) প্রায় সম্পূর্ণ হয় বলে অ্যানাফেজে বলয়াকার ক্রোমোসোম জোটের একটা ক্রোমোসোম এক মেরুতে ও তার পাশের ক্রোমোসোমটা বিপরীত মেরুতে পর্যায়ক্রমে যায়। এইজন্য গ্যামেটগুলি উর্বর হয়।

সুতরাং সংকরণ করে কোন উদ্ভিদের ট্র্যান্সলোকেশনকে চেনা সম্ভব। হোমোলোগাস নয় এমন দুইটা ক্রোমোসোমের মধ্যে একটা ট্র্যান্সলেকেশন হ'লে একটা চার ক্রোমোসোমের রিঙ তৈরী হয়। এই ট্র্যান্সলোকেশনযুক্ত

ক্রোমোসোমের সাথে অন্য আরেকটা ক্রোমোসোমের ট্র্যান্সলোকেশন (দ্বিতীয়) হ'লে একটা ছয় ক্রোমোসোমের (চিত্র120) রিঙের সৃষ্টি হয়। এই ট্র্যান্স-লোকেশনযুক্ত ক্রোমোসোমের কোনটার সাথে আরেকটা ক্রোমোসোমের তৃতীয় ট্র্যান্সলোকেশন হ'লে আট ক্রোমোসোমের রিঙ বা বলয়ের সৃষ্টি হয়। এইভাবে অনেকগুলি ট্র্যান্সলোকেশন হ'লে কোষের সব ক্রোমোসোম দিয়ে তৈরী একটা বড় রিঙ পাওয়া যায় ও এটাকে ট্র্যান্সলোকেশন কমপ্লেক্স (*translocation complex*) বলে। *Rhoeo discolor*-এ ($2n = 12$) 12টা ক্রোমোসোম দিয়ে তৈরী একটা রিঙ বা বলয় পাওয়া গিয়েছে।

Oenothera-এ deVries বিভিন্ন ধরনের ট্র্যান্সলোকেশন পেয়েছিলেন। *O. hookeri*-র ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল $2n = 14$। এখানে মায়োসিসে সাতটা বাইভ্যালেন্ট দেখা যায়। *Oenothera*-র অন্যান্য প্রজাতিতে চারটা ক্রোমোসোমের রিঙ থেকে আরম্ভ করে চোদ্দটা ক্রোমোসোমের রিঙও দেখতে পাওয়া যায় (চিত্র 114)।
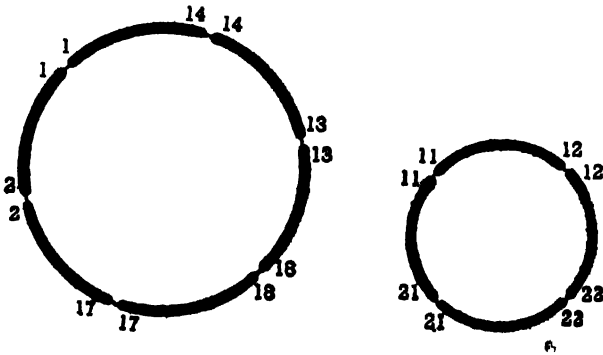
চিত্র 119

ধুতরায় বিভিন্ন ক্রোমোসোমের মধ্যে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে সৃষ্ট একটা ছয়টা ক্রোমোসোম ও আরেকটা চারটা ক্রোমোসোম দিয়ে গঠিত বলয়

অবস্থানের প্রভাব (*position effect*)

1925 খৃষ্টাব্দে *Drosophila*-র "বার" (*Bar*) চরিত্রের উপর গবেষণা করে Sturtevant অবস্থানের প্রভাব বা *position effect* প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন। এর পর বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ *Drosophila* (Lewis '50,

'51, '52, 55 ; Green '49, '54, '55), *Oenothera* (Catcheside '47) এবং ভুট্টায় (McClintock '51, '53) অবস্থানের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

ট্র্যান্সলোকেশন কিম্বা ইনভারশনের ফলে ক্রোমোসোমীয় পদার্থের কোন লাভ বা লোকসান হয় না। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে কেবল কোন

চিত্র 120
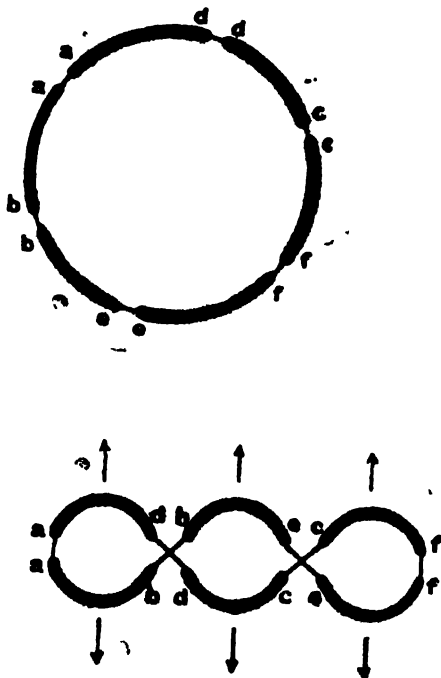
দুইবার ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে একটা ছয়টা ক্রোমোসোম দিয়ে গঠিত বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই বলয়টা পরে পেঁচিয়ে যাওয়ার ফলে পর্যায়ক্রমিক পৃথকীকরণের সুবিধা হয়েছে।

কোন জীনের পুনর্বিন্যাস হয় এবং এজন্য কখনও কখনও ফেনোটাইপের (*phenotype*) পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনকে অবস্থানের প্রভাব বা পোজিশন এফেক্ট বলে। প্রত্যেক জীন প্রতিবেশী জীনের সাথে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। জীনের বিন্যাসের কোন পরিবর্তন হ'লে এই ভারসাম্য ব্যাহত হয় ও কখনও কখনও ফেনোটাইপের পরিবর্তন দেখা যায়। সুতরাং ফেনোটাইপ কেবল জীনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তাই নয় জীনের অবস্থানও ফেনোটাইপকে প্রভাবিত করে।

যদি কোন স্ত্রী ড্রসোফিলার দুইটা X-ক্রোমোসোমের প্রতিটিতে একটা 16A অংশ থাকে তবে ঐ ড্রসোফিলার চোখ সাধারণ হয়। পুরুষ ড্রসোফিলায় একটা 'X'-ক্রোমোসোম থাকে ও ঐ ক্রোমোসোমে যদি দুইটা 16A অংশ থাকে তবে "বার-চোখের" (*Bar-eye*) সৃষ্টি হয়। সুতরাং যদিও দুইটা ক্ষেত্রেই 16A অঞ্চল দুইবার আছে কিন্তু এদের বিন্যাসের বিভিন্নতার জন্য ফেনোটাইপের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। কোন ড্রসোফিলায় একটা X-ক্রোমোসোমে পরপর তিনবার 16A অংশ থাকলে "বার-ডাবল" (*bar-double*) চোখের সৃষ্টি হয়। অন্য 'X'-ক্রোমোসোমে যদি একটা 16A অংশ থাকে তাহলেও "বার-ডাবল" চোখের সৃষ্টি হয়। একই সংখ্যক অর্থাৎ চারটা 16A অঞ্চল হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকলে বার-ডাবল চোখের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং ড্রসোফিলায় 16A অঞ্চলের অবস্থান ফেনোটাইপকে প্রভাবিত করে (চিত্র 121)।
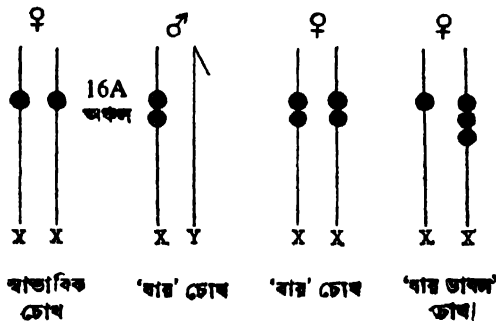
চিত্র 121

ড্রসোফিলায় X-ক্রোমোসোমে 16A অঞ্চল একবার থাকলে স্বাভাবিক চোখ, পরপর দুইবার থাকলে 'বার' চোখ এবং পরপর তিনবার থাকলে 'বার-ডাবল' চোখের সৃষ্টি হয়

স্বাভাবিক ও রোমশ পাখাযুক্ত (*hairy wing*) ড্রসোফিলার উপর পরীক্ষা থেকেও অবস্থানের প্রভাব বোঝা যায়। X-ক্রোমোসোমের একটা ব্যাণ্ডের দ্বিগুণতার জন্য রোমযুক্ত পাখার সৃষ্টি হয়। X-ক্রোমোসোমে নির্দিষ্ট ব্যাণ্ডটা একবার থাকলে পতঙ্গটার পাখায় রোম থাকে না। স্ত্রী পতঙ্গের দুইটা X-ক্রোমোসোমের প্রত্যেকটাতে ঐ ব্যাণ্ডটা একটা করে (অর্থাৎ মোট দুইটা) থাকলে ঐ ড্রসোফিলার পাখা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু

পদার্থ তৈরী করার ক্ষেত্রে এক একটা ধাপের নির্দেশ করে। একটা ক্রোমো-সোমে সব ডমিন্যান্ট অ্যালীলগুলি (M_1 M_2) থাকলে নির্দিষ্ট পদার্থের উৎপাদন স্বাভাবিকভাবে হয়। কিন্তু কোন একটা জীন যদি রিসেসিভ অবস্থায় থাকে (M_1 m_2) তবে ঐ পদার্থের উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং এর ফলে রিসেসিভ চরিত্র প্রকাশিত হয়।

অবস্থানের প্রভাব বা পোজিশন এফেক্টের কারণ সম্বন্ধে দুইটা মতবাদ আছে।

(1) Ephrussi ও Sutton-এর (1944) আকৃতির মত (*structural hypothesis*) অনুসারে জীনের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে তাদেব কাজের পরিবর্তন হয় ও শেষে ফেনোটাইপের পরিবর্তন হয়। এই পরি-বর্তন প্রত্যাবর্তনীয় (*reversible*)।

(২) দ্বিতীয় মতবাদ হ'ল Sturtevant-এর (1925) গতিশক্তির (*kinetic*) মত। Sturtevant-এব মত অনুসারে দুইটা প্রতিবেশী জীনের প্রভাবে সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। কিন্তু জীনেব অবস্থানের পবিবর্তন হ'লে এই বিক্রিয়া যথাযথভাবে হ'তে পারে না এবং ফেনোটাইপে এর প্রভাব পড়ে। Lewis-ও (1951, 1955) এই মতের সমর্থন কবেছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ক্রোমোসোম সংখ্যার পরিবর্তন ও পলিপ্লয়েডি
(Polyploidy)

ক্রোমোসোম সংখ্যার পরিবর্তনকে প্রধানতঃ দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

(*a*) যেসব জীবের দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা ঐ প্রজাতির মূল সংখ্যার (*basic number*) যথাযথ গুণফল হয় তাদের ইউপ্লয়েড (*euploid*) বলে। যেমন, কোন প্রজাতির বেসিক সংখ্যা 6 হ'লে ইউপ্লয়েডের ক্রোমোসোম সংখ্যা 18 (ট্রিপ্লয়েড), 24 (টেট্রাপ্লয়েড), 30 (পেন্টাপ্লয়েড) ইত্যাদি হয়ে থাকে। ইউপ্লয়েড জীবকে পলিপ্লয়েড বলা হয়। প্রাণীর তুলনায় উদ্ভিদে অনেক বেশী পলিপ্লয়েডি দেখা যায়।

(*b*) যেসব জীবের দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা ঐ প্রজাতির বেসিক সংখ্যার যথাযথ গুণফল হয় না তাদের অ্যানইউপ্লয়েড (*aneuploid*) বলে, অর্থাৎ বেসিক সংখ্যা 6 হ'লে অ্যানইউপ্লয়েডের ক্রোমোসোম সংখ্যা 10—11, 13—17, 19—23, 25—29 ইত্যাদি হয়। অ্যানইউপ্লয়েড জীবকে হেটারোপ্লয়েড (*heteroploid*) বা অনিয়মিত পলিপ্লয়েড (*irregular polyploid*) বলা হয়। কোন জীবের ক্রোমোসোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড, ট্রিপ্লয়েড, টেট্রাপ্লয়েড ইত্যাদির চেয়ে কিছু বেশী হ'লে তাদের হাইপারপ্লয়েড (*hyperploid*) এবং ঐ সংখ্যার চেয়ে কিছু কম হ'লে তাদের হাইপোপ্লয়েড (*hypoploid*) বলে। যদি ডিপ্লয়েড সংখ্যা 8 ও ট্রিপ্লয়েড সংখ্যা 12 হয় তবে 9—11 ক্রোমোসোম সংখ্যাযুক্ত উদ্ভিদকে হাইপারডিপ্লয়েড কিম্বা হাইপোট্রিপ্লয়েড বলা হয়।

পলিপ্লয়েডকে কখনও কখনও প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী এই দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেসব পলিপ্লয়েড কোন জীবের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার ফলে সরাসরি গঠিত হয় তাদের প্রাথমিক বা প্রাইমারী (*primary*) পলিপ্লয়েড বলে এবং এইসব জীবে জোড় সংখ্যক জীনোম থাকে। যেসব পলিপ্লয়েড দুইটা জীবের মধ্যে সংকরণের ফলে গঠিত হয় তাদের সেকেন্ডারী পলিপ্লয়েড বলে, যেমন, একটা ডিপ্লয়েড জীবের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে প্রাইমারী পলিপ্লয়েড (এক্ষেত্রে 4n) জীবের সৃষ্টি হ'ল, এর সাথে আরেকটা ডিপ্লয়েড জীবের সংকরণের ফলে সেকেন্ডারী পলিপ্লয়েড (এক্ষেত্রে 3n) জীব গঠিত হতে পারে।

ইউপ্লয়েড (*euploid*)

কোন জীবে বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোম কেবল একটা ক'রে থাকলে (অর্থাৎ একটা জীনোম বা ক্রোমোসোম সেট) ঐ জীবকে হ্যাপ্লয়েড জীব বলে। হ্যাপ্লয়েড জীব হেমিজ়াইগাস (*hemizygous*)। যেসব জীবের কোষে বিভিন্ন রকমের ক্রোমোসোম প্রত্যেকটা দুইটা ক'রে থাকে তাদের ডিপ্লয়েড (2n) বলে। ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ বা প্রাণীর দুইটা জীনোম একই রকম বা আলাদা হয়। দুইটা জীনোমের মধ্যে পার্থক্য থাকলে ঐ উদ্ভিদকে ডিপ্লয়েড সংকর (*hybrid*) উদ্ভিদ বলে। কোন জীবের কোষে তিনটা জীনোম থাকলে তাদের ট্রিপ্লয়েড (3n) বলে। একইভাবে চার, পাঁচ, ছয়, আটটা জীনোমযুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদকে যথাক্রমে টেট্রাপ্লয়েড (4n), পেন্টা-প্লয়েড (5n), হেক্সাপ্লয়েড (6n) এবং অক্টোপ্লয়েড (8n) বলে।

ইউপ্লয়েড প্রধানতঃ দুই রকমের হয়। যেসব ইউপ্লয়েডের জীনোমগুলি একই রকম হয় তাদের **অটোপলিপ্লয়েড** (*autopolyploid*) বলে। 'A' একটা জীনোম হলে, অটোট্রিপ্লয়েড (*autotriploid*) AAA, অটোটেট্রা-প্লয়েড (*autotetraploid*) AAAA হবে। কোন ইউপ্লয়েডে বিভিন্ন ধরনের জীনোম থাকলে তাদের **অ্যালোপলিপ্লয়েড** (*allopolypolid*) বলে। যদি একটা জীনোম 'A' ও অন্য আরেকটা জীনোম 'B' হয় তবে AABB জীনোমযুক্ত উদ্ভিদকে **অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড** (*allotetrapolid*) বলা হয়। সংকরণের (*hybridization*) ফলে অ্যালোপলিপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হয়।

পলিপ্লয়েডির ফলে উদ্ভিদে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। পলিপ্লয়েড ডিপ্লয়েডের তুলনায় বড়, সবল হয়; এরা ক্রোমোসোমের ঘাটতি অনেক বেশী সহ্য করতে পারে এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সহজেই মানিয়ে নেয়। পলিপ্লয়েডির ফলে অনেক সময় অতিকায় (*giant*) উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। খুব বড় টেট্রাপ্লয়েড *Anterrhinum, Amaryllis, Tajatus, Vitis* ইত্যাদি (চিত্র 123) দেখা গিয়েছে।

হ্যাপ্লয়েড (*haploid-n*)

নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের দেহ সাধারণতঃ হ্যাপ্লয়েড হয় অর্থাৎ এই উদ্ভিদ-গুলি হ'ল গ্যামেটোফাইট বা লিঙ্গধর উদ্ভিদ। কোন কোন পতঙ্গের পুরুষ হ্যাপ্লয়েড হয়, যেমন—মৌমাছি। এইসব জীবে হ্যাপ্লয়েড অবস্থার জন্য কোন অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। এখানে প্রথম মায়োসিস বিভাগ হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগ নিয়মিতভাবে হয় ও গ্যামেট তৈরী হয়।
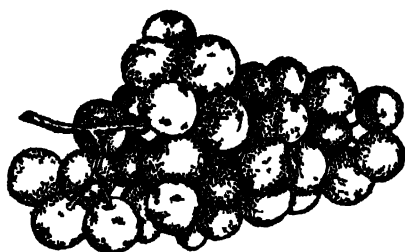
চিত্র 123
ডিপ্লয়েড (2n = 38) এবং টেট্রাপ্লয়েড (2n = 76) আঙ্গুর

স্বাভাবিকভাবে ডিপ্লয়েড জীব কোন কারণে হ্যাপ্লয়েড হ'লে, ঐ অবস্থায় তারা মানিয়ে নিতে পারে না। এদের মায়োসিস খুব অনিয়মিত হয়। জাইগোটিনে ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতা না হওয়ায় অ্যানাফেজে যে কোন ক্রোমোসোম যে কোন মেরুতে যায়। এর ফলে গ্যামেটে ক্রোমোসোমের ঘাটতি থাকে ও এইসব জীব অনুর্বর হয়। তবে কোন সময় অ্যানাফেজে সব ক্রোমোসোমগুলিই একটা মেরুতে গেলে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটের সৃষ্টি হয়। এইরকম দুইটা গ্যামেটের মিলন হ'লে স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কখনও কখনও হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের কোন কোন ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতা দেখা যায়। *Sorghum*-এর হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের মায়োসিসে 1—3টা বাইভ্যালেন্ট (*bivalent*) পাওয়া গিয়েছে। *Triticum monococcum*-এর হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের ডায়াকাইনেসিসে সব কিম্বা কতকগুলি ক্রোমোসোম পরস্পর যুক্ত হয়ে শৃঙ্খল (*chain*) গঠন করে কিন্তু এখানে ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতা কেবল দুই শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে।

হ্যাপ্লয়েড জীব ডিপ্লয়েডের তুলনায় ছোট, দুর্বল, অপরিণত হয় ও বেশী দিন বাঁচে না।

বিভিন্ন উপায়ে হ্যাপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হয়। (*a*) অনিষিক্ত অর্থাৎ ফার্টিলাইজেশন হয় নাই এমন ডিম্বাণু থেকে (*b*) কিম্বা অনিষিক্ত শুক্রাণু (স্পার্ম) থেকে হ্যাপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হতে পারে। হঠাৎ পরিবেশের পরিবর্তন হলে হ্যাপ্লয়েড প্রাণী গঠিত হয়ে থাকে।

Dactylis glomerata, Hordeum vulgare, Phleum pratense, Poa sp, Triticum vulgare প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদের হ্যাপ্লয়েড সদস্য পাওয়া গিয়েছে। কোন হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের উপর গবেষণা করে ঐ উদ্ভিদের বেসিক বা মূল ক্রোমোসোম সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। হ্যাপ্লয়েডের মায়োসিসে যুগ্মতা দেখা গেলে বোঝা যাবে যে এর ক্রোমোসোম সংখ্যা বেসিক সংখ্যা নয় কিম্বা ক্রোমোসোমে দ্বিগুণতা (*duplication*) আছে। হ্যাপ্লয়েড গোলমরিচের ক্রোমোসোম সংখ্যা $n = 12$, কিন্তু মায়োসিসে ছয় জোড়া ক্রোমোসোম অর্থাৎ ছয়টা বাইভ্যালেন্ট দেখা যায়। এর থেকে Christensen ও Bamford (1943) সিদ্ধান্ত করেন যে 24টা ক্রোমোসোম-যুক্ত ডিপ্লয়েড গোলমরিচ আসলে পলিপ্লয়েড। সম্ভবতঃ এই কারণেই হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড গোলমরিচের মধ্যে পাতা, ফুল, বা গাছের আয়তনের পার্থক্য হয় না, যদিও হ্যাপ্লয়েড গোলমরিচে তুলনামূলকভাবে ছোট পত্ররন্ধ্র (চিত্র 124), কম পরাগরেণু ও ছোট ফল দেখতে পাওয়া যায়।
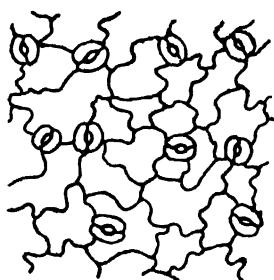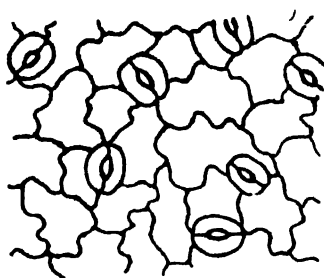
চিত্র 124

হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড গোলমরিচের পত্ররন্ধ্রের আয়তন ও সংখ্যার পার্থক্য

হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদকে কলচিসিন (*colchicine*) প্রয়োগ করে খুব সহজেই সম্পূর্ণ হোমোজাইগাস ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়। উদ্ভিদ প্রজনে এজন্য হ্যাপ্লয়েডের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

অটোপলিপ্লয়েড (*autopolyploid*)

ডিপ্লয়েডের তুলনায় অটোপলিপ্লয়েড বড় হয়। এদের কোষের এবং পত্ররন্ধ্রের আয়তন বেশী হয়, পাতার রঙ গাঢ় সবুজ হয়, ফুল দেরীতে ফোটে এবং গাছটা ধীরে ধীরে বাড়ে। অটোপলিপ্লয়েডের প্রথম মায়োটিক বিভাগের মেটাফেজ অবস্থায় মালটিভ্যালেন্ট (*multivalent*) দেখা যায়।

টেট্রাপ্লয়েডের চেয়ে উচ্চতর পলিপ্লয়েডে নানা রকম অস্বাভাবিকতা, যেমন, খর্বাকৃতির দুর্বল গাছ, কোঁকড়ান পাতা ইত্যাদি দেখা যায় (Stebbins 1950)। পলিপ্লয়েডির কোন ধাপে এইসব ক্ষতিকর অস্বাভাবিকতা দেখা দেবে তা প্রজাতির উপর কিম্বা ঐ নির্দিষ্ট গাছের উপর নির্ভর করে।

Nicotiana langsdorfii-র হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড, ট্রিপ্লয়েড, টেট্রাপ্লয়েড ও অক্টোপ্লয়েড উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করে Smith দেখেন যে হ্যাপ্লয়েড থেকে টেট্রাপ্লয়েড পর্যন্ত ক্রোমোসোম সেট (*set*) বা জীনোমের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে দলমণ্ডল (*corolla*) চওড়া হয়, পাতার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত বাড়ে; কোষের আয়তন [যেমন রক্ষী কোষ (*guard cell*), পরাগরেণুর কোষ, পাতা ও মূলাগ্রের কোষ, ইত্যাদি] বাড়ে, গাছের বিভিন্ন অংশ স্থূল হয় ও গাছটা বড় ও সবল হয়। কিন্তু অক্টোপ্লয়েডে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। এই উদ্ভিদটা ছোট ও অনুর্বর হয়, পাতাগুলি মোটা ও কোঁচকানো থাকে (চিত্র 125) ও অনেক দেরীতে ফুল ফোটে।

Sax-এর মতে পত্ররন্ধ্র বা *stomata*-র হার এবং পলিপ্লয়ডির মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। *Triticum*-এ ক্রোমোসোমের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে স্টোমাটার আয়তন বাড়ে কিন্তু সংখ্যা কমে যায়। অবশ্য কোন কোন উদ্ভিদে স্টোমাটার হার ও পলিপ্লয়ডির মাত্রার মধ্যে এরকম সম্বন্ধ না থাকতেও পারে।

অটোট্রিপ্লয়েড (*autotriploid-3n*)

অনেক অটোট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া গিয়েছে; কিন্তু অটোট্রিপ্লয়েড প্রাণী সচরাচর দেখা যায় না। ড্রসোফিলার ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী পতঙ্গ স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড পতঙ্গের তুলনায় সবল হয় ও এদের পাখার কোষগুলি বড় হয়।

ডিপ্লয়েডের তুলনায় অটোট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ বড় ও সবল হয়, তাড়াতাড়ি
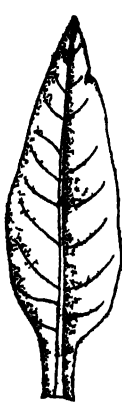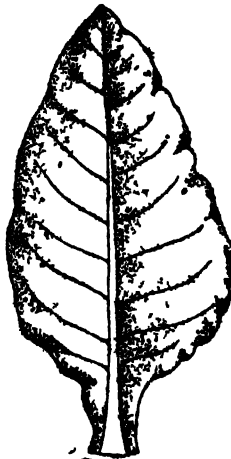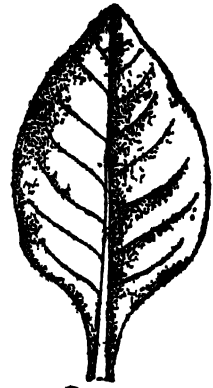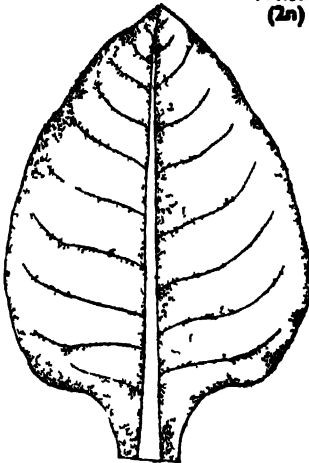
চিত্র 125

Nicotiana langsdorfii-তে বিভিন্ন মাত্রাব পলিপ্লয়েডির ফলে পাতার আকৃতি ও আয়তনেব পার্থক্য হয

বাড়ে ও পরিবেশের সাথে সহজেই মানিয়ে নেয়। ট্রিপ্লয়েডে মায়োসিস অনিয়মিত হওয়ার জন্য উর্বরতা কমে যায়। কিন্তু ট্রিপ্লয়েড *Iris* ও *Zea* বেশ উর্বর ।

অটোট্রিপ্লয়েডে তিনটা ক'রে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম পাশাপাশি এসে ট্রাইভ্যালেন্ট (*trivalent*) গঠন করে। আবার কোন কোন ক্রোমোসোম বাইভ্যালেন্ট (*bivalent*) ও ইউনিভ্যালেন্ট (*univalent*) হিসাবে থাকে। অটোট্রিপ্লয়েড *Tradescantia bracteata*-র মায়োসিসে 90% ট্রাইভ্যালেন্ট ও 10% বাইভ্যালেন্ট ও ইউনিভ্যালেন্ট পাওয়া যায়। প্রত্যেক ট্রাইভ্যালেন্টের তিনটা ক্রোমোসোম যে কোন মেরুতে যায়। যেসব গ্যামেট সম্পূর্ণ হ্যাপ্লয়েড কিম্বা ডিপ্লয়েড সেট পায় তারাই শুধু বেঁচে থকে ও অন্য কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়। কোন কোন ট্রিপ্লয়েডে দ্বি-সেন্ট্রোমিয়র-যুক্ত সেতু (*dicentric bridge*), ভগ্ন অংশ (*fragment*), ল্যাগিং (*lagging*) অর্থাৎ মন্থরগতিশীলতা দেখা যায়।

মায়োসিস অনিয়মিত হওয়ার জন্য ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদে যৌন জনন ভালভাবে হ'তে পারে না। তবে অঙ্গজ জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করলে ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদটা স্থায়ী ক্লোন (*clone*) গঠন করতে পারে। ডিপ্লযেডের চেয়ে উৎকৃষ্ট ধরনের ট্রিপ্লয়েড আপেল, টিউলিপ, *Iris* ইত্যাদি অঙ্গজ জননেব মাধ্যমে স্থায়ী করা সম্ভব হয়েছে।

টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ থেকে তৈরী ডিপ্লয়েড গ্যামেট (2n) ও ডিপ্লযেড উদ্ভিদ থেকে সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটের (n) মিলনের ফলে ট্রিপ্লয়েড (3n) জীবের সৃষ্টি হয়। এছাড়া একটা ডিপ্লয়েড উদ্ভিদের স্বাভাবিক গ্যামেট (n) ও সংখ্যা হ্রাস পায় নাই এমন গ্যামেটের (2n) মিলনের ফলেও অটোট্রিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অটোটেট্রাপ্লয়েড (*autotetraploid-4n*)

প্রকৃতিতে অটোপলিপ্লয়েড সচরাচর দেখা যায় না (Clausen ও Heiscy 1946, Stebbins 1950)। তবে উত্তর আমেরিকার *Galax aphylla* হচ্ছে একটা স্বাভাবিক অটোটেট্রাপ্রয়েড (Baldwin 1941)। প্রাণী ও ভিন্নবাসী উদ্ভিদে টেট্রাপ্লয়েড সাধারণতঃ অনুপস্থিত থাকে। অটোটেট্রাপ্লয়েড *Cuthbertia graminea* ডিপ্লয়েড পূর্বপুরুষের তুলনায় অনেক বড় ও সবল হয় (Giles 1942)।

ডিপ্লয়েডের তুলনায় অটোটেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ বড় ও সবল হয়। এদেব পরাগরেণু, ফুল, ফল, বীজ, কোষ, নিউক্লীয়াস, পত্ররন্ধ্র ইত্যাদি বড় হয়, পাতা চওড়া, মোটা ও গাঢ় সবুজ হয়, ভিটামিনের পরিমাণ বেশী থাকে ও এরা বিভিন্ন পরিবেশে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। তবে অটোটেট্রাপ্লয়েডে ডিপ্লয়েডের তুলনায় শীত প্রতিরোধের ক্ষমতা কম থাকে।

টেট্রাপ্লয়েডের বংশধারা ডিপ্লয়েডের তুলনায় জটিল। এখানে কোন ডমিন্যান্ট

(প্রবল) জীন (R) ও এর রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন) অ্যালীল (r) বিভিন্ন রকমের অবস্থায় থাকতে পারে। যদি একটা টেট্রাপ্লয়েডে একটা ডমিন্যান্ট জীন (Rrrr) থাকে তবে ঐ উদ্ভিদকে সিমপ্লেক্স (*simplex*) বলে। দুইটা ডমিন্যান্ট জীন (RRrr) থাকলে ডিউপ্লেক্স (*duplex*), তিনটা ডমিন্যান্ট জীন থাকলে (RRRr) ট্রিপ্লেক্স (*triplex*), চারটা ডমিন্যান্ট জীন (RRRR) থাকলে ক্যোয়ড্রুপ্লেক্স (*quadruplex*) এবং কোন ডমিন্যান্ট জীন না থাকলে (rrrr) নালিপ্লেক্স (*nulliplex*) বলা হয়।

চারটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের যে কোন দুইটা এক মেরুতে ও অন্য দুইটা অন্য মেরুতে যায়। সুতরাং একটা ডিউপ্লেক্স (RRrr) উদ্ভিদ থেকে তিন রকমের অর্থাৎ RR, Rr, rr গ্যামেট 1:4:1 অনুপাতে তৈরী হয়। সিমপ্লেক্স উদ্ভিদ (Rrrr) Rr ও rr গ্যামেট সমান অনুপাতে (1:1) তৈরী করে। ট্রিপ্লেক্স উদ্ভিদে (RRRr) RR ও Rr গ্যামেট 1: 1 অনুপাতে তৈরী হয়। ডিউপ্লেক্স (RRrr) উদ্ভিদের সাথে নালিপ্লেক্স (rrrr) উদ্ভিদের মিলন হ'লে ডমিন্যান্ট ও রিসেসিভ উদ্ভিদ 5:1 (R:r) অনুপাতে তৈরী হয়। যদি একটা ডিউপ্লেক্স উদ্ভিদে (RRrr) স্বপরাগ-যোগ হয় তাহলে বিভিন্ন উদ্ভিদের অনুপাত হবে 35R:1r। ডিপ্লয়েড ও অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডে এই রকমের অনুপাত দেখা যায় না।

অটোটেট্রাপ্লয়েড *Tradescantia virginiana, Setcreasia brevifolia* ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্ভিদের মায়োসিসে ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট (*quadrivalent*) পাওয়া যায়। অটোটেট্রাপ্লয়েড টমেটোতে প্রফেজে ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট পাওয়া যায় কিন্তু মেটাফেজে ২4টা বাইভ্যালেন্ট থাকে। অনেক অটোটেট্রা-প্লয়েডে নানা রকমের যুগ্মতার জন্য একই কোষে বিভিন্ন ধরনের ক্যোয়াড্রি-ভ্যালেন্ট, বাইভ্যালেন্ট এবং কখনও কখনও ট্রাইভ্যালেন্ট দেখা যায়। তবে প্রকৃত অটোটেট্রাপ্লয়েডে ট্রাইভ্যালেন্ট প্রায় অনুপস্থিত থাকে।

ডিপ্লয়েডের তুলনায় টেট্রাপ্লয়েডে কায়েসমার সংখ্যা কম হয়। এখানে প্রায় সব কায়েসমাই প্রান্তে থাকে। কায়েসমার সংখ্যা ও অবস্থানের উপর নির্ভর ক'রে বিভিন্ন রকমের ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট, বাইভ্যালেন্ট ও ট্রাইভ্যালেন্ট (চিত্র 1২6a—p) দেখা যায়।

অটোটেট্রাপ্লয়েডে কোষ বিভাগটা মোটামুটি নিয়মিত হ'লেও কিছু পরি-মাণে পরাগরেণু অনুর্বর হয় কারণ কোন কোন সময় ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্টের অনিয়মিত পৃথকীকরণের জন্য গ্যামেট স্বাভাবিক হয় না। অটোটেট্রাপ্লয়েড *Antirrhinum*-এ মায়োসিসের শেষের দিকে বিশৃঙ্খলার জন্য আংশিক অনুর্বরতা দেখা যায়। তবে অটোট্রিপ্লয়েডের তুলনায় অটোটেট্রাপ্লয়েড অনেক বেশী উর্বর।
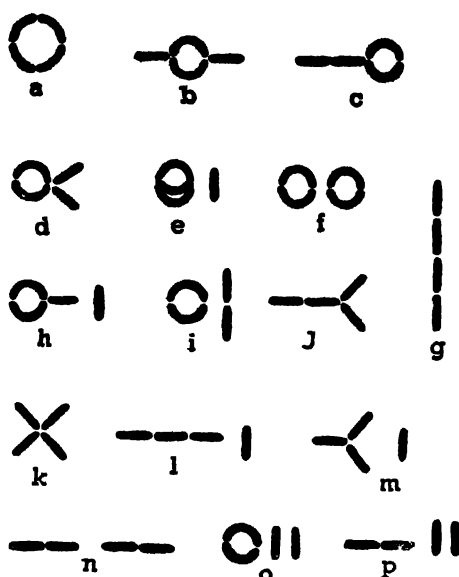
চিত্র 126

টেট্রাপ্লয়েডে কায়েসমার অবস্থান ও সংখ্যার উপর নির্ভর ক'রে বিভিন্ন রকমের ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট, বাইভ্যালেন্ট, ট্রাইভ্যালেন্ট ও ইউনিভ্যালেন্ট গঠিত হয়।
a-d, g, j-k — ক্যোয়াড্রিভ্যালেন্ট, c, h, l, m — ট্রাইভ্যালেন্ট ও ইউনিভ্যালেন্ট; f, i, n — বাইভ্যালেন্ট এবং o, p — বাইভ্যালেন্ট ও ইউনিভ্যালেন্ট

ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে অটোটেট্রাপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়। কোষ বিভাগ ছাড়া ক্রোমোসোমের বিভাগ হ'লে ঐ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। এই অস্বাভাবিক বিভাগ খুব ছোট অবস্থায় হ'লে সম্পূর্ণ জীবটা টেট্রাপ্লয়েড হয়। কিন্তু এইরকমের বিভাগ উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরবর্তী পর্যায়ে হ'লে কেবল আংশিক টেট্রাপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এছাড়া গ্যামেটের মাতৃকোষে কোন কারণে মায়োসিস না হ'লে (*ameiosis*) ডিপ্লয়েড গ্যামেট তৈরী হয়। এই রকমের দুইটা ডিপ্লয়েড গ্যামেটের মিলনের ফলে টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

টেট্রাপ্লয়েডের বড় ফল, ফুল ও পাতার জন্য কৃত্রিম উপায়ে টেট্রাপ্লয়েডের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এইভাবে অনেক টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ, যেমন, টমেটো, স্ট্রবেরী, প্লাম, বিভিন্ন রকমের লিলি ইত্যাদির সৃষ্টি করা হয়েছে।

উচ্চতর অটোপলিপ্লয়েড (*higher autopolyploids*)

অটোটেট্রাপ্লয়েডের চেয়ে উচ্চতর অটোপলিপ্লয়েড সচরাচর দেখা যায় না। এই ধরনের উদ্ভিদে মায়োসিসস খুব অনিয়মিত হয় ও এরা দুর্বল ও অস্বাভাবিক হয়।

Navaschin (1925) একটা পেন্টাপ্লয়েড (5n) *Crepis* পেয়েছিলেন। পেন্টাপ্লয়েডের মায়োসিসে ইউনিভ্যালেন্ট থেকে আরম্ভ করে ক্যুইনক্যোএ-ভ্যালেন্ট (*quinquivalent*) পর্যন্ত সব রকমের সংযোগ পাওয়া যায়।

অ্যালোপলিপ্লয়েড

অ্যালোট্রিপ্লয়েড (*allotriploid*)

অ্যালোট্রিপ্লয়েডে সাধারণতঃ একটা উদ্ভিদের দুইটা জীনোম (AA) ও অন্য উদ্ভিদের একটা জীনোম (B) থাকে। এক রকম দুইটা জীনোমের (AA) ক্রোমোসোমগুলি বাইভ্যালেন্ট গঠন করে, অন্য জীনোমের (B) ক্রোমোসোমগুলি ইউনিভ্যালেন্ট অবস্থায় থাকে। কখনও কখনও B জীনোমের বিভিন্ন ক্রোমোসোমের মধ্যে যুগ্মতার ফলে বাইভ্যালেন্টের সৃষ্টি হয়। আবার কখনও বা A জীনোম ও B জীনোমের কোন কোন ক্রোমো-সোমের মধ্যে যুগ্মতার ফলে ট্রাইভ্যালেন্ট গঠিত হয়ে থাকে। তিন রকমের জীনোমযুক্ত অ্যালোট্রিপ্লয়েড (ABC) একটা সংকর উদ্ভিদের (AABB) সাথে অন্য জীনোমযুক্ত আরেকটা উদ্ভিদের (CC) সংকরণের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

Crepis capillaris (n = 3) ও *C. tectorum* (n = 4)-এর মধ্যে মিলনের ফলে অ্যালোট্রিপ্লয়েড সংকর উদ্ভিদ পাওয়া গিয়েছে। এখানে *C. capillaris*-এর দুইটা জীনোম ও *C. tectorum*-এর একটা জীনোম থাকে। এই অ্যালোট্রিপ্লয়েডের মায়োসিসে তিনটা বাইভ্যালেন্ট ও চারটা ইউনিভ্যালেন্ট পাওয়া যায়।

অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড (*allotetraploid*)

দুইটা ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ AA ও BB-র মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদটা (AB) অনুর্বর হয়। এই উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা কোন ভাবে দ্বিগুণ হলে উদ্ভিদটা (AABB) উর্বর হয়। এইরকমের উদ্ভিদকে অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড (*allotetraploid*) বলে। উদ্ভিদটা টেট্রাপ্লয়েড হ'লেও এর আচরণ ডিপ্লয়েডের মত কারণ এখানে প্রত্যেক ধরনের ক্রোমোসোম দুইটা ক'রে থাকে। ডিপ্লয়েডের মত আচরণের জন্য অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডকে

অনেক সময় অ্যামফিডিপ্লয়েড (*amphidiploid*) বলা হয়। অ্যালো-টেট্রাপ্লয়েডে একই উদ্ভিদ থেকে যেসব ক্রোমোসোম এসেছে তাদের মধ্যে (A জীনোমের সাথে A জীনোমের) যুগ্মতা দেখা যায়। এইরকমের যুগ্মতাকে অটোসিনডেসিস (*autosyndesis*) বলে। তবে ভিন্ন উদ্ভিদ থেকে যে ক্রোমোসোমগুলি এসেছে তাদের কোন কোনটা যুগ্ম অবস্থান করতে পারে। এই যুগ্মতাকে অ্যালোসিনডেসিস (*allosyndesis*) বলে। অ্যালোসিনডেসিসের ফলে কোয়াড্রিভ্যালেন্ট (*quadrivalent*) বা ট্রাইভ্যালেন্টের (*trivalent*) সৃষ্টি হয় ও মায়োসিসে কিছু বিশৃংখলা দেখা যায়। প্রকৃত অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডে কেবল বাইভ্যালেন্ট পাওয়া যায়।

কৃত্রিম উপায়ে কিম্বা স্বাভাবিকভাবে অ্যামফিডিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়। Karpechenko কৃত্রিম উপায়ে *Raphanus sativus* ও *Brassica oleracea*-র মধ্যে সংকরণ (*hybridize*) ক'রে অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড *Raphano-brassica*-র (চিত্র 127) সৃষ্টি করেছিলেন। *Raphanus*-এর নয়টা ক্রোমোসোম *Brassica*-র নয়টা ($n = 9$) ক্রোমোসোম থেকে একেবারে আলাদা সেইজন্য ডিপ্লয়েড সংকর উদ্ভিদে কোন যুগ্মতা দেখা যায় না ও উদ্ভিদটা অনুর্বর হয়। কিন্তু অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডে সব ক্রোমোসোমগুলি দুইটা ক'রে থাকার ফলে মায়োসিস নিয়মিত হয়। প্রত্যেক গ্যামেটে 9টা *Raphanus*-এর এবং 9টা *Brassica*-র ক্রোমোসোম থাকে এইজন্য *Raphanobrassica* উর্বর হয়।

কতকগুলি অ্যামফিডিপ্লয়েড একই গণের (*genus*) বিভিন্ন প্রজাতির (*species*) মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে আবার অন্যরা ভিন্ন জেনাসের (গণ) দুইটা প্রজাতির মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

একটা স্বাভাবিক অ্যামফিডিপ্লয়েড হ'ল *Spartina townsendii*, যা 1871 খৃষ্টাব্দে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল। *S. alterniflora* ও *S. stricta*-র মধ্যে বেশ মিল আছে। Huskin দেখেন *S. townsendii*-র ক্রোমোসোম সংখ্যা $2n = 126$, *S. alterniflora*-র $2n = 70$ এবং *S. stricta*-র $2n = 56$। *S. alterniflora* ও *S. stricta* মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল $2n = 63$ এবং এটা অনুর্বর। এই উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উর্বর *S. townsendii*-র ($2n = 126$) সৃষ্টি হয়েছে।

একইভাবে *Digitalis purpurea* ও *D. ambigua* থেকে *D. mertonensis* এবং *Galeopsis pubescens* ও *G. speciosa* থেকে *G. tetrahit*-এর সৃষ্টি হয়েছে। $2n = 52$ ক্রোমোসোমযুক্ত আমেরিকার তুলাও অ্যামফিডিপ্লয়েড (*amphidiploid*)। এই উদ্ভিদটা *Gossypium arboreum* ও *G.*
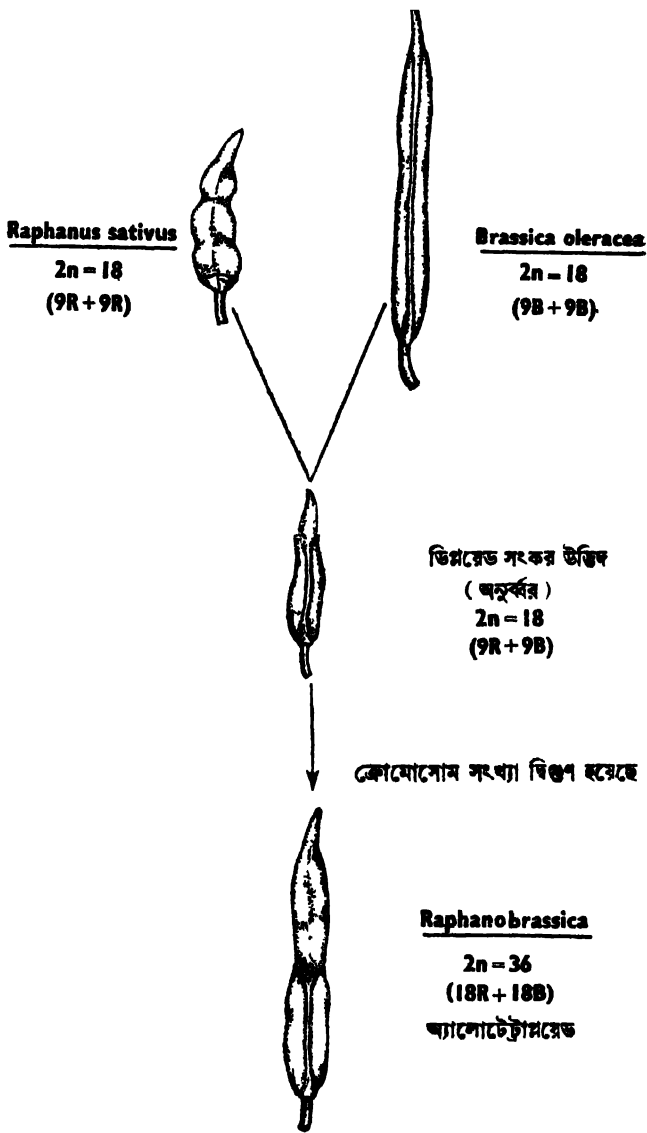
চিত্র 127

Karpechenko *Raphanus sativus* ও *Brassica oleracea*-র মধ্যে সংকরণ করে একটা অনুর্বর সংকর উদ্ভিদ পান। ঐ উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড *Raphanobrassica*-র সৃষ্টি হয়েছে। এখানে *Raphanus*-এর ক্রোমোসোমকে R এবং *Brassica*-র ক্রোমোসোমকে B রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

rarimondii-র মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। 2n = 48টা ক্রোমোসোমযুক্ত চাষের তামাক 24টা ক্রোমোসোমযুক্ত দুইটা প্রজাতির মধ্যে সংকরণ ও ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। গম (*Triticum*) ও রাইয়ের (*Secale*) মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট অ্যামফিডিপ্লয়েড উদ্ভিদ হ'ল *Triticale*। Muntzing বিভিন্ন রকমের গম ও রাই থেকে সৃষ্ট ছয় ধরণের *Triticale* পেয়েছিলেন। *Triticum* ও *Haynaldia* বা *Aegilops*-এর মধ্যে সংকরণের ফলেও অ্যামফিডিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়েছে।

অ্যামফিডিপ্লয়েডে মায়োসিসে ইউনিভ্যালেন্ট, বাইভ্যালেন্ট, ট্রাইভ্যালেন্ট এবং কোয়াড্রিভ্যালেন্ট (চিত্র 124) দেখতে পাওয়া যায়। ডিপ্লয়েডের তুলনায় এরা বেশী সবল হয়।
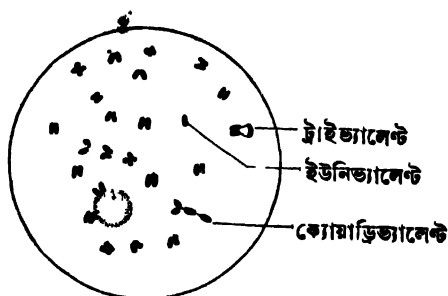
চিত্র 124

Elatostema lanccolatum-এর ডায়াকাইনেসিসে কোয়াড্রিভ্যালেন্ট, ট্রাইভ্যালেন্ট এবং ইউনিভ্যালেন্টের উপস্থিতি এই উদ্ভিদের পলিপ্লয়েড প্রকৃতি নির্দেশ করে (Guha)।

অ্যালোহেক্সাপ্লয়েড (*allohexaploid*)

অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড (AABB) ও ডিপ্লয়েড (CC) উদ্ভিদের মধ্যে সংকরণের (*hybridization*) ফলে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদটা (ABC) অনুর্বর হয়। সংকর উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে অ্যালোহেক্সাপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়। এই উদ্ভিদটা (AABBCC) উর্বর। *Triticum vulgare* হ'ল অ্যালোহেক্সাপ্লয়েডের একটা প্রধান উদাহরণ। অ্যালোহেক্সাপ্লয়েডের বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে যেসব ক্রোমোসোম আসে তাদের কোন কোনটা যুগ্ম অবস্থান করতে পারে। এরকমের অ্যালোসিনডেসিসের (*allosyndesis*) ফলে অ্যালোহেক্সাপ্লয়েডের উর্বরতা কমে যায়।

অটো-অ্যালোঅক্টোপ্লয়েড
AAAA $B_1B_1B_1B_1$
$2-14_{IV}$, $24-0_{II}$
দ্বিগুণ
অটো-অ্যালোহেক্সাপ্লয়েড
AAAA B_1B_1
$1-7_{IV}$, $13-7_{II}$
অ্যালোহেক্সাপ্লয়েড
AAB_1B_1CC
21_{II}
দ্বিগুণ
দ্বিগুণ
অটোটেট্রাপ্লয়েড
AAAA
7_{IV}, $12-0_{II}$
অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড
AAB_1B_1
14_{II}
আংশিক
অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড
$B_1B_1B_2B_2$
$0-7_{IV}$, $14-0_{II}$
অটোট্রিপ্লয়েড
AAA
7_{III}
দ্বিগুণ
দ্বিগুণ
ট্রিপ্লয়েড F_1
AAB_1
$7_{II}-7_{I}$
দ্বিগুণ
ট্রিপ্লয়েড F_1
AB_1C
21_{I}
প্রজাতি A
AA
7_{II}
F_1
AB_1
14_{I}
প্রজাতি B_1
B_1B_1
7_{II}
F_1
B_1B_2
$7-0_{II}$
প্রজাতি B_2
B_2B_2
7_{II}
প্রজাতি C
CC
7_{II}
হ্যাপ্লয়েড
A
7_{I}
হ্যাপ্লয়েড
B_1
7_{I}
হ্যাপ্লয়েড
B_2
7_{I}
হ্যাপ্লয়েড
C
7_{I}

চিত্র 129

অসম্পূর্ণ ক্রোমোসোম সেট (জীনোম) থাকে। কোন ডিপ্লয়েড জীবে মায়োসিসের ফলে গ্যামেট দুইটা সাধারণতঃ সম্পূর্ণ হ্যাপ্লয়েড সেট পায়। কিন্তু কোন কোন সময় দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোম বিপরীত মেরুতে না গিয়ে একই মেরুতে যায় ফলে একটা গ্যামেটে ঐ নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের ঘাটতি ও অন্যটায় দ্বিগুণতা দেখা যায়। Bridges (1916) এই রকমের অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি ড্রসোফিলার উপর গবেষণা করে ক্রোমোসোমের এই আচরণকে "নন-ডিসজাংশন" (*non-disjunction*) নাম দেন। নন-ডিসজাংশনের ফলে সৃষ্ট অস্বাভাবিক গ্যামেট দুইটা ($n+1$ বা $n-1$) যদি স্বাভাবিক গ্যামেটের (n) সাথে মিলিত হয় তাহলে যথাক্রমে $2n+1$ ও $2n-1$ উদ্ভিদ দুইটার সৃষ্টি হবে। প্রথম উদ্ভিদকে ট্রাইসোমিক (*trisomic*) ও দ্বিতীয় উদ্ভিদকে মোনোসোমিক (*monosomic*) বলে। ডিপ্লয়েড স্তরের চেয়ে পলিপ্লয়েড স্তরে অ্যানইউপ্লয়েডি কম ক্ষতিকর। পলিপ্লয়েডে ক্রোমোসোম সংখ্যা বেশী থাকায় একটা অতিরিক্ত (কিম্বা অনুপস্থিত) ক্রোমোসোম ডিপ্লয়েডের তুলনায় ঐ উদ্ভিদকে কম প্রভাবিত করবে। ধুতরায় ডিপ্লয়েড ও পলিপ্লয়েড স্তরে বিভিন্ন রকম অ্যানইউপ্লয়েডি দেখা গিয়েছে (চিত্র 130)। উদ্ভিদের

চিত্র 130

ধুতরার ডিপ্লয়েড, টেট্রাপ্লয়েড এবং বিভিন্ন অ্যানইউপ্লয়েড উদ্ভিদের ফলগুলি দেখান হয়েছে

চিত্র 132

ধুতরার ডিপ্লয়েড এবং বার রকমেব ট্রাইসোমিক উদ্ভিদেব ফলগুলি (*capsule*) দেখান হয়েছে
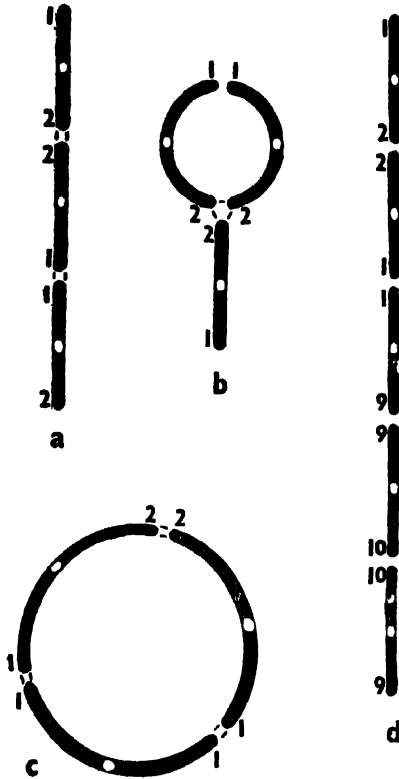
চিত্র 133

বিভিন্ন রকমের ট্রাইসোমিকের মায়োসিসের প্রথম মেটাফেজে ট্রাইভ্যালেন্ট ও পেন্টাভ্যালেন্ট।
a-b, প্রাইমারী ট্রাইসোমিকে বিভিন্ন ধরনের ট্রাইভ্যালেন্ট; c — সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিকের বলয়াকার ট্রাইভ্যালেন্ট; d — টারসিয়ারী ট্রাইসোমিকের পাঁচটা ক্রোমোসোম দিয়ে গঠিত পেন্টাভ্যালেন্ট।

দিয়ে তৈরী হয়। যেমন ধুতরার 1—2 এবং 9—10 ক্রোমোসোমের মধ্যে ট্রান্সলোকেশন হ'লে 1—9 ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয় ও এই ক্রোমোসোমটা অতিরিক্ত থাকলে ঐ উদ্ভিদকে টারসিয়ারী ট্রাইসোমিক বলে। এদের মায়োসিসে পাঁচটা ক্রোমোসোম (দুইটা 1—2, একটা 1—9, দুইটা 9—10) একসাথে অবস্থান (133d) করতে পারে।

দ্বিগুণ বা ডাবল ট্রাইসোমিক (*double trisomic*) (2n+1+1)

কোন উদ্ভিদে দুইটা ক্রোমোসোমের তিনটা ক'রে সদস্য উপস্থিত থাকলে এদের ডাবল ট্রাইসোমিক বলে। ধুতরায় ডাবল ট্রাইসোমিক পাওয়া গিয়েছে। সাধারণ উদ্ভিদের তুলনায় এদের প্রাণশক্তি কম হয়।

টেট্রাসোমিক (*tetrasomic*) (2n+2)

টেট্রাসোমিকে কোন নির্দিষ্ট ক্রোমোসোম দুটো বেশী থাকে অর্থাৎ ডিপ্লয়েড স্তরের টেট্রাসোমিকে (2n + 2) একটা ছাড়া সব ক্রোমোসোম দুইটা করে থাকে এবং ঐ নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমটা চারটা থাকে। টেট্রাসোমিক উদ্ভিদে ট্রাইসোমিকের তুলনায় জেনেটিক ভারসাম্য অনেক বেশী ব্যাহত হয় এবং এরা দুর্বল হয়। টেট্রাসোমিকে স্বপরাগযোগ (*self-pollination*) হ'লে ডিপ্লয়েড (2n) উদ্ভিদ, টেট্রাসোমিক (2n + 2) উদ্ভিদ কিম্বা প্রাইমারী বা সেকেণ্ডারী ট্রাইসোমিক (2n + 1) উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। ডিপ্লয়েডের সাথে টেট্রাসোমিকের সংকরণের ফলে ডিপ্লয়েড ও ট্রাইসোমিক উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় কিন্তু কোন টেট্রাসোমিক উদ্ভিদ তৈরী হয় না। n + 2 গ্যামেট নিষেক বা ফার্টিলাইজেশনে অংশ নেয় না। গমে পলিপ্লয়েড স্তরে টেট্রাসোমিক (6n + 2) পাওয়া গিয়েছে। গমে দ্বিতীয় ক্রোমোসোমের টেট্রাসোমিক বিংশ ক্রোমোসোমের নালিসোমিকের (*nullisomic*) প্রভাব পূরণ করতে পারে। সুতরাং দ্বিতীয় ও বিংশ ক্রোমোসোমের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু এই সামঞ্জস্য বা অনুরূপতা এত বেশী নয় যার ফলে ঐ দুইটা ক্রোমোসোম যুগ্ম অবস্থান করতে পারে।

মোনোসোমিক (*monosomic*) (2n – 1)

কোন জীবে স্বাভাবিকের তুলনায় একটা ক্রোমোসোম কম থাকলে তাকে মোনোসোমিক বলে। ট্রাইসোমিকের তুলনায় মোনোসোমিক অনেক বেশী ক্ষতিকর। মোনোসোমিকে ছোট ক্রোমোসোমের ঘাটতি থাকলে ঐ জীবটা বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু বড় ক্রোমোসোমের ঘাটতির ফলে ঐ মোনোসোমিক জীবটা বেঁচে থাকতে পারে না। চতুর্থ ক্রোমোসোমের মোনোসোমিক (*haplo*-IV) ড্রসোফিলা বেঁচে থাকতে পারে যদিও এরা দুর্বল হয় ও ধীরে ধীরে বাড়ে। কোন কোন পতঙ্গের পুরুষরা স্বাভাবিক অবস্থায় মোনোসোমিক হয়।

উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড স্তরের (2n – 1) চেয়ে পলিপ্লয়েড স্তরে (3n – 1, 4n – 1 ইত্যাদি) মোনোসোমিক বেশী দেখা যায়। McClintock ভুট্টায় ডিপ্লয়েড স্তরে (2n – 1) একটা মোনোসোমিক পেয়েছিলেন। এখানে মায়ো-

সিসে একটা ইউনিভ্যালেন্ট দেখা যায়। যেসব গ্যামেটে (n – 1) ক্রোমোসোমের ঘাটতি থাকে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। মোনোসোমিকে সম্ভবতঃ কোষ বিভাগের বিশৃঙ্খলার জন্য ইউনিভ্যালেন্ট থেকে টেলোসেন্ট্রিক (*telocentric*) বা আইসোক্রোমোসোমের (*iso-chromosome*) সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোন কোন সময় ইউনিভ্যালেন্টটা অন্য ক্রোমোসোমের চেয়ে আস্তে আস্তে মেরুর দিকে যায় ও কোন অপত্য নিউক্লীয়াসেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এর ফলে অনেক বেশী সংখ্যক n – 1 গ্যামেট তৈরী হয়। McClintock একটা ভুট্টা গাছের পরাগরেণু মাতৃকোষে নয়টা বাইভ্যালেন্ট ও একটা ইউনিভ্যালেন্ট দেখতে পান কিন্তু এর মূলাগ্রের কোষের (*root tip cells*) ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল 2n = 20 এর কারণ হ'ল খুব ছোট অবস্থায় ঐ উদ্ভিদের কোন দেহ কোষে মাইটোসিসে বিশৃঙ্খলার ফলে উপরের অংশ মোনোসোমিক হয়েছে।

পলিপ্লয়েড স্তরে *Nicotiana tabacum*-এ (4n – 1) এবং *Triticum vulgare*-এ (6n – 1) মোনোসোমিক পাওয়া গিয়েছে। গমে (*Triticum vulgare*) একুশ রকমের মোনোসোমিক পাওয়া যায়। তামাকেও (n = 24) কুড়িটার বেশী মোনোসোমিক দেখা গিয়েছে। সাধারণতঃ গমের মোনোসোমিকের ফেনোটাইপের উপর তেমন কোন প্রভাব নাই। এর কারণ এইসব মোনোসোমিক পলিপ্লয়েড স্তরে হয়েছে। তবে গমের একটা নির্দিষ্ট মোনোসোমিকে ফেনোটাইপ পরিবর্তিত হয় ও এইরকম উদ্ভিদকে "স্পেলটয়েড" (*speltoid*) বলে।

নালিসোমিক (*nullisomic*) (2n – 2)

নালিসোমিক উদ্ভিদে কোন একটা নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের দুইটা হোমোলোগই অনুপস্থিত থাকে। এদের ফেনোটাইপ স্বাভাবিক উদ্ভিদের মত হয় না এবং এরা অনুর্বর ও দুর্বল হয়। নালিসোমিক উদ্ভিদ সাধারণতঃ বেঁচে থাকতে পারে না।

মোনোসোমিক উদ্ভিদে স্ব-পরাগযোগের ফলে নালিসোমিকের সৃষ্টি হয়ে থাকে। নালিসোমিক উদ্ভিদ বেঁচে থাকলে তাদের কতকগুলি কাজে ব্যবহার করা হয়। এই উদ্ভিদকে পরীক্ষা করে অনুপস্থিত ক্রোমোসোমে কোন কোন চরিত্রের নিয়ন্ত্রক জীনগুলি অবস্থিত ছিল তা নির্ণয় করা যায়। নালিসোমিকের সাথে স্বাভাবিক উদ্ভিদের সংকরণ (*hybridize*) করে স্বাভাবিক গোষ্ঠীতে মোনোসোমিকের হার নির্ধারণ করা হয়।

পলিপ্লয়েডের উৎপত্তি

অনেক উদ্ভিদ ও কিছু প্রাণী স্বাভাবিক অবস্থায় পলিপ্লয়েড। ডিপ্লয়েড অবস্থা পলিপ্লয়েডের চেয়ে প্রাচীন। মনে করা হয় যে ডিপ্লয়েড থেকেই পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়েছে। এইরকম উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে। দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়। এছাড়া জনন কোষে বেশী সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকলে ও ঐ গ্যামেট নিষিক্ত (*fertilized*) হ'লে পলিপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্ত্রী বা পুং গ্যামেট তৈরীর সময় মায়োসিসে বিশৃঙ্খলা হ'লে ডিপ্লয়েড গ্যামেট (২n) তৈরী হতে পারে। এই ডিপ্লয়েড গ্যামেট হ্যাপ্লয়েড কিম্বা ডিপ্লয়েড গ্যামেটের সাথে মিলিত হ'লে পলিপ্লয়েড উদ্ভিদ তৈরী হয়। পলিপ্লয়েড উদ্ভিদে স্ব-পরাগযোগ হ'লে কিম্বা এই উদ্ভিদের সাথে অন্য ডিপ্লয়েড বা পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের সংকরণের (*hybridization*) ফলে বিভিন্ন ধরনের পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়।

কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি

বিভিন্ন উদ্ভিদের পলিপ্লয়েড প্রকৃতির আবিষ্কার এবং পলিপ্লয়েডির ফলে উদ্ভিদের আয়তন ও সবলতা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পলিপ্লয়েড সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হন। পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তবে সব পদ্ধতি সন্তোষজনক নয়। এখানে কৃত্রিম পলিপ্লয়েড তৈরী করার কয়েকটা পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

(1) পলিপ্লয়েড সৃষ্টির একটা প্রাচীন উপায় হ'ল "যমজ পদ্ধতি" (*twin method*)। অঙ্কুরিত বীজে কখনও কখনও যমজ ভ্রূণ (*embryo*) পাওয়া যায় যার থেকে হেটারোপ্লয়েড উদ্ভিদ তৈরী হয়। Muntzing (1937) পলিপ্লয়েড সৃষ্টির জন্য প্রথম এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

এছাড়া তাপমাত্রার পরিবর্তন ক'রে, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ ক'রে, অসমোটিক চাপের (*osmotic pressure*) তারতম্য ঘটিয়ে, আঘাত ক'রে, ব্যাকটিরিয়া, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবের সাহায্যে কিম্বা বিকিরণ প্রয়োগ ক'রে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি করা হয়েছে।

(2) জনন কোষকে অল্প সময় বেশী তাপমাত্রায় রেখে Randolph (1932) পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি করেছিলেন। তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন ক'রে *Rhoeo, Tradescantia* এবং অন্যান্য উদ্ভিদে পলিপ্লয়েডি পাওয়া গিয়েছে। Sax *Tradescantia paludosa*-কে দুই সপ্তাহ 8°C তাপমাত্রায় ও তারপর 38°C-এ রেখে পরাগরেণুর অনেক অস্বাভাবিকতা

দেখেছিলেন। স্পিণ্ডল যথাযথভাবে কাজ না করার জন্য কোন কোন পরাগরেণু ডিপ্লয়েড হয়। বেশী তাপমাত্রায় চার পাঁচদিন রাখলে স্পিণ্ডলই তৈরী হয় না ও পরাগরেণুগুলি ডিপ্লয়েড হয়। প্রাণীতেও দ্রুত তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়। *Triturhus*-এ কম তাপমাত্রায় ট্রিপ্লয়েডের সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণুকে 0—3°C তাপমাত্রায় কয়েক ঘণ্টা রাখলে ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু তৈরী হয়। ঐ ডিম্বাণু পুং গ্যামেটের সাথে মিলিত হয়ে ট্রিপ্লয়েডের সৃষ্টি করে। একইভাবে 33.5—45°C তাপমাত্রায় 5—50 মিনিট রাখলে ট্রিপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হয় কারণ কম বা বেশী তাপমাত্রায় মায়োসিস স্বাভাবিকভাবে হয় না।

(3) Greenleaf ও তার সহকর্মীরা (1938) দেখেন যে বৃদ্ধিশীল তামাক গাছের (*Nicotiana tabacum*) আগাটা কেটে ফেলে ঐ কাটা অংশে ইনডোল-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (*indole acetic acid*) লাগালে ক্যালাস টিসু (*callus tissue*) তাড়াতাড়ি তৈরী হয়। ঐ ক্যালাস টিসুতে কোন কোন সময় দ্বিগুণ সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে ও এইসব কোষ থেকে সৃষ্ট শাখাটা পলিপ্লয়েড হয়। এইভাবে টমেটোতেও টেট্রাপ্লয়েডের সৃষ্টি করা হয়েছে। টমেটো গাছের শীর্ষ মুকুল ও সব পার্শ্বীয় মুকুল সমেত আগাটা বাদ দিয়ে কাটা অংশে পেট্রোলিয়াম দেওয়া হয় যাতে কোষগুলি সতেজ থাকে ও সবল ক্যালাস টিসু তৈরী হয়। দুই সপ্তাহের মধ্যেই ঐ ক্যালাস টিসু থেকে অস্থানিক মুকুল তৈরী হয়। ঐসব মুকুল কেটে নিয়ে তার থেকে গাছ তৈরী ক'রে দেখা গেছে যে 30 শতাংশ উদ্ভিদে দ্বিগুণ সংখ্যক ক্রোমোসোম রয়েছে। Greenleaf ইণ্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA) ব্যবহার করে ডিপ্লয়েড তামাক গাছ থেকে 13.7% শতাংশ টেট্রাপ্লয়েড ও এক শতাংশ অক্টোপ্লয়েড গাছ পেয়েছিলেন।

(4) কলচিসিন (*colchicine*) প্রয়োগ করে

আগে যেসব পদ্ধতির বর্ণনা করা হল সেগুলির কোনটাই তেমন সন্তোষজনক নয়। কলচিসিন ব্যবহার করে অনেক বেশী সংখ্যায় পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

কলচিসিন একটা উপক্ষার (*alkaloid*) যা *Colchicum autumnale* থেকে পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপায়ে কলচিসিন প্রয়োগ করা হয়, যেমন, জলীয় দ্রবণে, ল্যানোলিন (*lanoline*) সহযোগে, স্টিয়ারিক অ্যাসিড বা মরফিন সহযোগে, অ্যাগার (*agar*) মাধ্যমে কিম্বা গ্লিসারিনের সাথে। কোষ বিভাগের সময় কলচিসিন স্পিণ্ডল গঠন রোধ করে কিন্তু ক্রোমোসোমগুলি বিভক্ত হয়। মেটাফেজ অবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

ক্রোমোসোমগুলি সংকুচিত ও স্থূল হয়। ক্রোমাটিডগুলি কেবল সেন্ট্রো-মিয়ার অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশে আলাদা হয়ে যায়। কলচিসিন বেশীক্ষণ ধরে প্রয়োগ করলে ক্রোমাটিডগুলি সেন্ট্রোমিয়ার অংশেও আলাদা হয়ে যায়। মেটাফেজ থেকে কোষটা সরাসরি ইন্টারফেজ অবস্থায় চলে যায়। এর ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। তবে কখনও কখনও ক্রোমোসোম-গুলি আবার বিভক্ত হয়ে অক্টোপ্লয়েড বা আরো উচ্চতর পলিপ্লয়েড কোষ গঠন করে। Levan কলচিসিন প্রয়োগ করে পেঁয়াজের মূলের কোষে 500 থেকে 1000টা পর্যন্ত ক্রোমোসোম পেয়েছিলেন। কলচিসিন প্রয়োগ করলে যে পরিবর্তিত মেটাফেজ দেখা যায় তাকে কলচিসিন মেটাফেজ বা C-মেটাফেজ বলে ও ঐ মাইটোসিসকে C-মাইটোসিস বলা হয়। কলচিসিন প্রয়োগ করলে কোন কোন সময় অ্যানইউপ্লয়েডেরও (*aneuploid*) সৃষ্টি হয়। Derman (1940), Derman, Smith ও Emsweller-এর (1953) মতে কলচিসিন পদ্ধতি কার্যকরী করতে হ'লে বৃদ্ধিশীল অঞ্চলেই কলচিসিন প্রয়োগ করা দরকার।

উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার কলচিসিন (*colchicine*) প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ চারা গাছের ক্ষেত্রে এই মাত্রা 0.1—0.4 শতাংশ, বীজে 0.1—0.5 শতাংশ ও পরিণত উদ্ভিদে 0.2—0.4 শতাংশ হয়। বিভিন্ন পরিবেশে কলচিসিন প্রয়োগের পদ্ধতির তারতম্য হয়। কলচিসিন প্রয়োগের কয়েকটা পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

(*i*) **বীজে**

(*a*) বীজগুলিকে 0.5 শতাংশ কলচিসিন ও 0.2 শতাংশ অ্যাগার জেলীতে অঙ্কুরিত করা হয়। বীজ অঙ্কুরিত হবার পর ভাল করে ধুয়ে মাটিতে লাগান হয়।

(*b*) Ramanujam ও Joshi (1941) 0.25 শতাংশ কলচিসিনের জলীয় দ্রবণে বীজগুলিকে 30 মিনিট রেখে তারপর ঐ বীজ বপন করেন।

(*ii*) **চারা গাছে**

(*a*) *Svalöf* পদ্ধতি (*Svalöf method*)—চারাগাছগুলিকে উল্টো-ভাবে অর্থাৎ কাণ্ড নীচের দিকে ও মূল উপর দিকে ক'রে (চিত্র 134) 0.25 শতাংশ কলচিসিনের জলীয় দ্রবণে কাণ্ডটাকে ডুবিয়ে রাখা হয়। মূলের উপর ভেজা ফিলটার কাগজ (*filter paper*) দেওয়া হয় যাতে মূলটা শুকিয়ে না যায়। মূলটা কলচিসিন দ্রবণে ডুবান হয় না কারণ ঐ দ্রবণ মূলের পক্ষে ক্ষতিকর। এইভাবে 30 মিনিট কলচিসিনের দ্রবণে ডুবিয়ে রাখার পরে ঐ চারাটা তুলে মাটিতে লাগান হয়।
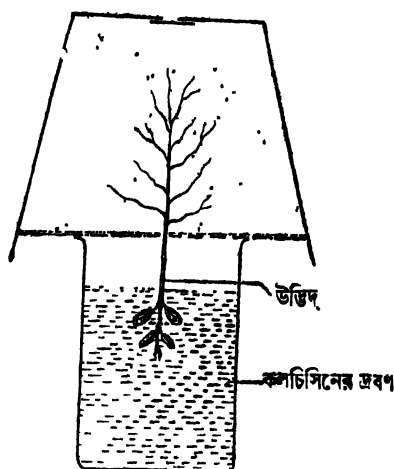
চিত্র 134
চারা গাছে কলচিসিন প্রয়োগ করার পদ্ধতি

(*b*) একবীজপত্রী উদ্ভিদে যেখানে শীর্ষের ভাজক কলা (*meristematic tissue*) অনেক নীচে থাকে সেখানে বীজগুলি অংকুরিত হওয়ার পর ঐ অংকুরিত বীজের কাণ্ডের উপরিভাগ ব্লেড দিয়ে লম্বালম্বি ভাগ করা হয়। 0.05—0.1 শতাংশ কলচিসিনে ভেজান তুলা বা ব্লটিং ঐ কাটা অংশে ঢুকিযে দেওয়া হয়। চারাটাকে বেশী আর্দ্রতায বাখা হয় ও দ্বিতীয়বার এই পদ্ধতি ব্যবহার কবা হয়। এব একদিন বাদে চাবাটা জলে ধুয়ে লাগান হয়। এই পদ্ধতি ধানের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে (Loung 1951)।

(*c*) 0.5—0.2 শতাংশ কলচিসিনের জলীয় দ্রবণ ড্রপার দিয়ে 2 ফোঁটা চারা গাছের শীর্ষ মুকুলে বা পরিণত গাছের কাক্ষিক মুকুলে দিনে তিনবার ছয়দিন ধরে প্রয়োগ করা হয় (Evans 1955)।

(*d*) 0.5—1 শতাংশ কলচিসিনের জলীয় দ্রবণ তুলির সাহায্যে বৃদ্ধিশীল অঞ্চলে লাগান হয়। এই পদ্ধতি দৈনিক একবাব কবে দশদিন প্রয়োগ করা হয় (Svalof)।

(*e*) কোন কোন সময় শীর্ষ মুকুলে কলচিসিনে ভেজা তুলা বেঁধে দেওয়া হয়।

(*iii*) **পরিণত উদ্ভিদে**

(*a*) শীর্ষ বা পাশ্বীয় মুকুল থেকে কতকগুলি পাতা বাদ দেওয়া হয়। তারপর কলচিসিনে ভেজা তুলা বা জেল্যাটীনের (*gelatine*) টুকরা ঐ

মুকুলের উপর রেখে দেওয়া হয় যতক্ষণ না তুলা বা জেল্যাটীনের টুকরাটা শুকিয়ে যাচ্ছে (Hunter 1954)।

(*b*) গাছের উপর কলচিসিন স্প্রে করা হয়।

(*c*) কখনও কখনও মুকুলটা একটা দড়ি দিয়ে আলগা করে পেঁচিয়ে ঐ দড়ির অন্য প্রান্ত কলচিসিনে ডুবিয়ে রাখা হয়।

প্রাণীতে কলচিসিন প্রয়োগ করলে C-মাইটোসিসযুক্ত কোষটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তবে কলচিসিন প্রয়োগ করে মুরগীতে পলিপ্লয়েডির সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই পলিপ্লয়েড মোরগের ঝুটিগুলি স্বাভাবিকের দ্বিগুণ এবং লেজের পালকও অনেক বড়।

(5) 1955 খৃষ্টাব্দে Nygren সংকর *Melandrium*-এর নিষিক্ত (*fertilized*) ডিম্বাণুতে নাইট্রাস অক্সাইড প্রয়োগ করে পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি করেছিলেন। পাঁচ অ্যাটমসফিয়্যার (*atmosphere*) চাপে ষোল ঘণ্টার কম সময় নাইট্রাস অক্সাইড প্রয়োগ করলে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় পলি-প্লয়েডের সৃষ্টি হয়।

(6) এছাড়া বেনজিন, অ্যাসিন্যাপথিন, ভেরাট্রিন, সালফানিলঅ্যামাইড, ক্লোরাল হাইড্রেট, হেটারো-অক্সিন, স্যানগুইনারিন হাইড্রোক্লোরাইড, গ্যামাক্সিন প্রয়োগ করে কিম্বা অক্সিজেনের অভাবের ফলেও পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

পলিপ্লয়েডির বিস্তার (*distribution of polyploids*)

বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদে পলিপ্লয়েডি দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকে পলিপ্লয়েডি সাধারণতঃ দেখা যায় না, তবে *Saccharomyces cerevseae*-এ (ছত্রাক) টেট্রাপ্লয়েডি দেখা গিয়েছে। Tischler (1950) কিছু শৈবালে বিভিন্ন ধরনের পলিপ্লয়েডির বর্ণনা দিয়েছেন। ব্রায়ো-ফাইটায়ও পলিপ্লয়েডি দেখা যায়। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে কেবল ব্যক্তবীজী (*gymnosperm*) উদ্ভিদের বিবর্তনে পলিপ্লয়েডির প্রভাব উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু টেরিডোফাইটা ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদে (*angio-sperm*) এদের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। আধুনিক কালের *Psilotales*, *Lycopodiales*, এবং *Equisetales*-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা এদের বহুল বিস্তৃত পূর্বপুরুষে পলিপ্লয়েডির উপস্থিতির ইঙ্গিত করে (Manton 1952)। *Psilotum*-এর দুইটা প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যা যথাক্রমে $2n = 200$ ও 400, *Tmesipteris*-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা ($2n$) 400-র বেশী। *Equisetum*-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল $2n = 216$। *Lyco-*

podium-এর বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল 2n = 48—68। এই সংখ্যা 260 পর্যন্ত হয়। *Isoetes*-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল 2n = 20 থেকে 100-র বেশী এবং *Selaginella*-এ 2n = 18। ফার্ণের মধ্যে *Ophioglossaceae* সবচেয়ে প্রাচীন। *Ophioglossum vulgatum*-এর ক্রোমোসোম সংখ্যা 500-র বেশী, *O. lusitanicum*-এ 2n = 250—260 এবং *Botrychium*-এ 2n = 90। *Hymenocalaceae*-তে 2n = 26, 36, 144। প্রাচীন ও আধুনিক ফার্ণের যোগসূত্র *Osmundaceae*-র ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল 2n = 44। আধুনিক ফার্ণে পলিপ্লয়েডির বিস্তার খুব বেশী। *Polypodiaceae*-র অধিকাংশ ফার্ণই টেট্রাপ্লয়েড (4n)। তবে হেক্সাপ্লয়েড (6n), অক্টোপ্লয়েড (8n) ও ডেকাপ্লয়েড (10n) ফার্ণও দেখা যায়। পশ্চিম হিমালয়ের 23·8 শতাংশ এবং পূর্ব হিমালয়ের 36·20 শতাংশ ফার্ণ পলিপ্লয়েড (Mehra 1961)। বৃটেনের ফার্ণের 42% পলিপ্লয়েড এবং এদের বেশীর ভাগই টেট্রাপ্লয়েড। ফার্ণের মধ্যে অটোপলিপ্লয়েড দেখা যায় না। ফার্ণের বিবর্তনে সংকরণ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন টেরিডোফাইটায় (*pteridophyte*) পলিপ্লয়েডির উপস্থিতি এদের প্রাচীনতার নির্দেশ করে।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে পলিপ্লয়েডি বিরল। *Gnetales*, *Podocarpus*-এর কয়েকটা প্রজাতি, *Juniperus chinensis* var. *pfitzeriana*, *Sequoia semiperivens* ইত্যাদি টেট্রাপ্লয়েড। এছাড়া *Pseudolarix amabilis*-ও পলিপ্লয়েড। এখানে ক্রোমোসোম ভেঙ্গে গিয়ে অর্থাৎ ফ্র্যাগমেন্টেশনের (*fragmentation*) মাধ্যমে পলিপ্লয়েডিব সৃষ্টি হয়েছে। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের অর্ধেকের বেশী সদস্যই হ'ল পলিপ্লয়েড (Stebbins '38, '40, '47, '50; Darlington ও Janaki Ammal '45; Tischler '50)। *Rosaceae*, *Polygonaceae*, *Malvaceae*, *Crassulaceae*, *Nyphacaceae*, *Arabaceae*-তে পলিপ্লয়েডি খুব বেশী দেখা যায়। একবীজপত্রী উদ্ভিদ গোত্র *Cyperaceae*, *Juncaceae*, *Iridaceae*-তে ইউপ্লয়েডি ও অ্যানইউপ্লয়েডি দেখা যায়। *Gramineae*-র প্রায় 75 শতাংশ উদ্ভিদই পলিপ্লয়েড। কোন কোন গোত্রে কয়েকটা গণ (*genus*) পলিপ্লয়েড এবং অন্যরা ডিপ্লয়েড। *Salicaceae*-তে *Salix*-এ পলিপ্লয়েডি পাওয়া যায় কিন্তু *Populus*-এ পলিপ্লয়েডি দেখা যায় না। *Crepis* ও *Solanum*-এর কোন কোন প্রজাতি ডিপ্লয়েড কিন্তু অন্যান্য প্রজাতি পলিপ্লয়েড। কিছু গোত্রে, যেমন *Rosaceae*-তে পলিপ্লয়েডি ও সংকরণ একই সাথে হয়েছে এবং এইজন্য উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। *Amaryllidaceae*-তেও বিভিন্ন মাত্রার পলিপ্লয়েডি দেখা যায় (চিত্র 135a-b, 136a-b)।

চিত্র 135

Crinum-এর বিভিন্ন প্রজাতিতে ক্রোমোসোম সংখ্যার পার্থক্য, a — *C. augustum*-এর (ডিপ্লয়েড) ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল ২n = ২২, b — *C. defixum*-এর (ট্রিপ্লয়েড) দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল 33 (Guha)

উদ্ভিদের গঠনের সাথে পলিপ্লয়েডির সম্বন্ধ আছে (Stebbins 1938) বহুবর্ষজীবী বীরুতে (*herb*) পলিপ্লয়েডি বেশী দেখা যায়। একবর্ষজীবী উদ্ভিদে পলিপ্লয়েডি বিরল। এর কারণ হ'ল একবর্ষজীবী উদ্ভিদের জীবনকাল এত ছোট যে ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে এদের পলিপ্লয়েড হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। বিশেষতঃ একবর্ষজীবী অনুর্বর সংকর উদ্ভিদের পলিপ্লয়েড হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু বহুবর্ষজীবী
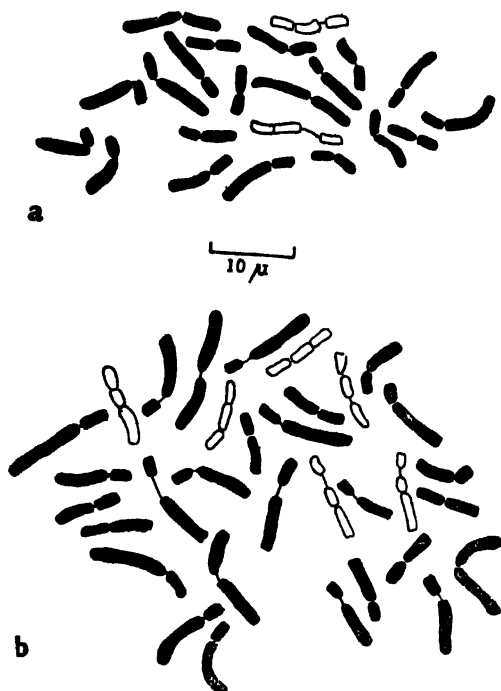
চিত্র 136

Amaryllis-এর বিভিন্ন প্রজাতিতে ক্রোমোসোম সংখ্যার পার্থক্য,
a — *Amaryllis* Mrs Grafield-এর (ডিপ্লয়েড) ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল 2n = 22,
b — *Amaryllis* Grant Dutch var. Red-এর (টেট্রাপ্লয়েড) দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল 44 (Guha)।

অনুর্বর সংকর উদ্ভিদ যদি সবল হয় ও অঙ্গজ জননের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাহলে কোন সময় আকস্মিকভাবে এদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উর্বর অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডের সৃষ্টি হতে পারে।

কাষ্ঠল প্রজাতিতে (*woody species*) পলিপ্লয়েডি বেশী দেখা যায়। Stebbins-এর (1938) মতে বীরুতের তুলনায় বৃক্ষের মূল সংখ্যা (*basic number*) বেশী। কাষ্ঠল প্রজাতির মূল বা বেসিক সংখ্যা হ'ল 11—16 এবং বীরুতে এই সংখ্যা সাধারণতঃ 7, 8, 9 হয়। কাষ্ঠল প্রজাতির মূল সংখ্যা পলিপ্লয়েডির ফলেই সৃষ্টি হয়েছে কারণ *Annonaceae*

গোত্রের অন্তর্গত গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের বৃক্ষের মূল সংখ্যা হ'ল 7, 8, 9 এবং *Cesalpinoideae*-র মূল সংখ্যা হ'ল 6 ও 7 (Stebbins 1950)। *Caesalpinoideae*-র অন্তর্গত *Cercis*-এর মূল বা বেসিক সংখ্যা হ'ল 6 ও 7। এর নিকট সম্বন্ধীয় গণ (*genus*) *Bauhinia*-র মূল ক্রোমোসোম সংখ্যা হ'ল 14 এবং এই সংখ্যা পলিপ্লয়েডির ফলেই হয়েছে। Avdulov-এর (1931) মতে গ্র্যামিনীর মূল সংখ্যা 12 কারণ তিনি ব্যাম্বুসী (*Bambuceae*) ও ফ্র্যাগর্মিটিফর্মিসে (*Fragmitiformis*) এই সংখ্যা পেয়েছিলেন। কিন্তু পরে ফ্যাগর্মিটিফর্মিস ট্রাইবের (*tribe*) একটা প্রাচীন গণ (*genus*) *Danthonia*-এ 6 ও 9 ক্রোমোসোম সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে বলা যায় যে ফ্যাগর্মিটিফর্মিসের 12 সংখ্যা অনেক দিন আগে পলিপ্লয়েডির ফলে হয়েছে। এছাড়া *Oryzeae, Eragrastae, Panicaceae, Andropogoneae, Maydeae* ইত্যাদি ট্রাইব (*tribe*) বহুদিন আগে পলিপ্লয়েডির ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। *Rumex, Dianthus, Mentha, Salix, Thalictrum* ইত্যাদির অধিকাংশ প্রজাতিই পলিপ্লয়েড।

বিবর্তনে পলিপ্লয়েডি

উদ্ভিদে স্বাভাবিক পলিপ্লয়েডির প্রাচুর্য্য বিবর্তনে এদের গুরুত্বের ইঙ্গিত করে। স্বাভাবিক পলিপ্লয়েডের সাথে তাদের ডিপ্লয়েড প্রজাতির তুলনা ক'রে এবং কৃত্রিম পলিপ্লয়েডের সৃষ্টি ক'রে বিবর্তনে পলিপ্লয়েডির ভূমিকা সম্বন্ধে জানা যায়। কোন কোন স্বাভাবিক পলিপ্লয়েডের প্রত্যাশিত ডিপ্লয়েড মাতা পিতা থেকে কৃত্রিম পলিপ্লয়েড সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই পলিপ্লয়েড স্বাভাবিক পলিপ্লয়েডের অনুরূপ হয়। এইভাবে *Galeopsis tetrahit, Nicotiana tabacum, Gossypium hirsutum* ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রোমোসোমের সংখ্যা বাড়ার ফলে ক্রমবিকাশের কতখানি সুবিধা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেগমেন্টাল (*segmental*) বা আংশিক পলিপ্লয়েডের সাথে আসল অটোপলিপ্লয়েডের সামঞ্জস্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিবর্তনে অটোপলিপ্লয়েডের ভূমিকা সম্বন্ধে আগে যে ধারণা করা হ'ত তা নিয়ে প্রশ্ন করা যায়। Stebbins-এর মতে প্রকৃত অটোটেট্রাপ্লয়েড *Galax aphylla*-র ডিপ্লয়েড পূর্বপুরুষ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অটোটেট্রাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েডের মধ্যে বহিঃগঠন, বিস্তার কিম্বা শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং এখানে পলিপ্লয়েডির বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। তবে অটোপলিপ্লয়েড সংকরণকে

সহায়তা করে। যেসব উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড স্তরে সংকর তৈরী করা যায় না সেখানে পলিপ্লয়েডি সংকরণকে সফল করে। Gustafson-এর মতে কেবল পালপ্লয়েডি ক্রমবিকাশে নূতন পথের সৃষ্টি করতে পারে না। পলিপ্লয়েডি উদ্ভিদের সংকরণ ও বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এটাই হ'ল প্রকৃতিতে পলিপ্লয়েডির প্রধান ভূমিকা। সংকরণ ও ক্রোমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি কেবল আকস্মিকভাবে একসাথে হয়। Clausen, Keck ও Heisey (1945) বলেন যে, সব সংকর উদ্ভিদই সবল, উর্বর পলিপ্লয়েডে পরিবর্তিত হয় না। বরং বেশীর ভাগ সংকর উদ্ভিদ প্রতিযোগিতায় অসফল হয়ে বাতিল হয়ে যায়।

পলিপ্লয়েডের মধ্যে টেট্রাপ্লয়েড সবচেয়ে সুবিধাজনক। টেট্রাপ্লয়েড স্তবেব চেয়ে উচ্চতর পলিপ্লয়েডির ফলে জটিলতা বাড়ে। জীনের নতুন সংযোগ বা রিকমবিনেশন (*recombination*) কম হয় ও ক্রমবিকাশের ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। *Psilotum, Tmesipteris, Ophioglossum* ইত্যাদি এর উদাহরণ।

পলিপ্লয়েডির ফলে ডিপ্লয়েড অবস্থার আমূলে পরিবর্তন হয় না, কেবল এর পুনর্বিন্যাস হয়। পলিপ্লয়েডি ও সংকরণের সাথে উর্বরতা ও গঠনগত পার্থক্য জড়িত থাকলে তবেই নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হতে পারে। নবগঠিত পলিপ্লয়েডের সাফল্য নির্ভর করে এর জনন ক্ষমতার উপর।

উদ্ভিদে ক্রমবিকাশের ধারা জটিল কারণ এখানে পলিপ্লয়েডি ও সংকরণ বিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের কোন গণ (*genus*) বা গোত্রের (*family*) কিছু জীন অন্য কোন গণ বা গোত্রের কোন কোন জীনের মত হতে পারে যদিও এই উদ্ভিদগুলির মধ্যে আর কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে মতভেদ আছে। বহু সনামধন্য বিজ্ঞানী যেমন Benthum ও Hooker, Engler, Wettstein, Bessy, Hutchinson প্রত্যেকে উদ্ভিদের পৃথক পৃথক শ্রেণী বিভাগ করেছেন। এই পার্থক্যের কারণ হ'ল যে প্রত্যেক বিজ্ঞানী শ্রেণী বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা চরিত্র নির্বাচন করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণী বিভাগই ঠিক। বিবর্তনের জালিকাকার ধারাই এই বৈষম্যের কারণ।

জীন মিউটেশন, ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিকতা, জীনের নতুন সংযোগ বা বিকমবিনেশন (*recombination*) অ্যানইউপ্লয়ডি ও নির্বাচন (*selection*) ডিপ্লয়েড স্তরে নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। ডিপ্লয়েড ও কিছু পরিমাণে টেট্রাপ্লয়েড হ'ল নূতন গণ (*genus*) ও গোত্রের (*family*) উৎস। উচ্চতর পলিপ্লয়েডির ফলে কেবল নূতন প্রজাতির সৃষ্টি

(২) এমার (*Emmer*) শ্রেণীর গম টেট্রাপ্লয়েড (২n = ২৪) *T. dicoccoides, T. dicoccum, T. durum, T. persicum, T. polonicum* ও *T. turgidum* এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এমার শ্রেণীর গমে AABB জীনোম থাকে ও এদের কিছুটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে।

(3) ভালগার (*Vulgare*) বা ডিঙ্কেল (*Dinkel*) শ্রেণীর গম অ্যালো-হেক্সাপ্লয়েড (২n = ৪২)। *T. vulgare, T. compactum, T. spelta* ডিঙ্কেল শ্রেণীর গম। ডিঙ্কেল গম খুব ভাল জাতের কিন্তু এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। এই গমে AABBDD জীনোম থাকে। AA জীনোমযুক্ত *einkorn* গম সবচেয়ে প্রাচীন। AABB জীনোমযুক্ত *emmer* গম আইনকর্ণ গম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ভূমধ্যসাগব অঞ্চলের ঘাস *Aegilops*-এর সাথে *emmer* গমের সংকরণ এবং সংকর উদ্ভিদের ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ডিঙ্কেল গমের উৎপত্তি হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে গমের প্রজাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা যায়।

(1) *T. monococcum* AA ($2n = 14$) আইনকর্ণ × *T. turgidum* AABB ($2n = 28$) এমার

↓

F_1 AAB ($2n = 21$)

মায়োসিসে $7_{II} + 7_I$
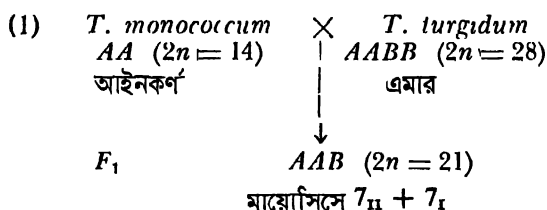
সুতরাং *T. turgidum*-এর একটা জীনোম (*A*) *T. monococcum*-এর মত এবং সেজন্য এরা যুগ্ম অবস্থান করে ও 7টা বাইভ্যালেন্ট তৈরী হয়। *T. turgidum*-এর অন্য জীনোমটা ইউনিভ্যালেন্ট হিসাবে থাকে।

(2) *T. turgidum* AABB ($2n = 28$) এমার × *T. vulgare* AABBDD ($2n = 42$) ডিঙ্কেল

↓

F_1 AABBD ($2n = 35$)

মায়োসিসে $14_{II} + 7_I$
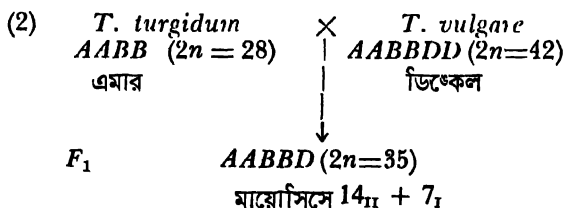
ডিঙ্কেল গমের দুইটা জীনোম (AB) এমারের দুইটা জীনোমের সাথে যুগ্ম অবস্থান করায় 14টা বাইভ্যালেন্ট তৈরী হয়। ডিঙ্কেল গমের অন্য জীনোমটা (D) ইউনিভ্যালেন্ট হিসাবে থাকে। সুতরাং ডিঙ্কেল গমের AB জীনোম এমার গম থেকে এসেছে।

(3) *T. monococcum* × *Aegilops speltoides*
AA ($2n = 14$) *BB* ($2n = 14$)
আইনকর্ণ
↓
AB
F_1 অনুর্বর ($2n = 14$)
| ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে
↓
AABB
উর্বর ($2n = 28$)
এমার
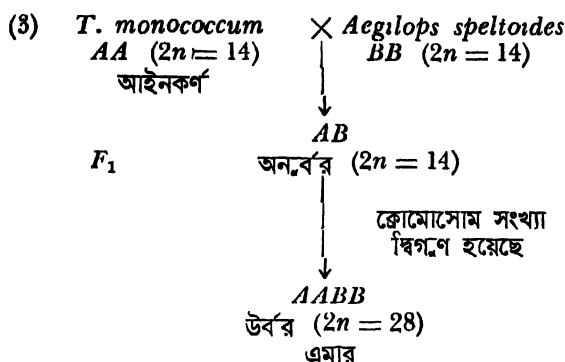
এমার গমের B জীনোম *Aegilops* থেকে এসেছে এবং আইনকর্ণ গমের সাথে *A. speltoides* সংকরণের ফলে এমার গমের সৃষ্টি হয়েছে। এমার গমের (AABB; $2n = 28$) সাথে *A. speltoides* (BB; $2n = 14$) ব্যাক ক্রস করলে 7টা বাইভ্যালেন্ট (BB) ও 7টা ইউনিভ্যালেন্ট (A) গঠিত হয়।

(4) *T. dicoccum* × *A. squarrosa*
AABB ($2n = 28$) *DD* ($2n = 14$)
এমার
↓
F_1 *ABD* ($2n = 21$)
| ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে
↓
AABBDD ($2n = 42$)

এই উদ্ভিদটা *T. spelta*-র (ডিঙ্কেল গম) মত

(5) *T. spelta* × *A. squarrosa*
($2n=42$) *AABBDD* *DD* ($2n = 14$)
ডিঙ্কেল
↓
F_1 *ABDD* ($2n = 28$)
মায়োসিসে $7_{II} + 14_{I}$
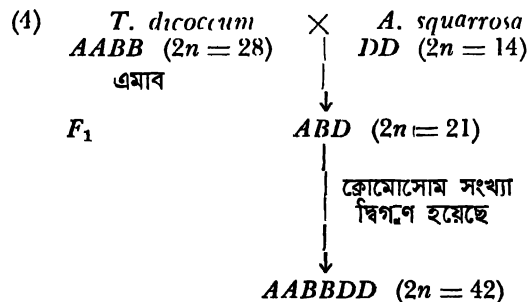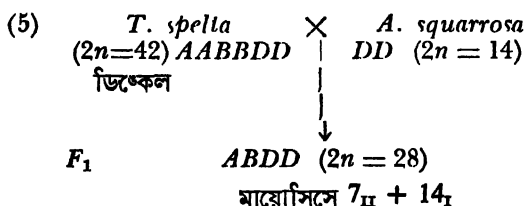
এই গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে ডিঙ্কেল গম এমার গম ও *A. squarrosa*-র মিলনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে।

নীচের চিত্রে (চিত্র 138) আইনকর্ণ, এমার, ডিঙেকল গম ও *Aegilops*-এর বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সম্পর্ক দেখান হয়েছে।
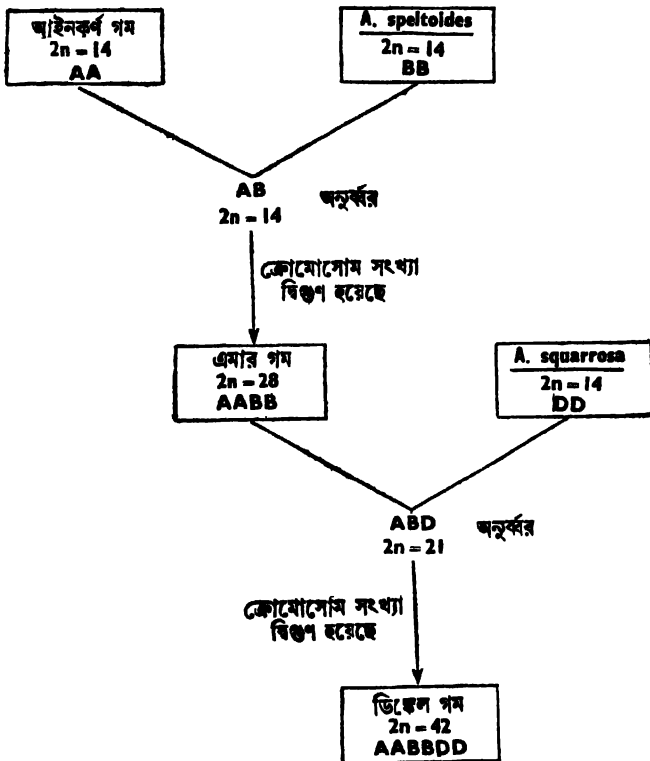
চিত্র 138
আইনকর্ণ, এমার, ডিঙেকল গম এবং *Ageilops*-এর বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সম্পর্ক দেখান হয়েছে।

ধানেও পলিপ্লয়েডি দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন জীনোমের ভিত্তিতে ধানের বিভিন্ন প্রজাতিগুলিকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—

(1) *Sativa* শ্রেণী—জীনোম AA (2n = 24) *O. sativa. O. perennis, O. glaberrima, O. cubensis* ইত্যাদি।

(2) *Granulata* শ্রেণী—জীনোম BB (2n = 24) *O. granulata*

(3) *Officinalis* শ্রেণী—জীনোম CC (2n = 24) *O. officinalis*

CCDD জীনোমযুক্ত আমেরিকার টেট্রাপ্লয়েড প্রজাতি হ'ল *O. latifolia* এবং *O. alata* (2n = 48)। টেট্রাপ্লয়েড ধান *O. minuta* ও *O. eichingeri*-তে BBCC জীনোম থাকে।

ডিপ্লয়েড ধানের সাথে টেট্রাপ্লয়েড ধানের সংকরণ করে ট্রিপ্লয়েড (3n) ধানের সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতিতেও কখনও কখনও ট্রিপ্লয়েড ধান দেখা যায়। সম্ভবতঃ হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড গ্যামেটের মিলনের ফলে এই ধানের সৃষ্টি হয়। টেট্রাপ্লয়েড ধানও প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এই ধান আংশিক অনুর্বর, তবে ডিপ্লয়েডের তুলনায় বড় হয়, এদের পাতা, মঞ্জরী, বীজ ইত্যাদিও বড় হয়।
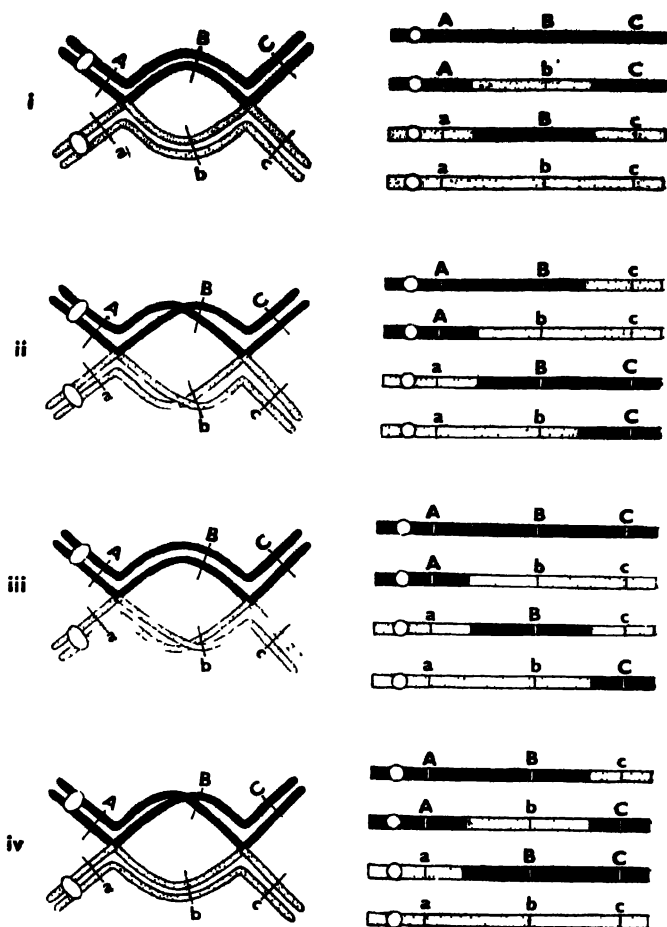
চিত্র 140

একটা বাইভ্যালেন্টে দুইটা ক্রসিং ওভারের ফলে দুইটা, তিনটা বা চারটা ক্রোমাটিডই পরিবর্তিত হয়।

i — দুইটা ক্রোমাটিডের মধ্যে দুইটা ক্রসিং ওভার,

ii — চারটা ক্রোমাটিডের মধ্যে দুইটা ক্রসিং ওভার হয়েছে,

iii-iv — তিনটা ক্রোমাটিডের মধ্যে দুইটা ক্রসিং ওভার।

ইন্টারফেয়্যারেন্স (*interference*) **বা প্রতিবন্ধক**

Drosophila-র উপর গবেষণা থেকে Muller 1911 খৃষ্টাব্দে ইন্টারফেয়্যারেন্স (*interference*) বা প্রতিবন্ধক আবিষ্কার করেন। যখন

দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের দুইটা ক্রোমাটিডের মধ্যে কোন একটা স্থানে ক্রসিং ওভার হয় তখন ঐ ক্রসিং ওভারের স্থান থেকে কিছুটা দূরত্বের মধ্যে দ্বিতীয় ক্রসিং ওভার হতে পারে না অর্থাৎ কোন একটা স্থানের ক্রসিং ওভার নিকটবর্তী অঞ্চলের ক্রসওভারকে বাঁধা দেয়। এই অবস্থাকে ইন্টারফেয়্যারেন্স বা প্রতিবন্ধক বলা হয়। ইন্টারফেয়্যারেন্সের মাত্রা একই কোষের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে কিম্বা একই ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অংশে আলাদা হয়। ইন্টারফেয়্যারেন্সের জন্য *Drosophila melanogaster*-এর X-ক্রোমোসোমে দশ একক বা তার কম ব্যবধানের মধ্যে দুইটা ক্রসিং ওভার হয় না। দূরত্ব যত বাড়ে ইন্ট্যারফেয়্যারেন্সের মাত্রা তত কমে। যথেষ্ট ব্যবধানে ইন্ট্যারফেয়্যারেন্স দেখা যায় না অর্থাৎ এর মাত্রা O হয়। ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমে 45 একক ব্যবধানে ইন্ট্যারফেয়্যারেন্স সম্পূর্ণ দূর হয়।

ইন্ট্যারফেয়্যারেন্সের বিপরীত প্রক্রিয়াকে *coincidence* বা সমস্থানিকতা বলা হয়। ইন্ট্যারফেয়্যারেন্সকে সম্ভাবনার মতবাদ দিয়ে ভালভাবে বোঝা যায়। ভুট্টায় *bm* ও *pr* জীনের মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার 22·27% (অর্থাৎ 0·2227)। *pr* ও *v*-র মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার হ'ল 43·37% (অর্থাৎ 0·4337)। *bm* ও *pr* এবং *pr* ও *v*-র মধ্যে একই সাথে ক্রসিং ওভারের সম্ভাবনা হ'ল $0·2227 \times 0·4337$ বা 9·66। কোন প্রতিবন্ধক বা ইন্ট্যারফেয়্যারেন্স না থাকলে 9·66 শতাংশ ক্ষেত্রে দুইটা ক্রসিং ওভার (*double crossing over*) হয়। কিন্তু কার্যতঃ 7·75% ডাবল ক্রসিং ওভার পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষিত ও প্রত্যাশিত হারের এই তফাৎ ইন্ট্যারফেয়্যারেন্সের জন্য হয়। পর্যবেক্ষিত ক্রসওভারের শতকরা হার ও প্রত্যাশিত হারের অনুপাতকে সমস্থানিকতা বা কোয়েনসাইডেন্স (*coincidence*) বলে। ভুট্টার এই পরীক্ষায় কোয়েনসাইডেন্স হ'ল $\frac{7.75}{9.66}$ বা 0·802। প্রত্যাশিত অনুপাতের সাথে পর্যবেক্ষিত অনুপাতের কোন পার্থক্য না থাকলে কোয়েনসাইডেন্স 1 ও ইন্ট্যারফেয়্যারেন্স 0 হয়। সুতরাং কোয়েনসাইডেন্স যত বেশী হবে ইন্ট্যারফেয়্যারেন্স ততই কম হবে।

সোমাটিক ক্রসিং ওভার (*somatic crossing over*)

ক্রসিং ওভার মায়োসিসের সময় জনন কোষে হয়। দেহ কোষে ক্রসিং ওভার সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু Stern *Drosophila melanogaster*-এর দেহ কোষে ক্রসিং ওভার দেখতে পেয়েছিলেন, তবে এখানে জনন কোষের

তুলনায় কম ক্রসিং ওভার হয়। জনন কোষগুলির উপর সোমাটিক ক্রসিং ওভারের কোন প্রভাব নাই। *Aspergillus*-এর কৃত্রিম উপায়ে গঠিত ডিপ্লয়েড নিউক্লীয়াসে সোমাটিক ক্রসিং ওভার দেখা গিয়েছে। ড্রসোফিলায় পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সোমাটিক ক্রসিং ওভার হয় যদিও স্ত্রীতে এর হার অপেক্ষাকৃত কম। ২5°C তাপমাত্রার তুলনায় 30°C তাপমাত্রায় ড্রসোফিলায় সোমাটিক ক্রসিং ওভার কম হয়। কিন্তু জনন কোষে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে ক্রসিং ওভারের হারও বাড়ে। ড্রসোফিলায় দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং X-ক্রোমোসোমে সোমাটিক ক্রসিং ওভার সাধারণতঃ দেখা যায়। হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের যুগ্ম অবস্থান করবার প্রবণতার জন্য এই ক্রসিং ওভার হয়। সোমাটিক ক্রসিং ওভারের হার ও অবস্থান হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল দিয়ে প্রভাবিত হয়। ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমে অবস্থিত জীন y (*yellow body* বা হলদে দেহ) ও জীন sn (*singed bristles* বা ছোট কুঞ্চিত লোম) এর মধ্যে সোমাটিক ক্রসিং ওভার হয়। সেন্ট্রোমিয়ার থেকে 66 মানচিত্র একক ব্যবধানে y জীন থাকে। y জীন থেকে ২1 মানচিত্র একক ব্যবধানে সেন্ট্রোমিয়ারের দিকে sn জীন থাকে। এখানে ডমিন্যান্ট জীন *minute*-এর (ছোট) উপস্থিতিতে ক্রসিং ওভারের হার বাড়ে।

একটা হেটারোজাইগাস ড্রসোফিলায় y ও sn একটা ক্রোমোসোমে এবং Y ও Sn-এর হোমোলোগাস (সমসংস্থ) ক্রোমোসোমে থাকে। এই ক্রোমোসোম দুইটার ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার হ'লে ক্রসিং ওভারের পর চারটা ক্রোমাটিড হবে y-sn, y-Sn, Y-sn, Y-Sn (চিত্র 141)। যদি একটা অপত্য কোষে y-sn এবং Y-Sn ক্রোমাটিড দুইটা ও অন্য অপত্য কোষে y-Sn ও Y-sn ক্রোমাটিডদ্বয় যায় তাহলে উভয় কোষেই ডমিন্যান্ট চরিত্র প্রকাশ পাবে। কিন্তু একটা অপত্য কোষে Y-Sn ও Y-sn ও অন্যটায় y-Sn ও y-sn ক্রোমাটিড গেলে দ্বিতীয় কোষটায় y-র কোন ডমিন্যান্ট অ্যালীল (*dominant allele*) থাকে না। এইরকম কোষ বারবার বিভক্ত হ'লে দেহের ঐ অংশে হলদে দাগ দেখা যাবে। সোমাটিক ক্রসিং ওভারের ফলেই স্বাভাবিক ধূসর দেহের কোন কোন জায়গায় হলদে দাগ দেখা যায়। ভুট্টায়ও সোমাটিক ক্রসিং ওভার দেখা গিয়েছে।

সোমাটিক ক্রসিং ওভারও চার সূত্র অবস্থায় দুইটা অভগ্নী (*non-sister*) ক্রোমাটিডের মধ্যে হয়। এই ক্রসিং ওভারের সময় কায়েসমা গঠিত হ'লে তা মেটাফেজের আগেই অদৃশ্য হয়।

অসমান ক্রসিং ওভার

আগেই বলা হয়েছে যে ক্রসিং ওভারের আগে যুগ্মতা বা সাইন্যাপসিস
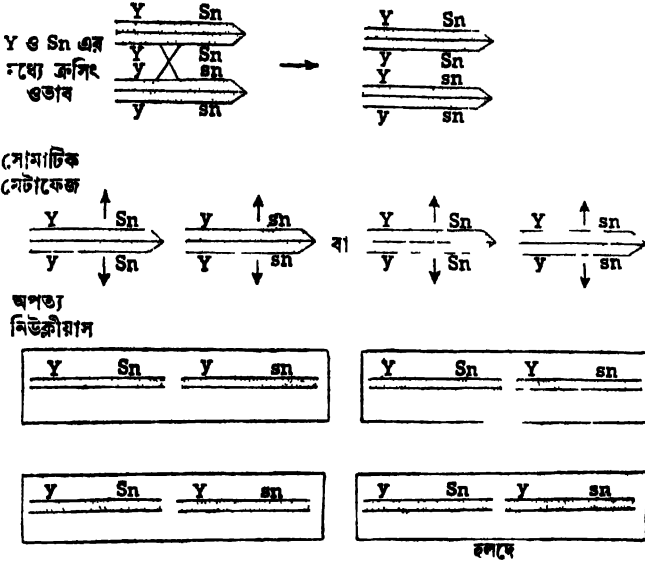
চিত্র 141

ড্রসোফিলায় y ও sn জীনের মধ্যে ক্রসওভার

(*synapsis*) এত সূক্ষ্মভাবে হয় যে প্রত্যেক জীন তাব হোমোলোগাস জীনের সাথে যুগ্ম অবস্থান করে। ক্রসিং ওভারের ফলে প্রায় সব সময়ই ক্রোমাটিড দুইটা সমান অংশ বিনিময় করে। কিন্তু Sturtevant (1925) দেখেন যে *Drosophila melanogaster*-এর "বার" (*Bar*) জীনের স্থানে অসমান ক্রসিং ওভার হয় এবং এর ফলে সহজেই "বার" থেকে স্বাভাবিক কিম্বা "বার-ডাবল" (*bar-double*) পতঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে (চিত্র 105)। একইভাবে ইনফ্রা-বাব (*infra-bar*) থেকে অসমান ক্রসিং ওভারের ফলে স্বাভাবিক বা ইনফ্রা-বার-ডাবল (*infra-bar-double*) ড্রসোফিলাব সৃষ্টি হয়। ভুট্টার "A" অঞ্চলেও অসমান ক্রসিং ওভার দেখা গিয়েছে।

ভগ্নী-ক্রোমাটিডের (*sister chromatid*) মধ্যে ক্রসিং ওভার

সাধারণতঃ ক্রসিং ওভার অভগ্নী (*non-sister*) ক্রোমাটিডের মধ্যে হয়। McClintock (1938, 1941) ভুট্টায় রিঙ (*ring*) বা বলয়াকার ক্রোমোসোমে ভগ্নী ক্রোমাটিডেব মধ্যে ক্রসিং ওভার দেখেছিলেন। ভগ্নী ক্রোমাটিডে ক্রসিং ওভার হ'লে বলযাকাব ক্রোমোসোমে তা সহজেই ধরা যায়। Schwartz (1953) দেখেন যে ভুট্টায় যখন বলয়াকার ক্রোমোসোমটা এর

হোমোলোগাস I-আকৃতির (*rod*) ক্রোমোসোমের সাথে হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকে তখন মায়োসিসে ভগ্নী সূত্রের মধ্যে কখনও কখনও ক্রসিং ওভার হয়। তিনি বলেন (1954) যে ড্রসোফিলার যুক্ত-X ক্রোমোসোমেও ভগ্নী ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়। Braver ও Blount-ও (1950) ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমের উপর গবেষণা করে বলেন যে কোন কোন দেহ কোষে ভগ্নী সূত্রের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়। ভগ্নী ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার কায়েসমার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না।

পুরুষ ড্রসোফিলায় ক্রসিং ওভারের অনুপস্থিতি

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীতে লিঙ্কড (*linked*) বা সংযুক্ত জীনের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়। কিন্তু পতঙ্গের স্ত্রী ও পুরুষের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন হয়। পুরুষ ড্রসোফিলায় ক্রসিং ওভার হয় না।

ড্রসোফিলায় ধূসর দেহ (*gray body*-জীন B) ও দীর্ঘ পাখা (*long wing*-জীন V) কৃষ্ণ দেহ (*black body*-জীন b) ও ভেস্টিজিয়েল বা অদৃশ্যপ্রায় পাখার (*vestigial wing*-জীন v) উপর ডমিন্যান্ট (প্রবল)। একটা ধূসর দেহ ও ভেস্টিজিয়েল বা অদৃশ্যপ্রায় পাখাযুক্ত (*vestigial wing*) পতঙ্গের সাথে কৃষ্ণ দেহ ও দীর্ঘ পাখাযুক্ত পতঙ্গের মিলনের ফলে F_1 এ ধূসর দেহ দীর্ঘ পাখাযুক্ত পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। এইরকম একটা পুরুষ পতঙ্গের সাথে কৃষ্ণ দেহ ও ভেস্টিজিয়েল পাখাযুক্ত স্ত্রী পতঙ্গের মিলন হ'লে কেবল দুই রকমের অর্থাৎ ধূসর দেহ ও ভেস্টিজিয়েল পাখা-যুক্ত এবং কৃষ্ণ দেহ ও দীর্ঘ পাখাযুক্ত পতঙ্গ পাওয়া যায়। প্রত্যাশিত ক্রসিং ওভার দুইটা অর্থাৎ ধূসর দেহ দীর্ঘ পাখাযুক্ত ও কৃষ্ণ দেহ ভেস্টি-জিয়েল পাখাযুক্ত পতঙ্গ একেবারেই পাওয়া যায় না (চিত্র 142)। কিন্তু একটা F_1-এর স্ত্রী পতঙ্গের সাথে কৃষ্ণ দেহ ও ভেস্টিজিয়েল পাখাযুক্ত পুরুষ পতঙ্গের মিলনের ফলে চার ধরনের প্রত্যাশিত পতঙ্গই (চিত্র 143) দেখতে পাওয়া যায় (Morgan 1909)। এখানে 17 শতাংশ ক্ষেত্রে ক্রসওভার দেখা যায়। সুতরাং পুরুষ ড্রসোফিলায় ক্রসওভারের অনুপস্থিতির কারণ B ও V জীন দুইটার বেশী কাছে অবস্থানের জন্য হয় না। ক্রসওভারের অনুপস্থিতির কারণ হ'ল পুরুষ ড্রসোফিলার সাধারণতঃ কায়েসমা গঠনের অক্ষমতা। Darlington ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা দেখেন যে পুরুষ ড্রসোফিলায় স্পার্ম গঠনের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থান করে কিন্তু কোন কায়েসমা গঠিত হয় না। Cooper (1949) পুরুষ ড্রসোফিলায় কায়েসমা আবিষ্কার করেন কিন্তু এখানে কোন ক্রসিং ওভার হয় না। সুতরাং বলা যায় যে কায়েসমা গঠিত হলেই ক্রসিং ওভার
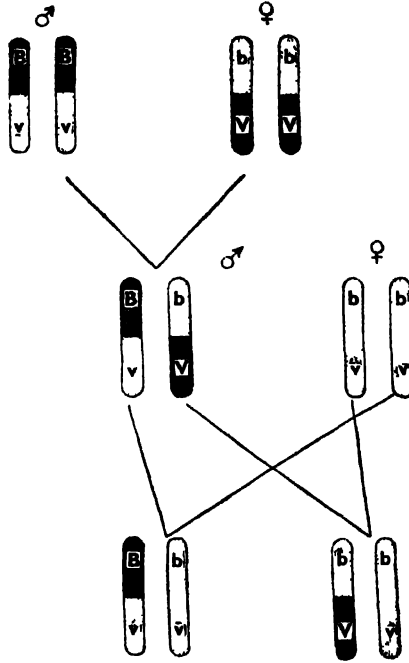
চিত্র 142
ধূসর দেহ (B) ও ভেস্টিজিয়েল (v) পাখাযুক্ত ড্রসোফিলার সাথে কৃষ্ণ দেহ (b) ও দীর্ঘ পাখাযুক্ত (V) ড্রসোফিলার সংকরণের ফলে সৃষ্ট F_1-এর পুরুষ পতঙ্গের সাথে কৃষ্ণ দেহ (b) ও ভেস্টিজিয়েল পাখাযুক্ত (v) ড্রসোফিলার মিলনের ফলে কেবল দুই রকমের পতঙ্গ পাওয়া যায়।

হবে এই ধারণা ঠিক নয়। স্ত্রী রেশমের গুটি পোকায়ও (*silk worm moth*) ক্রসিং ওভার দেখা যায় না।

পলিপ্লয়েডে ক্রসিং ওভার

ডিপ্লয়েডের তুলনায় পলিপ্লয়েডে ক্রসিং ওভার বেশী জটিল। যে সব অ্যালোপলিপ্লয়েডে কেবল বাইভ্যালেন্ট গঠিত হয় সেখানে ডিপ্লয়েডের মতই ক্রসিং ওভার হয়, তবে ক্রোমোসোমের কোন অংশ দ্বিগুণ অবস্থায় থাকলে জটিলতা দেখা দেয়। যদিও একটা মায়োটিক কোষে তিনটা বা তার চেয়ে বেশী হোমোলোগ (*homologue*) পাশাপাশি থাকতে পারে কিন্তু

কোন একটা জায়গায় কেবল দুইটা ক্রোমোসোম যুগ্ম অবস্থান করে। কোন কোষে দুইটার চেয়ে বেশী হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের উপস্থিতি ক্রসিং ওভারের হারকে প্রভাবিত করে কারণ ঐ অবস্থায় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে যুগ্মতার জন্য প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। অটোপলি-

চিত্র 143
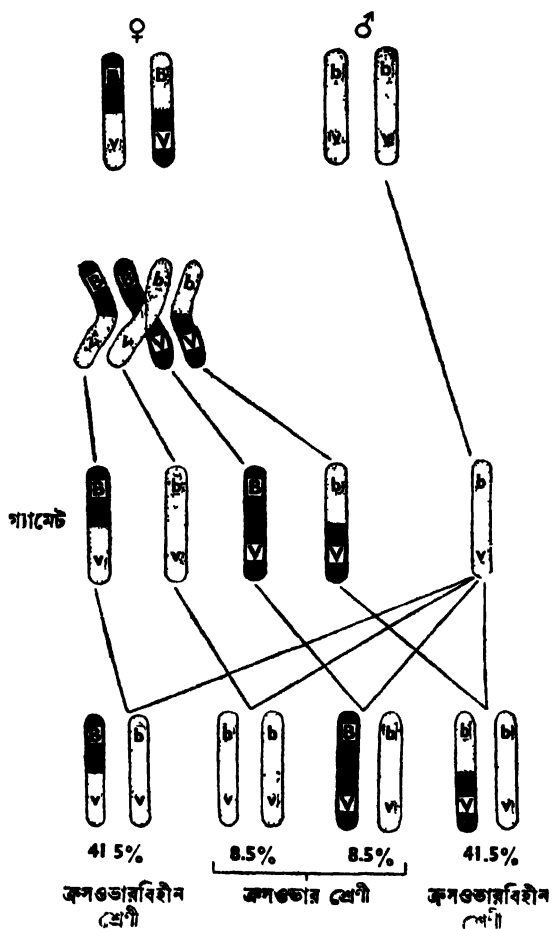
F_1-র ধূসর দেহ ও দীর্ঘ পাখাযুক্ত স্ত্রী ড্রসোফিলার সাথে কৃষ্ণ দেহ ও ভেস্টিজিয়েল পাখাযুক্ত পতঙ্গের মিলনের ফলে চার রকমের পতঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে।

প্লয়েডে মাল্টিভ্যালেন্ট (*multivalent*) গঠিত হওয়ার ফলে ক্রসিং ওভারও জটিল হয়।

ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমের প্রান্তের দিকে ক্রসিং ওভারের হার বাড়ে কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানে ক্রসিং ওভারের হার ঠিক ততখানিই কমে। ট্রিপ্লয়েডে ডিপ্লয়েডের তুলনায় বেশী হারে ডাবল ক্রসিং ওভার হয়।

ডিপ্লয়েডের তুলনায় ট্রিপ্লয়েড পতঙ্গের অটোসোমেও (*autosome*) ক্রসিং ওভারের হারের তারতম্য হয়।

XXX ড্রসোফিলায় XX ক্রোমোসোম দুইটা সেন্ট্রোমিযার অঞ্চলে যুক্ত থাকে, অন্য Xটা আলাদা থাকে। ট্রিপ্লয়েডে XX ও X ক্রোমোসোম-গুলিতে সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের অঞ্চলে ক্রসিং ওভারের হার যথেষ্ট বেশী হয় এবং দূরের অঞ্চলে সামান্য বাড়ে। যুক্ত XX ক্রোমোসোম দুইটার মধ্যে পৃথক X ক্রোমোসোমের তুলনায় বেশী হারে ক্রসিং ওভার হয়।

X—Y ক্রোমোসোমের মধ্যে ক্রসিং ওভার

পুরুষ ড্রসোফিলার জনন কোষে ক্রসিং ওভার দেখা যায় না কিন্তু এর শুক্রধানীর কোষে (*spermatogonial cell*) সোমাটিক ক্রসিং ওভার দেখা গিয়েছে। ড্রসোফিলায় XXY স্ত্রী পতঙ্গে ও XY পুরুষ পতঙ্গে X ও Y ক্রোমোসোমের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়। সব ক্ষেত্রেই X ক্রোমো-সোমের সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের হেটারোক্রোমাটিন অংশের সাথে Y ক্রোমোসোমের দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র বাহুর ক্রসিং ওভার হয়। Y ক্রোমোসোমের ক্ষুদ্র বাহুর সাথে X ক্রোমোসোমের ক্রসওভার হ'লে এই ক্রসওভার X ক্রোমোসোমের জীন ববডের (*bobbed*-b) ডান কিম্বা বাঁ দিকে হয়। Y ক্রোমোসোমেব দীর্ঘ বাহুর সাথে ক্রসিং ওভার হ'লে এই ক্রসওভাব জীন ববডের ডান দিকে (অর্থাৎ সেন্ট্রোমিয়ার ও জীন ববডের মাঝে) হয়। সুতরাং Y-ক্রোমোসোমের দুইটা পৃথক অঞ্চল X-ক্রোমোসোমের সাথে হোমোলোগাস।

ক্রসিং ওভারের আচরণের ব্যাতিক্রম

কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রসিং ওভারের আচরণে কিছু ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি যে, একটা ক্রসিং ওভার নিকটবর্তী অঞ্চলের ক্রসিং ওভারকে বাঁধা দেয়। সাধারণতঃ 10 মানচিত্র একক ব্যবধানের মধ্যে দুইটা ক্রসিং ওভার হয় না। কিন্তু *Neurospora* এবং অন্যান্য কিছু জীবে খুব কাছে অবস্থিত (0·1 এককের চেয়ে কম ব্যবধানে) দুইটা স্থানের মধ্যে কয়েকটা ক্রসিং ওভার হয। সাধারণতঃ এই অঞ্চলে ক্রসওভারের সংখ্যা

তিনটার চেয়ে বেশী হয় না। এত কাছে অবস্থিত দুইটা স্থানের মধ্যে একাধিক ক্রসিং ওভার গঠিত হওয়ার কারণ সঠিক জানা যায় নাই।

সাধারণতঃ মায়োসিসে চারসূত্র অবস্থায় দুইটা ক্রোমাটিডের সমান অংশ বিনিময়ের ফলে ক্রসিং ওভার হয়। কিন্তু ইষ্ট ও *Neurospora*-এ (ছত্রাক) এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা হয়েছে। দইটা ক্রোমোসোমের $x^+ y$ এবং $x y^1$ অঞ্চলের মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে চার-রকমের ক্রোমাটিড অর্থাৎ x^+y, x^+y^1, xy^+ এবং xy^+ দেখা যায়; অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে $3y^+$ এবং $1y$ থাকে। কিন্তু সচরাচর ক্রসিং ওভারের পর $2y^1$ ও $2y$ পাওয়ার কথা। y জীনের এরকম অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের সঠিক ব্যাখ্যা এখনো করা যায় নাই।

ক্রসিং ওভারের সাইটোলজির প্রমাণ

যদিও অনেকদিন আগে 1906 খৃষ্টাব্দে Bateson ও Punnett লিঙ্কেজের বর্ণনা দেন তবুও ক্রসিং ওভারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেকদিন পাওয়া যায় নাই। ক্রসিং ওভার সাধারণতঃ দেখা সম্ভব হয় না কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটা একই রকম দেখতে হয়। সেজন্য ক্রসিং ওভারের আগে ও পরে ঐ ক্রোমোসোম দুইটার আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু অসম হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে ক্রসিং ওভার হ'লে তা সহজেই দেখা যায়।

1931 খৃষ্টাব্দে Creighton ও McClintock ভুট্টায় এবং Stern ড্রসোফিলায় দেখান যে জেনেটিক ক্রসিং ওভারের ফলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটা পরস্পর অংশ বিনিময় করে। তারা এমন ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণী ব্যবহার করেছিলেন যেখানে এক জোড়া ক্রোমোসোমের দুইটা সদস্যকে আলাদাভাবে চেনা যায় এবং ঐ কোষের অন্যান্য ক্রোমোসোম থেকেও এই অসম হোমোলোগাস ক্রোমোসোমদ্বয়কে সহজেই পৃথক করা যায়। ট্রান্সলোকেশনের ফলে কোন একটা ক্রোমোসোমের অংশ অন্য আরেকটা ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত হলে এইরকম অসম ক্রোমোসোম জোড়ার সৃষ্টি হয়।

McClintock-এর পরীক্ষা

ভুট্টায় নবম ক্রোমোসোমে রঙ্গীন বা বর্ণহীন অ্যালিউরোনের (*aleurone*) জন্য দায়ী জীন C বা c (*coloured* বা *colourless*) এবং স্টার্চযুক্ত বা মোমযুক্ত সস্যের (*starchy* বা *waxy endosperm*) জন্য দায়ী জীন Wx বা wx থাকে। কোন কোন ধরনের (*strain*) ভুট্টার নবম ক্রোমোসোমে
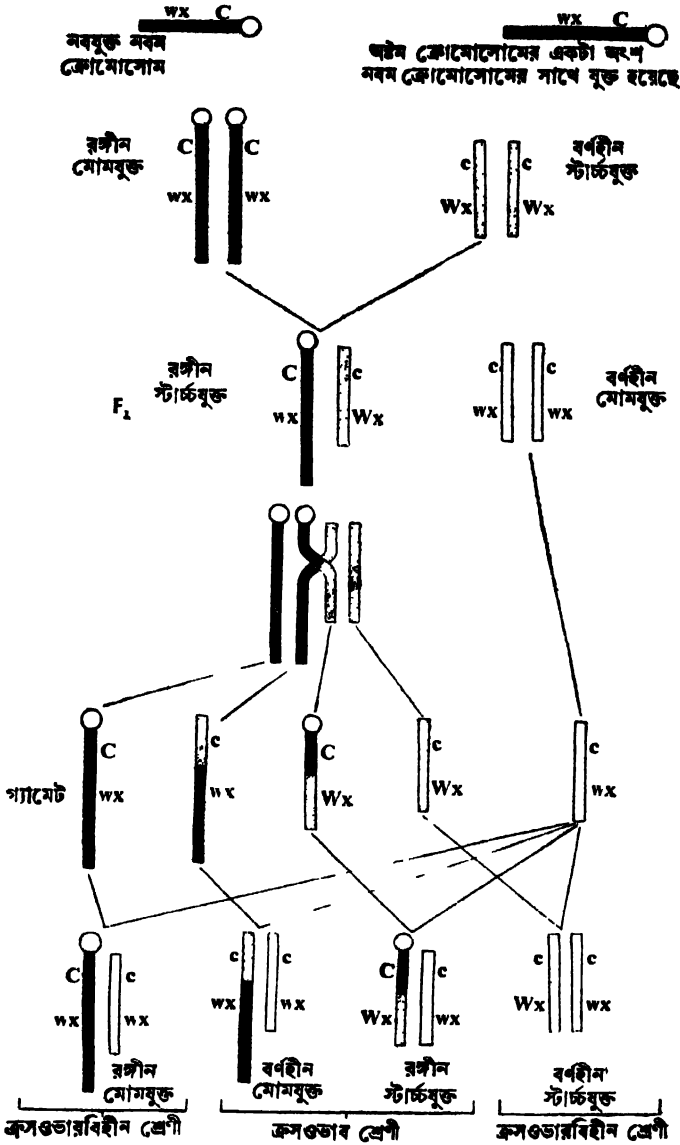
চিত্র 144

দুইটা অসম নবম ক্রোমোসোমযুক্ত ভুট্টার রঙীন বা বর্ণহীন অ্যালিউরোন এবং স্টার্চযুক্ত বা মোমযুক্ত সস্যের জন্য দায়ী জীনের মধ্যে রিকম্বিনেশনের চিত্র।

জীন C-র দিকের প্রান্তে জেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয় হেটারোক্রোমাটিন দিয়ে তৈরী একটা বড় নব (*knob*) অর্থাৎ স্ফীত অঞ্চল থাকে। Creighton এমন একটা ভুট্টা পেয়েছিলেন যেখানে অষ্টম ক্রোমোসোমের একটা অংশ নবম ক্রোমোসোমের নব (*knob*) থেকে দূরবর্তী প্রান্তে যুক্ত হয়েছে। এই নবযুক্ত দীর্ঘ ক্রোমোসোমে C ও wx জীন থাকে। এই দীর্ঘ নবযুক্ত নবম ক্রোমোসোম উপস্থিত আছে এমন ভুট্টার সাথে একটা সাধারণ নবহীন ভুট্টার সংকরণ করা হয়। (চিত্র 144)। এই সাধারণ নবম ক্রোমোসোমে c (বর্ণহীন) ও Wx (স্টার্চযুক্ত) জীন থাকে। সংকর উদ্ভিদটায় নবম ক্রোমোসোমের জোড়াটা অসম হয় অর্থাৎ একটা দীর্ঘ নবযুক্ত ও একটা ক্ষুদ্র নবহীন ক্রোমোসোম থাকে। যখন এই F_1 উদ্ভিদটাকে সাধারণ নবহীন ভুট্টার সাথে সংকরণ করা হয় তখন চার রকমের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। বর্ণহীন ও মোমযুক্ত (*colourless-waxy*) এবং রঙ্গীন ও স্টার্চযুক্ত (*coloured-starchy*) উদ্ভিদ দুইটা ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র 144)। এই দুইটা উদ্ভিদে দুইটা নূতন ধরনের ক্রোমোসোম দেখা যায়, যথা—
অতএব এই পরীক্ষার থেকে জেনেটিক রিকমবিনেশনের (*recombina-*
নবযুক্ত ক্ষুদ্র এবং নবহীন দীর্ঘ।
tion) সাথে সাইটোলজিয় ক্রসিং ওভারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বোঝা যায়।

ড্রসোফিলায় Stern-এর পরীক্ষা

ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমে কারনেশন (*carnation*) বা লাল রঙের চোখের জন্য দায়ী জীন *cr* বা *Cr* এবং "বার" (*Bar* বা সরু) বা স্বাভাবিক আকৃতির চোখের জন্য দায়ী জীন B বা b থাকে। Stern এমন একটা *Drosophila* পান যেখানে Y-ক্রোমোসোমের একটা বড় অংশ ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে X ক্রোমোসোমের *cr* প্রান্তে যুক্ত হওয়ার ফলে সোজা X-ক্রোমোসোমের পরিবর্তে L আকৃতির X ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্রোমোসোমে লাল ও স্বাভাবিক চোখের জীন Cr ও b থাকে। অন্য আরেকটা ড্রসোফিলায় একটা X ক্রোমোসোম দুইটা অংশে ভেঙ্গে গিয়ে সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ছোট অংশটা চতুর্থ ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত হয়েছে। সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত X ক্রোমোসোমে cr ও B থাকে এবং এর B প্রান্তটা ভগ্ন। লাল রঙের Cr জীন কারনেশন (গোলাপী-লাল) রঙের cr জীনের উপর ডমিন্যান্ট (প্রবল)। বার আকৃতির চোখের জন্য দায়ী B জীন স্বাভাবিক আকৃতির চোখের জীন b-র উপর ডমিন্যান্ট। উপরের বর্ণিত দুই রকম (L আকৃতির এবং ভগ্ন X ক্রোমোসোমযুক্ত) ড্রসোফিলার মধ্যে সংকরণ করে একটা হেটারোজাইগাস (*heterozygous*) স্ত্রী পতঙ্গ পাওয়া যায় যেখানে
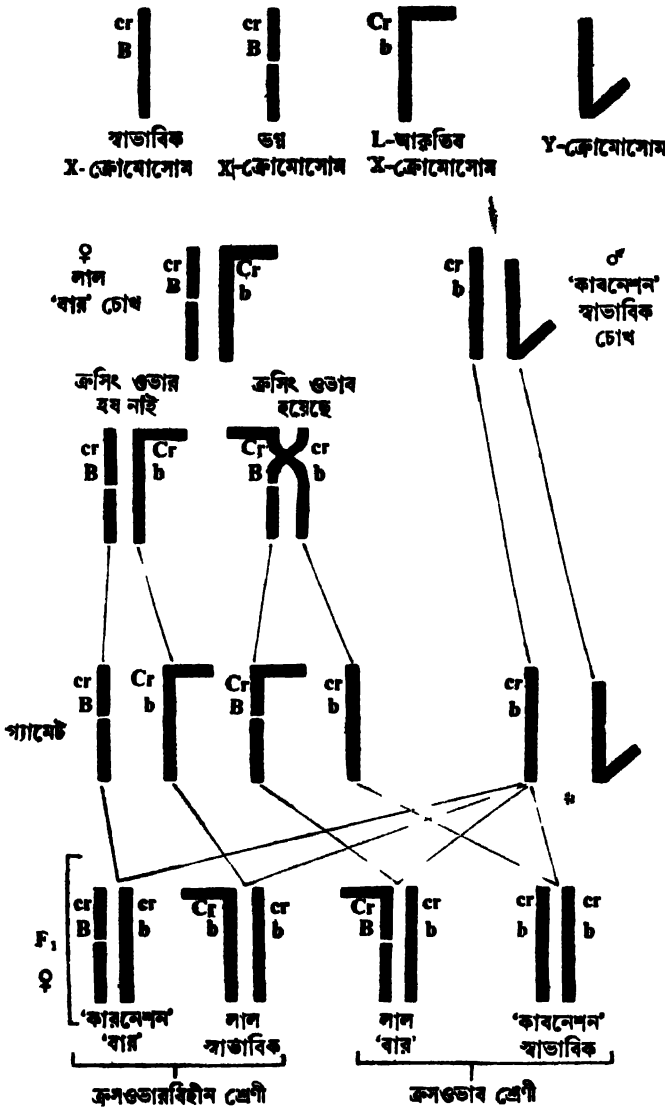
চিত্র 145

দুইটা অসম X-ক্রোমোসোমযুক্ত স্ত্রী ড্রসোফিলার 'বার' ও কারনেশন রঙের চোখের জন্য দায়ী জীনের মধ্যে বিকমবিনেশনের চিত্র।

দুইটা বিশেষ ধরনের X-ক্রোমোসোম (অর্থাৎ একটা L-আকৃতির ও আরেকটা স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট X ক্রোমোসোম) থাকে। এই X ক্রোমোসোম দুইটাকে কোষের অন্য ক্রোমোসোম থেকে সহজেই আলাদাভাবে চেনা যায়। এইরকম একটা স্ত্রী ড্রসোফিলার সাথে একটা রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন) অর্থাৎ কারনেশন *(carnation)* ও স্বাভাবিক চোখযুক্ত পুরুষের মিলন হ'লে চার রকমের পুরুষ ও স্ত্রী পতঙ্গ পাওয়া যায়। কেবল স্ত্রী পতঙ্গগুলিকে পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেক স্ত্রী পতঙ্গে পিতার একটা স্বাভাবিক X-ক্রোমোসোম থাকে। মাতার X-ক্রোমোসোমটা অস্বাভাবিক হওয়ায় সহজেই চেনা যায় এবং কোন ক্রসিং ওভার হ'লে তা এই ক্রোমোসোমের আকৃতির পরিবর্তন থেকে বোঝা যায়। দুইটা নূতন ধরনের অর্থাৎ লাল রঙের 'বার' চোখযুক্ত *(Bar-eyed)* এবং কারনেশন রঙের স্বাভাবিক চোখযুক্ত স্ত্রী পতঙ্গগুলিতে দুইটা নূতন রকমের ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। প্রথম ধরনের পতঙ্গে Y ক্রোমোসোমের অংশটা ভগ্ন X-ক্রোমোসোমের উপরেরদিকে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় ধরনের স্ত্রী পতঙ্গে আপেক্ষিকভাবে স্বাভাবিক আকৃতির ক্রোমোসোম থাকে (চিত্র 145)। এই দুইটা ক্রোমোসোমই কেবল ক্রসিং ওভারের ফলেই সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং এই পরীক্ষা থেকে ক্রসিং ওভারের সাইটোলজিয় প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্রসওভারের হার

মায়োসিসে একটা রেণু মাতৃকোষে একটা ক্রসওভারের ফলে দুইটা ক্রসওভার রেণু এবং দুইটা ক্রসওভারবিহীন রেণু উৎপন্ন হয়। যদি 100টা বেণু মাতৃকোষে প্রতিটিতে একটা ক্রসওভার হয় তবে 400টা রেণুর মধ্যে 200টা ক্রসওভার রেণু থাকে অর্থাৎ ক্রসওভার রেণুর হার শতকরা 50 শতাংশ।

ক্রসওভারের হার জানবার জন্য F_1 সংকর উদ্ভিদের সাথে একটা রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন) উদ্ভিদের ক্রস *(cross)* করা হয়। এর ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদগুলির মধ্যে রিকম্বিনেশন *(recombination)* উদ্ভিদের হার থেকে ক্রসিং ওভারের হার পাওয়া যায়।

যখন টেস্ট ক্রস *(test cross)* করা সম্ভব হয় না তখন দ্বিতীয় বংশ বা F_2-র উদ্ভিদগুলি থেকে ক্রসিং ওভারের হার পাওয়া যায়। F_2 থেকে ক্রসিং ওভারের হার নির্ণয় করবার সবচেয়ে সুবিধাজনক পদ্ধতি হ'ল *Immer* পদ্ধতি। ধরা যাক জীন X ও Y একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত এবং p হ'ল ক্রসিং ওভারের হার। *XXyy* ও *xxYY* উদ্ভিদের মধ্যে সংকরণের ফলে সৃষ্ট দ্বিতীয় অপত্য বংশে চার রকমের উদ্ভিদ দেখা যায়।

XY, Xy, xY এবং xy শ্রেণীর উদ্ভিদগুলিকে যথাক্রমে a, b, c, d বলা হয় এবং যদি দুই জোড়া জীনেই (অর্থাৎ X, x এবং Y, y) 3:1 অনুপাতে পৃথকীকরণ হয় তাহলে

$$\frac{ad}{bc}=\frac{2p^2+p^4}{1-2p^2+p^4}$$

(*repulsion* অবস্থায় p ও *coupling* অবস্থায় $1-p$ হ'ল ক্রসওভারের হার। XXYY ও xxyy-র মধ্যে ক্রস করলে তাকে *coupling* এবং XXyy ও xxYY-র মধ্যে ক্রস করলে তাকে *repulsion* অবস্থা বলে।)

ক্রসওভারের হার p নীচের সূত্র থেকে পাওয়া যায়।

$$p=\sqrt{\frac{-(bc+ad)+\sqrt{(bc+ad)^2+ad\,(bc-ad)}}{(bc-ad)}}$$

যদি XxYy উদ্ভিদের সাথে Xxyy উদ্ভিদের সংকরণ করা হয় তাহলে এক জোড়া জীন 3:1 অনুপাতে ও অন্য জোড়া জীন 1:1 অনুপাতে পৃথক হবে এবং এখানে সূত্রটা হ'ল

$$\frac{ad}{bc}=\frac{p+p^2}{2-3p+p^2}$$

এবং $$p=\frac{-(bc+3ad)+\sqrt{(bc+3ad)^2+8ad\,(bc-ad)}}{2\,(bc-ad)}$$

ক্রসিং ওভার (*crossing over*) যেসব কারণ দিয়ে প্রভাবিত হয়

বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রসিং ওভারকে প্রভাবিত করে।

(1) বয়সের প্রভাব

ড্রসোফিলায় বিভিন্ন গবেষণা করে Bridges (1915, 1927), Plough (1917, 1921), Stern (1926) দেখেছিলেন যে সেন্ট্রোমিয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চলের উপর বিশেষভাবে বয়সের প্রভাব পড়ে। সাধারণভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আগের মত সহজভাবে ক্রসিং ওভার হতে পারে না। Bridges (1915) দেখেন যে স্ত্রী *Drosophila*-র বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রসিং ওভারের হারের বেশ পরিবর্তন হয়। তিনি দেখেন যে ড্রসোফিলার তৃতীয়

ক্রোমোসোমে এগার দিনের সময় প্রথমবার ও পঁচিশ দিনের সময় দ্বিতীয়-বার ক্রসিং ওভারের হার কমে যায় (চিত্র 146)।

(২) সেক্সের প্রভাব

ড্রসোফিলার পুরুষে সচরাচর ক্রসিং ওভার দেখা যায় না। কিন্তু স্ত্রী ড্রসোফিলায় উচ্চহারে ক্রসিং ওভার হয়ে থাকে। একইভাবে স্ত্রী *Bombax mori*-তে ক্রসিং ওভার হয় না। যেসব জীবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়

চিত্র 146
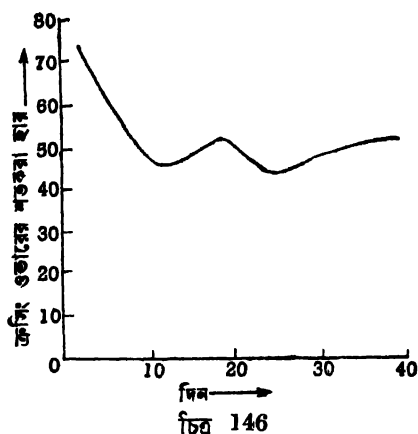
স্ত্রী ড্রসোফিলায় তৃতীয় ক্রোমোসোমের ক্রসিং ওভারের হারের উপর বয়সের প্রভাব।

ক্ষেত্রেই ক্রসিং ওভার হয় সেখানে স্ত্রী ও পুরুষে ক্রসিং ওভারের হার একই রকম বা বিভিন্ন রকমের হয়। ইঁদুরে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীতে বেশী ক্রসিং ওভার হয়। পায়রায় পুরুষে স্ত্রীর চেয়ে বেশী ক্রসিং ওভার দেখা গিয়েছে। Haldane-এর (1922) মতে যেখানে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্কেজের তারতম্য থাকে সেখানে অসমগ্যামীয় (*hetero-gametic*) সেক্সে (যেমন XYবা ZW) ক্রসিং ওভারের হার কম হয় কিম্বা ক্রসিং ওভার হয় না।

(৩) তাপমাত্রার প্রভাব

Plough (1917, 1921) ও Stern-এর (1926) মতে ক্রসিং ওভারের হারের উপর তাপমাত্রার যথেষ্ট প্রভাব আছে। সেন্ট্রোমিয়ারের নিকটবর্তী অংশে তাপমাত্রার প্রভাব সবচেয়ে বেশী হয়। Plough-এর পরীক্ষা থেকে

দেখা যায় যে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশী তাপমাত্রায় ড্রসোফিলায় ক্রসিং ওভারের হার বাড়ে। তবে অন্যান্য জীবে সাধারণতঃ বেশী তাপমাত্রায় ক্রসিং ওভারের হার বাড়ে এবং কম তাপমাত্রায় এই হার কমে।

(4) সেন্ট্রোমিয়ারের প্রভাব

সেন্ট্রোমিয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চলে ক্রসিং ওভারের যথেষ্ট তারতম্য হয়। এর কারণ এই অঞ্চলই তাপমাত্রা, বয়স ইত্যাদি দিয়ে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়। Beadle ('32) ও Graubird ('32, '34) ট্র্যান্সলোকেশন ও ইনভারশন ব্যবহার করে বিভিন্ন পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁদের মতে জীনের অবস্থানই ক্রসিং ওভারের হার নির্ণয় করে। সেন্ট্রোমিয়ারের কাছে কোন জীনের অবস্থানের ফলে সাধারণতঃ ক্রসিং ওভারের হার কমে যায় এবং এর ফলে জেনেটিক মানচিত্রের গঠনও প্রভাবিত হয়।

(5) হেটারোক্রোমাটিনের প্রভাব

Mather-এর (1939) মতে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলের হেটারোক্রোমাটিন ক্রসিং ওভাবকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। White-এর ক্রসিং ওভারের মত-বাদ অনুসারে যেখানে ইউক্রোমাটিন (*euchromatin*) ও হেটারোক্রোমাটিন পাশাপাশি থাকে সেখানে সবচেয়ে বেশী হারে ক্রসিং ওভার হয়।

(6) ক্রোমোসোমগুলির পারস্পরিক প্রভাব

Sturtevant (1919) মনে করেন যে যদি এক জোড়া ক্রোমোসোমে হেটারোজাইগাস ইনভারশনের উপস্থিতির ফলে ক্রসিং ওভাবের হার কমে যায় তবে ঐ কোষেরই অন্য কোন ক্রোমোসোম জোড়ায় ক্রসিং ওভারের হার বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন যে, প্রতিটি মায়োটিক কোষে ক্রসিং ওভারের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি মজুত থাকে। কোন জোড়া ক্রোমোসোম যদি কম শক্তি খরচ করে তবে অন্য কোন জোড়া ক্রোমোসোম অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করে ক্রসিং ওভারের হার বাড়াতে পারে। ড্রসোফিলা নিয়ে পরীক্ষা করে Schultz ও Redfield (1932, 1933), Glass (1933) ও Macknight (1937) এই মত সমর্থন করেন।

(7) ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিকতার (*aberration*) প্রভাব

কোন ক্রোমোসোমে জীনের বিন্যাসের রদ বদল হ'লে এবং এই পরিবর্তিত ক্রোমোসোম হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকলে ক্রসিং ওভারের হারেরও পরিবর্তন হয়।

ক্রসিং ওভারের উপর ইনভারশনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। এই গবেষণা থেকে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। (*a*) স্ত্রী ড্রসোফিলায় হোমোজাইগাস ইনভারশন (*inversion*) হ'লে ক্রসিং ওভারের হার হ্রাস পায় না। (*b*) ইনভারশনযুক্ত (*inverted*) অর্থাৎ উল্টান অংশে কেবল একটা ক্রস ওভার হ'লে কদাচিৎ পূর্বাবস্থা ফিরে আসে। (*c*) ইনভারশনের ডান ও বাঁদিকে ইনভারশনবিহীন অংশে ক্রসিং ওভারের হার যথেষ্ট হ্রাস পায়। (*d*) ইনভারশনের দৈর্ঘ্য যত কমে ইনভাশনযুক্ত অংশে ক্রসিং ওভারের হার ততই হ্রাস পায়। ভুট্টায় ইনভারশন অঞ্চলের মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার যথেষ্ট হ্রাস পায়।

ড্রসোফিলা ও ভুট্টায় পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে ক্রসিং ওভারের হার যথেষ্ট কমে যায়। Dobzhansky দেখেন যে ভগ্ন অংশের কাছের অঞ্চলে ক্রসিং ওভারের হার সবচেয়ে কম হয়। একটা V-আকৃতিব ক্রোমোসোমের একটা বাহুর ট্র্যান্সলোকেশন অন্য বাহুর ক্রসিং ওভারের হারকে বিশেষ প্রভাবিত করে না। কিন্তু সেন্ট্রোমিয়ার অংশে ক্রোমোসোমটা ভেঙ্গে গেলে ক্রসিং ওভারের হার উভয় বাহুতেই হ্রাস পায়।

বিভিন্ন রকমের দ্বিগুণতা (*duplication*) প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব উপায়ে ক্রসিং ওভারকে প্রভাবিত করে। ড্রসোফিলায় পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে দ্বিগুণ অংশের (*duplicated*) দৈর্ঘ্য যত বাড়ে ক্রসিং ওভারের হার ততই কমে।

Stadler ও Roman (1948) দেখেন যে খুব ছোট অংশের ঘাটতির (*deficiency*) ফলে ক্রসিং ওভারের হার কমে যায়। কোন অংশের ঘাটতির ফলে ঐ অংশে ক্রসিং ওভার একেবারেই হয় না ও এর কাছের অঞ্চলেও ক্রসিং ওভারের হার কমে যায়।

বিভিন্ন রকমের ক্রোমোসোমীয় অস্বাভাবিকতার ফলে ক্রসিং ওভার কমে যাওয়ার কারণ হ'ল যে এইসব অস্বাভাবিকতার ফলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে ভালভাবে যুগ্মতা (*synapsis*) হয় না। যেহেতু ক্রসিং ওভার যুগ্মতার উপর নির্ভরশীল সেজন্য সাইন্যাপসিসের কোন পরিবর্তন ক্রসিং ওভারকেও প্রভাবিত করে।

ক্রসিং ওভারের বিভিন্ন মতবাদ

যদিও ক্রসিং ওভার অনেকদিন আগেই দেখা গিয়েছে কিন্তু এর সঠিক প্রক্রিয়া এখনও জানা যায় নাই। ক্রসিং ওভারের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। ক্রসিং ওভারের মূল ঘটনাগুলি এখানে

আবার পর্যালোচনা করা হ'ল কারণ এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতে হ'লে এই-সব তথ্যের বিবেচনা করা দরকার।

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে মায়োসিসে বাইভ্যালেন্ট অবস্থায় চারটা ক্রোমাটিডের মধ্যে দুইটা ক্রোমাটিড কোন জায়গায় সমান অংশ বিনিময় ক'রে অর্থাৎ ক্রসিং ওভার হয়। সুতরাং ক্রসিং ওভার ক্রোমাটিড গঠিত হওয়ার (ক্রোমোসোমের লম্বালম্বি বিভাগ) পরে হয়। DNA দ্বিগুণ হওয়ার সাথে ক্রোমাটিডের দ্বিগুণ হওয়া জড়িত। সুতরাং ক্রসিং ওভার DNA দ্বিগুণ হওয়ার পরে হয়।

একটা বাইভ্যালেন্টে একাধিক ক্রসিং ওভার হ'লে এই ক্রসওভারগুলি দুইটা, তিনটা কিম্বা চারটা সূত্রে যদৃচ্ছভাবে (*random*) হ'তে পারে।

সাধারণতঃ একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে দুইটা ক্রসিং ওভার হয় না।

ক্রসিং ওভার বিভিন্ন কারণ (যেমন বয়স, ক্রোমোসোমে অবস্থান, জেনেটিক গঠন, তাপমাত্রা ইত্যাদি) দিয়ে প্রভাবিত হয়।

ক্রসিং ওভারের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করবার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পেশ করেছেন। এখানে কতকগুলি মতবাদেব বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

(1) Sax-এর (1932) ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ (*classical theory*)

Sax-এর মতে কায়েসমা ভেঙ্গে যাওয়ার পর ক্রসিং ওভার হয়। ডিপ্লোটিন সুরু হ'লে প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টে পর্যায়ক্রমে একটা লুপে (*loop*) ভগ্নী ক্রোমাটিডগুলি (*sister chromatid*) ও পাশের লুপে অভগ্নী (*non-sister*) ক্রোমাটিডগুলি একসাথে থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত লুপে সব সময় ভগ্নী ক্রোমাটিডগুলি একসাথে থাকে (চিত্র 147)। যখন ক্রোমোসোম-গুলি সঙ্কুচিত হয় তখন কায়েসমা অংশে চাপ পড়ার ফলে ঐ অংশে ক্রোমাটিড দুইটা ভেঙ্গে যায়। ভগ্ন অংশ আবার জোড়া লাগার ফলে কায়েসমা লুপ্ত হয় এবং ক্রসিং ওভার হয়।

(2) Matsuura-র (1940) নিও-ক্ল্যাসিক্যাল (*neo-classical*) **মতবাদ**

Matsuura-র (1940, 1950) মতে ক্রসিং ওভার প্রথম মায়োটিক বিভাগের অ্যানাফেজ অবস্থায় হয়। তাঁর মতে যুগ্ম ক্রোমাটিডের মধ্যে লুপগুলি (*loop*) হঠাৎ খুলে যাওয়ার ফলে কায়েসমার সৃষ্টি হয়। মায়োসিসের মেটাফেজের প্রথম দিকে প্রত্যেক ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিড দুইটা পরস্পর পেঁচান (*relational coil*) থাকে। মেটাফেজের শেষ দিকে এই পেঁচ খুলে যাওয়ার ফলে ক্রোমাটিড দুইটা সমান্তরালভাবে থাকে। এই সময় ক্রোমেসোমগুলির নিজস্ব ম্যাট্রিক্স থাকে। যুগ্ম সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে এবং ক্রোমাটিডের প্রান্তে বিকর্ষণের জন্য ম্যাট্রিক্স খণ্ডিত হয়। ম্যাট্রিক্স
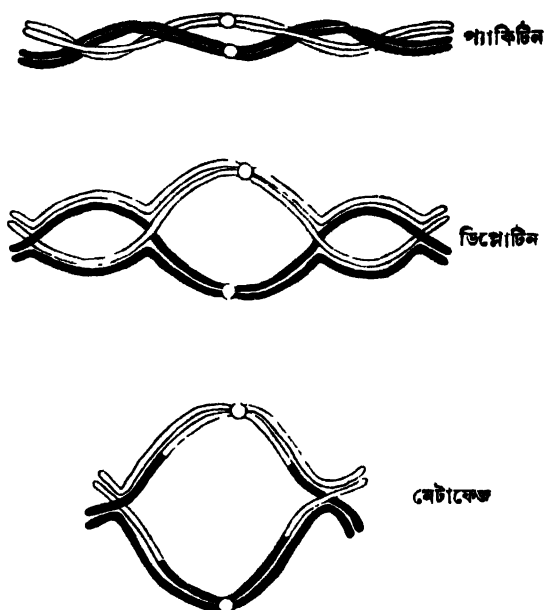
চিত্র 147

ক্রসিং ওভারের ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের চিত্র।
উপরে—প্যাকিটিনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটা রিলেশন্যাল কয়েল গঠন করেছে;
মাঝে—সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত লুপে ভগ্নী ক্রোমাটিডগুলি এবং পাশের লুপগুলিতে অভগ্নী ক্রোমাটিডগুলি যুগ্ম অবস্থান করছে;
নীচে—ক্রসিং ওভার হওয়ার পর মেটাফেজের গঠন।

খণ্ডিত হওয়ার ফলে ক্রোমাটিড দুইটার কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন দেখা যায় এবং ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময় (ক্রসিং ওভার) হয় ও দুইটা নূতন ক্রোমাটিডের সৃষ্টি হয়। নিও-ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ (*neo-classical theory*) বিশেষ সমর্থন লাভ করে নাই।

(3) White-এর (1942) **মতবাদ**

White-এর মতে হেটারোক্রোমাটিন (*heterochromatin*) ও ইউ-ক্রোমাটিন (*euchromatin*) অঞ্চলে প্রোটীন একই সাথে বিভক্ত না হওয়ার ফলে ক্রসিং ওভার হয়। যতক্ষণ হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি অবিভক্ত থাকে ততক্ষণ তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যখন ক্রোমোসোমগুলি

বিভক্ত হয় তখন তাদের মধ্যে বিকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু ক্রোমোসোমের সব জায়গা একই সাথে বিভক্ত হয় না সেজন্য যেসব স্থানে বিভক্ত ও অবিভক্ত অংশ পাশাপাশি থাকে সেখানে চাপের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে যে হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল দেরীতে বিভক্ত হয়। বিভক্ত ইউক্রোমাটিন অঞ্চলে যথেষ্ট বিকর্ষণ দেখা যায়। একই সময় হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল অবিভক্ত থাকায় তখনও ঐ অঞ্চলে আকর্ষণ থাকে (চিত্র 148)। এর ফলে ভগ্নতা ও সংযোগ হয়। ফড়িঙে (*grasshopper*) ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলের সংযোগস্থলে কায়েসমা দেখা যায়। টেলোমিয়ার বা প্রান্তের হেটারোক্রোমাটিনের দেরীতে বিভাগের ফলে কখনও কখনও দেহ কোষে ক্রোমাটিড ব্রীজ (*chromatid bridge*) দেখা যায়। রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করলে অনেক সময় কায়েসমার মত গঠনের ডিপ্লোক্রোমাটিড (*diplochromatid*) দেখা যায়।
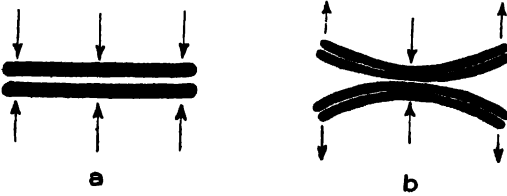
চিত্র 148

ক্রসিং ওভারের উপর হেটারোক্রোমাটিনের প্রভাব।
a — অবিভক্ত হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে আকর্ষণ দেখা যায়,
b — অবিভক্ত হেটারোক্রোমাটিন অংশে (মাঝে) আকর্ষণ থাকে কিন্তু ইউক্রোমাটিন অংশ বিভক্ত হওয়ার জন্য ঐ অঞ্চলে বিকর্ষণ দেখা যায়।

সেন্ট্রোমিয়ারের দুই দিকে অবস্থিত হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চল দেরীতে বিভক্ত হওয়ার ফলে ডিপ্লোক্রোমাটিড অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(4) Belling-এর (1943) মতবাদ

Belling মনে করেন যে ভগ্নতা ছাড়াই ক্রসিং ওভার হতে পারে। প্যাকিটিন অবস্থায় যুগ্ম ক্রোমোসোমের ক্রোমোমিয়ারগুলি দ্বিগুণ হয়। পুরাণো সূত্রের সমান্তরালভাবে নূতন সূত্র গঠিত হয়। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি পরস্পর ভালভাবে পেঁচান থাকে এবং এর ফলে নূতন ক্রোমাটিডে বাইভ্যালেন্টের দুইটা সদস্যের ক্রোমোমিয়ারগুলি থাকতে পারে কারণ কোন পেঁচের দুইদিকে বিভিন্ন সদস্যের ক্রোমোমিয়ারগুলি থাকে এবং কাছের ক্রোমোমিয়ারগুলি পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। এই মতবাদ

অনুসারে ক্রোমোসোমের বিভাগের সাথে সাথেই ক্রসিং ওভার হয় (চিত্র 149)। Belling-এর মতবাদ অনুসারে ক্রোমোসোমের বিভাগের সাথে ক্রসিং ওভার জড়িত।
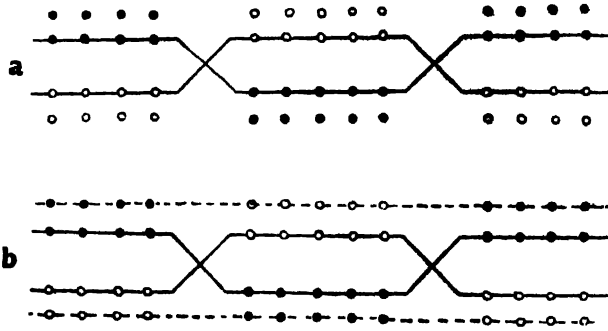
চিত্র 149

Belling-এর মত অনুসারে ক্রসিং ওভারের প্রক্রিয়ার চিত্র।
a — ক্রোমোমিয়ারগুলি দ্বিগুণ হয়েছে কিন্তু ক্রোমোমিয়ারগুলির মধ্যের সংযোগ সূত্র গঠিত হয় নাই,
b — ক্রোমোমিয়ার মধ্যবর্তী যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

Belling-এর মতবাদ অনুসারে নবগঠিত ক্রোমাটিড দুইটায় ক্রসিং ওভার হয় ও পুরাণো ক্রোমাটিড দুইটা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু যেখানে কয়েকটা কায়েসমা হয় সেখানে তিনটা বা চারটা ক্রোমাটিডেই ক্রসিং ওভার লক্ষ্য করা হয়েছে। এই তথ্য Belling-এর মতকে সমর্থন করে না। তাছাড়া এই মতবাদ অনুযায়ী মায়োসিস আরম্ভ হবার পর ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হয় কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে ইন্টারফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণ হয়।

(5) Darlington-এর (1950) **মতবাদ**

Darlington Jansen-এর (1909, 1924) কায়েসমাটাইপ মতবাদের সম্প্রসারণ করেন। এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক বাইভ্যালেন্টে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটার নিজস্ব পেঁচ (*coil*) ও পরস্পরের রিলেশন্যাল কয়েলের (*relational coil*) মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। নির্দিষ্ট দিকে এই পেঁচের ফলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম দুইটা পরস্পর থেকে সরে যেতে পারে না। মায়োসিসের প্রফেজে কতকগুলি দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ক্রসিং ওভার হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনগুলি হ'ল—

(a) ক্রোমোসোমগুলি বিভক্ত হয়ে ক্রোমাটিড গঠনের ফলে ভারসাম্যটা ব্যাহত হয়।

(b) প্রত্যেক ক্রোমোসোমের অপত্য ক্রোমাটিড দুইটার মধ্যে রিলেশন্যাল কয়েল (*relational coil*) গঠিত হয়। বাইভ্যালেন্টের হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলিতে যে দিকে রিলেশন্যাল কয়েল থাকে নবগঠিত ক্রোমাটিডগুলিতে তার বিপরীতদিকে পেঁচ দেখা দেয়।

(c) ক্রোমোসোমগুলি বিভক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাদের মধ্যে আর আকর্ষণ থাকে না।

(d) আকর্ষণের অভাবের ফলে চারটা ক্রোমাটিডের মধ্যে চাপের সৃষ্টি হয়।

(e) এর ফলে একটা ক্রোমাটিড ভেঙ্গে যায় ও ভারসাম্য ব্যাহত হয়। আকস্মিকভাবে এই ভগ্নতা দেখা দেয়।

(f) অভগ্ন ভগ্নী ক্রোমাটিডের চারিদিকে ক্রোমাটিডের ভগ্ন প্রান্ত দুইটা পেঁচিয়ে যায়। এর ফলে বিপরীত ক্রোমোসোমে হঠাৎ চাপেব সৃষ্টি হয়।

(g) একই জায়গায় একটা অভগ্নী ক্রোমাটিড (*non-sister chromatid*) ভেঙ্গে যায়।

(h) ভগ্ন প্রান্তগুলি এমনভাবে জোড়া লাগে যার ফলে দুইটা নূতন ক্রোমাটিডের সৃষ্টি হয়।

এইভাবে ক্রসিং ওভার হয় ও তার বহির্প্রকাশ হিসাবে কায়েসমা (*chiasma*) দেখা দেয়।

DNA-র গঠন আবিষ্কৃত হওয়ার পর ক্রসিং ওভারেব পদ্ধতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীগণ নূতন নূতন ব্যাখ্যা পেশ করলেন। Meselson ও Weigle ভাইরাসের ক্রোমোসোমের উপর পরীক্ষা ক'রে বললেন যে, DNA সূত্রের ভগ্নতা ও সংযোগের ফলে জীনের রিকম্বিনেশন (*recombination*) হয়। এখানে Uhl ও Whitehouse-এর ব্যাখ্যার বিবরণ দেওয়া হ'ল।

(6) Uhl-এর (1965) মতবাদ

Uhl-এর মতে কোষ বিভাগের আগে ইন্টারফেজের S অবস্থায় (DNA উৎপাদনের সময়) ক্রোমোসোমে DNA ডাবল হেলিক্সের (*double helix*) অংশগুলি কতকগুলি সংযোগকারী আঙটা (*link*) দিয়ে যুক্ত থাকে। এই অংশগুলি সম্ভবতঃ DNA-র জেনেটিক কোড বা সংকেতের বিভিন্ন অংশগুলিকে আলাদা করে রাখে ও যতি চিহ্ন (*stop*) হিসাবে কাজ করে। একটা DNA অণুর দুইটা সূত্রের কোন একটা জায়গায় একটা আঙটা

বা *link* দিয়ে যুক্ত থাকে অর্থাৎ দুইটা সূত্রের আলাদা *link* থাকে না। সেজন্য DNA অণুর সূত্র দুইটা যখন আলাদা হয় তখন *link*টা যে কোন একটা সূত্রের সাথে কেবল যুক্ত থাকে। এর ফলে DNA সূত্রটা কতকগুলি বহুনিউক্লীওটাইডযুক্ত অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এজন্য ক্রোমোসোমটা ভেঙ্গে যায় না কারণ আঙটা অর্থাৎ *link*গুলি কেন কোনটা একটা সূত্রের সাথে এবং বাকীগুলি অপর সূত্রের সাথে যুক্ত থাকে, এছাড়া হিস্টোন এবং অবশিষ্ট প্রোটীন ক্রোমোসোমের অখণ্ডতা রক্ষা করে। এই অবস্থায় সাইন্যাপসিস বা যুগ্মতা হয়। এর পর আবার আঙটাগুলি গঠিত হওয়ায় ক্রোমোসোমের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ধরে DNA অণু অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। এই আঙটাগুলি গঠিত হওয়ার সময় ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময় হয়।

Uhl-এর ক্রসিং ওভারের কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যার সাথে Belling-এর মতের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

(7) Whitehouse-এর (1965) মতবাদ

Whitehouse-এর মতে ক্রসিং ওভারের আগে ক্রোমাটিডগুলি দ্বিগুণ হয়। মায়োসিসে যখন হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থান ক'রে (*synapsis*) তখন ক্রোমোসোমের একাধিক জায়গায় সাধারণতঃ অভগ্নী (*non-sister*) ক্রোমাটিডগুলির মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়। ক্রসিং ওভারের সময় কোন ক্রোমাটিডের ডাবল হেলিক্সের দুইটা পলিনিউক্লীওটাইড সূত্রের মধ্যে একটা সূত্র ভেঙ্গে যায় এবং হোমোলোগাস ক্রোমাটিডের ঠিক ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় একইভাবে ভগ্ন আরেকটা পলিনিউক্লীওটাইড সূত্রের পরিপূরক অংশেব সাথে যুক্ত হয়। এই সংযুক্তির সময় সামান্য পরিমাণ DNA উৎপন্ন হয় কিন্তু এজন্য মোট DNA-ব পরিমাণেব তেমন কোন রদবদল হয় না। পলিনিউক্লীওটাইড সূত্রের ভগ্নতা ও সংযোগের সময় সামান্য পরিমাণ DNA উৎপন্ন হতে দেখা গিয়েছে। DNA উৎপাদনে ব্যাঘাত হ'লে কায়েসমাও গঠিত হতে পারে না। Hotta, Ito এবং Stern-এর (1966) পরীক্ষা এই মতকে সমর্থন করে। সুতরাং Whitehouse-এর মতে DNA উৎপাদনের পরে জাইগোটিনে ক্রসিং ওভার হয়। এইসময় কিছু পরিমাণ সংকর DNA উৎপন্ন হয় এবং ঐ একই পরিমাণ পুরাণো DNA নষ্ট হয়ে যায়। দেখা গিয়েছে যে, ছত্রাক *Neurospora* এবং *Aspargillus*-এ ক্রসিং ওভারের পদ্ধতি Whitehouse-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী হয়। তবে এই মতবাদ উচ্চতব জীবে কতটা প্রযোজ্য তা এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য

ক্রসিং ওভারে ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশ বিনিময় হয় ব'লে নূতন ধরণের ক্রোমাটিড গঠিত হতে পারে। সেজন্য বিবর্তনে ক্রসিং ওভারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রসিং ওভারের হার থেকে ক্রোমোসোমে জীনের অবস্থান নির্ণয় করা যায় এবং এর থেকে ক্রোমোসোম মানচিত্র গঠন করা যায়।

ক্রোমোসোমে জীনের সরলরেখায় অবস্থানও *(linear arrangement)* ক্রসিং ওভারের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়

সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লীয়াসের পারস্পরিক প্রভাব

সাইটোপ্লাজমবিহীন নিউক্লীয়াস কিম্বা নিউক্লীয়াসবিহীন সাইটোপ্লাজম স্বাভাবিক কাজ চালাতে পারে না। কোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কাজের জন্য নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজম দুটোরই একান্ত প্রয়োজন।

সাইটোপ্লাজমের অনেক এনজাইম নিউক্লীয়াস থেকে তৈরী হয় এবং নিউক্লীয়াস অন্ততঃ আংশিকভাবে তাদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণতঃ নিউক্লীয়াসবিহীন সাইটোপ্লাজম বেশী দিন বাঁচে না। মানুষের রক্তের এরিথ্রোসাইট (*erythrocyte*) কোষের নিউক্লীয়াসটা লুপ্ত হয়ে যায় এবং এদের জীবনকাল মাত্র কয়েক সপ্তাহ।

নিউক্লীয়াসের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সাইটোপ্লাজম থেকেই আসে। নিউক্লীক অ্যাসিড ও ক্রোমোসোমীয় প্রোটীন তৈরী করবার জন্য যেসব পদার্থের দরকার হয় তা সাইটোপ্লাজমই সরবরাহ করে। সাইটোপ্লাজমে কোন পরিবর্তন হ'লে তার প্রভাব নিউক্লীয়াসের উপর পড়ে।

কোন কোষ বা কোষসমষ্টির নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজমের অনুপাত নির্দিষ্ট হয়। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট পলিপ্লয়েডে নিউক্লীয়াসের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপ্লাজমের পরিমাণও বাড়ে।

Caspersson প্রথম নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজমের পারস্পরিক নির্ভরতার প্রমাণ করেন। সাইটোপ্লাজমের RNA ও ক্রোমোসোমের DNA-র মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। দ্রুত বৃদ্ধিশীল কোষে কখনও কখনও নিউক্লীও মেমব্রেন তাড়াতাড়ি তৈরী হয় ও এর ফলে কোষটা নষ্ট হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, টেলোফেজে নিউক্লীও মেমব্রেন গঠিত হবার আগেই ক্রোমোসোম থেকে সৃষ্ট পদার্থ সাইটোপ্লাজমে যায় ও সাইটোপ্লাজম গঠনে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ার কোন পরিবর্তন হ'লে কোষটা নষ্ট হয়ে যায়।

কোষ বিভাগের সময় নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজমের সহযোগীতার ফলেই স্পিণ্ডিল গঠিত হয়।

রাসায়নিক বস্তু বা রঞ্জনরশ্মির (*x-ray*) প্রয়োগ করে ক্রোমোসোমকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করলে সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন ক্রোমোসোমের অংশগুলি কোষ বিভাগের সময় কোন মেরুতে যেতে পারে না ও এরা

সাইটোপ্লাজমে থাকে। এর ফলে নিউক্লীয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে স্ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজমের অনুপাতের এই পরিবর্তনের জন্য অনেক সময় কোষটা নষ্ট হয়ে যায়। এই পদ্ধতির ব্যবহার ক'রে ক্যানসার টিউমার কোষের বিকিরণ চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজমের পারস্পরিক প্রভাব জীন-এনজাইম সম্পর্ক থেকে ভাল ক'রে বোঝা যায়। জীন সবসময় সাইটোপ্লাজমের এনজাইমের মাধ্যমে কাজ করে। কোন চরিত্রের বহির্প্রকাশ নির্ভর করে বহু রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর, যার প্রারম্ভ জীন স্তরে হয়। সাইটোপ্লাজমীয় বস্তু ও জীন বিভাগের সময় সৃষ্ট উপজাত (*byproduct*) বস্তুর সমন্বয়ে এনজাইম তৈরী হয়। এছাড়া এনজাইমের কাজ যথাযথ সাইটোপ্লাজমীয় পদার্থের উপর নির্ভর করে।

আগেই বলা হয়েছে যে রঞ্জনরশ্মির প্রভাবে ক্রোমোসোম কতকগুলি অংশে বিভক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ফ্র্যাগমেন্টেশন (*fragmentation*) বলে। ফ্র্যাগমেন্টেশনের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। প্রত্যক্ষ আঘাতের মতবাদ (*direct hit theory*) অনুসারে রঞ্জনরশ্মি ক্রোমোসোমে পরিবর্তন ঘটায় এবং এর ফলে ক্রোমোসোম ভেঙ্গে যায়। রঞ্জনরশ্মির মাত্রা ও ক্রোমোসোমের ভগ্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য এই মতবাদের সমর্থন করে। পরোক্ষ বা রাসায়নিক মতবাদ (*chemical theory*) অনুসারে রঞ্জনরশ্মির প্রভাবে সাইটোপ্লাজমে পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনের জন্য ক্রোমোসোমগুলি ভেঙ্গে যায়। রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে ও রঞ্জনরশ্মির প্রভাবে ক্রোমোসোমের একই রকমের ভগ্নতা এই মতবাদের সমর্থক। Duryee দেখান যে স্বাভাবিক নিউক্লীয়াস যদি বিকিরণপ্রাপ্ত সাইটোপ্লাজমে রাখা হয় তবে ক্রোমোসোম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু বিকিরণপ্রাপ্ত নিউক্লীয়াস বিকিরণ দেওয়া হয় নাই এমন সাইটোপ্লাজমে রাখলে ক্রোমোসোম ভেঙ্গে যায় না। এর থেকে নিউক্লীয়াসের উপর সাইটোপ্লাজমের প্রভাব সমর্থিত হয়। সুতরাং রাসায়নিক বা পরোক্ষ মতবাদ নিউক্লীয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের ইঙ্গিত করে।

এককোষী শৈবাল *Acetabularia*-এ (চিত্র 17d) নিউক্লীয়াসের পরিণতির উপর সাইটোপ্লাজমের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। একটা অপরিণত নিউক্লীয়াসকে পরিণত কোষে ঢুকিয়ে দিলে নিউক্লীয়াসটা খুব তাড়াতাড়ি পরিণত হয়।

Sea urchin-এর অপরিণত ডিম্বাশয়ে স্পার্ম বা শুক্রাণু প্রবেশ করালে দেখা যায় যে শুক্রাণুর নিউক্লীয়াসটা ডিম্বাণুর নিউক্লীয়াসটা কোষ বিভাগের যে পর্যায়ে আছে সেই অবস্থায়ই থাকে অর্থাৎ ডিম্বাণুর নিউ-

ক্লীয়াসটা প্রফেজ অবস্থায় থাকলে শুক্রাণুর নিউক্লীয়াসও প্রফেজ অবস্থায় থাকবে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সাইটোপ্লাজমই নিউক্লীয়াসটা কোন অবস্থায় থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লীয়াসের উপর সাইটোপ্লাজমের প্রভাব অ্যামিবায় (*amoeba*) নানা গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়। *Amoeba proteus*-এর নিউক্লীয়াস নিউক্লীয়াসবিহীন *Amoeba discoides*-এর সাইটোপ্লাজমে ঢুকিয়ে দিলে ঐ নিউক্লীয়াসে *Amoeba discoides*-এর কিছু কিছু চরিত্র দেখা যায়। অনেকবার কোষ বিভাগের পর এই নিউক্লীয়াসকে নিউক্লীয়াসবিহীন *Amoeba proteus*-এর সাইটোপ্লাজমে স্থানান্তরিত করলে ঐ নিউক্লীয়াসে *Amoeba discoides*-এর কিছু কিছু চরিত্র দেখা যায় অর্থাৎ এখানে সাইটোপ্লাজমের প্রভাবে নিউক্লীয়াসে কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্তন হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্রোমোসোমের মানচিত্র

প্রত্যেক ক্রোমোসোমে অনেকগুলি জীন থাকে। এই জন্য ক্রোমোসোমে বিভিন্ন জীনের স্থান নির্ধারণ করা দরকার। বিভিন্ন উপায়ে ক্রোমোসোমে জীনের স্থান নির্ধারণ করা হয়। সাধারণতঃ ক্রসিং ওভারের তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে জেনেটিক উপায়ে জীনের স্থান নির্ধারণ করা যায় ও এই পদ্ধতিতে গঠিত ক্রোমোসোমের মানচিত্রকে ক্রসওভার (*crossover*) বা লিঙ্কেজ (*linkage*) বা জেনেটিক মানচিত্র (*genetic map*) বলে। ক্রোমোসোমের মানচিত্র হ'ল একটা সরলরেখা যার উপর জীনের স্থান নিরূপণ করা হয়। 1911 খৃষ্টাব্দে Sturtevant ড্রসোফিলায় ক্রোমোসোমের মানচিত্র প্রথম গঠন করেছিলেন। এর পরে Bridges ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই মানচিত্র তৈরী করেছিলেন। জেনেটিক পদ্ধতি ছাড়া সাইটোলজিয় (*cytological*) উপায়েও ক্রোমোসোমের মানচিত্র গঠন করা যায়। তবে উভয় পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে ক্রোমোসোমের মানচিত্র গঠন করলে সবচেয়ে ভাল হয়।

জেনেটিক পদ্ধতি

কতকগুলি তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে জেনেটিক মানচিত্র গঠন করা হয়। এই তথ্যগুলি হ'ল—

(1) ক্রোমাটিড ভেঙ্গে যাবার ফলেই ক্রসিং ওভার হয়।

(2) ক্রোমোসোমের যে কোন অংশে সমান হারে ক্রসিং ওভার হয়। কোন ক্রোমোসোমে দুইটা জীন যত দূরে থাকবে তাদের মধ্যে ক্রসিং ওভারের সম্ভাবনা তত বেশী হবে।

কোন দুইটা জীনের মধ্যে ক্রসিং ওভারের শতকরা হার থেকে ক্রোমোসোমে ঐ দুইটা জীনের স্থান নির্ধারণ করা হয়। দুইটা জীনের মধ্যে ক্রসিং ওভারের শতকরা হার পাঁচ হ'লে বলা যায় যে ঐ দুইটা জীন নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমে পাঁচ একক (*unit*) ব্যবধানে আছে।

ক্রসিং ওভারের হার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পরিবেশ দিয়ে প্রভাবিত হয়। সেই জন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ক্রোমোসোমে তিনটা জীনের স্থান নির্ধারণ

কোন জীবে যদি জীন A ও B লিঙ্কড (*linked*) বা সংযুক্ত থাকে তবে বলা যায় যে ঐ দুইটা জীন একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত। একই-

ভাবে জীন A ও C লিঙ্কড থাকলে, C জীনটাও ঐ ক্রোমোসোমে থাকবে। সুতরাং জীন B ও C একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত। হেটারোজাইগাস Aa Bb উদ্ভিদের সাথে হোমোজাইগাস aabb-র ক্রস করলে যদি 30 শতাংশ নূতন ধরনের উদ্ভিদ অর্থাৎ *recombination type* পাওয়া যায় তবে A এবং B জীনের মধ্যে ব্যবধান হবে 30 একক। একই ভাবে হেটারো-জাইগাস AaCc উদ্ভিদকে ডাবল রিসেসিভ (*double recessive*) aacc উদ্ভিদের সাথে ক্রস করলে যদি 20% নূতন ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায় তবে বলা যায় যে A ও C-র মধ্যে দূরত্ব 20 একক। ক্রোমোসোমে এই তিনটা জীনের বিন্যাস C-A-B কিম্বা A-C-B হতে পারে। প্রথম ধরনের বিন্যাস হ'লে B-C-র মধ্যে ব্যবধান 50 একক হবে এবং দ্বিতীয় ধরনের বিন্যাস হ'লে B-C-র মধ্যে দূরত্ব 10 একক হবে। এখন CcBb উদ্ভিদের সাথে ccbb উদ্ভিদের ক্রস করে দেখা গেল যে নূতন ধরনের উদ্ভিদের শতকরা হার 50। সুতরাং A, B, C জীনের বিন্যাস হবে C-A-B (চিত্র 150)। সুতরাং ক্রোমোসোমের তিনটা জীনের অবস্থান নির্ণয় করতে হ'লে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার জানা দরকার কিম্বা দুইটা ক্রসিং ওভারের হার ও জীন তিনটার বিন্যাস জানা দরকার।
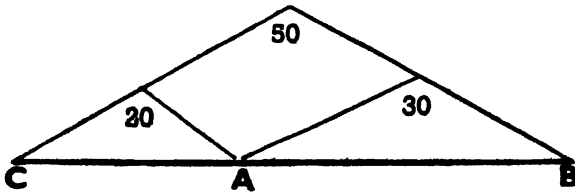
চিত্র 150
ক্রোমোসোমে তিনটা জীনের স্থান নির্ধারণ

Emerson ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণা থেকে ভুট্টার লিঙ্কেজ মানচিত্রের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ভুট্টার চতুর্থ ক্রোমোসোমে শর্করাযুক্ত (su_1) বা স্টার্চযুক্ত (*starchy* Su_1) সস্যের (*endosperm*) নিয়ন্ত্রক জীন, বিশেষভাবে আচ্ছাদিত (*tunicate*) মঞ্জরী (Tu) বা স্বাভাবিক মঞ্জরীর (tu) জীন, চকচকে (*glossy* gl_3) বা স্বাভাবিক (Gl_3) পত্রত্বকের জীন থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে শর্করাযুক্ত ও টিউনিকেট (*tunicate*) জীনের রিকম্বিনেশনের শতকরা হার 29 অর্থাৎ এই দুইটা জীন 29 একক ব্যবধানে আছে। টিউনিকেট ও চকচকে

(*glossy*) জীনের মধ্যে রিকম্বিনেশনের হার 11 অর্থাৎ এই জীন দুইটার মধ্যে দূরত্ব 11 একক। শর্করাযুক্ত (su_1) ও চকচকে (gl_3) জীনের মধ্যে রিকম্বিনেশনের হার 34। সুতরাং এই দুইটা জীনের ব্যবধান 34 একক। তাহলে এই তিনটা জীনের বিন্যাস হ'ল su_1—tu—gl_3 (চিত্র 151)।
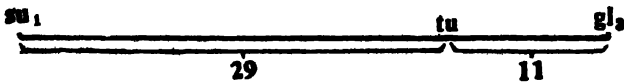
চিত্র 151
ভুট্টার চতুর্থ ক্রোমোসোমে জীন su_1, tu ও gl_3-র অবস্থান দেখান হয়েছে।

su_1—gl_3-র মধ্যে রিকম্বিনেশনের শতকরা হার su_1—Tu এবং Tu—gl_3-র মধ্যে রিকম্বিনেশনের হারের যোগফলের চেয়ে সামান্য কম। এর কারণ হ'ল কোন দুইটা জীন যথেষ্ট দূরত্বে থাকলে তাদের মধ্যে দুইটা ক্রসিং ওভার (*double crossing over*) হতে পারে। su_1—gl_3-র মধ্যে দুইটা ক্রসিং ওভার হ'লে ক্রসিং ওভারের পরেও ঐ দুইটা জীন একই ক্রোমাটিডে থাকে।

অল্প কয়েকটা জীন নিয়ে এই ধরনের মানচিত্র তৈরী করলে ঐ মানচিত্র সবসময় জীনের যথার্থ স্থান নির্দেশ করে না। ক্রসিং ওভার মানচিত্র গঠনের সময় যে জীনগুলি নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে সেগুলি খুব কাছে অবস্থিত হ'লে এই মানচিত্র সঠিক হয়। জীনগুলির মধ্যে ব্যবধান যত বেশী হবে দুইবার ক্রসিং ওভারের সম্ভাবনা ততই বাড়বে। এইজন্য যথেষ্ট ব্যবধানে দুইটা জীন নিয়ে পরীক্ষার থেকে তিনটা জীন নিয়ে পরীক্ষা করলে বেশী নির্ভুল ফল পাওয়ার সম্ভাবনা।

ক্রোমোসোমে জীনের সরলরেখায় অবস্থান (*linear arrangement of genes in a chromosome*)

Roux 1883 খৃষ্টাব্দে ও পরবর্তীকালে Correns ও de Vries জীনের এই ধরনের বিন্যাসের ইঙ্গিত দেন। ড্রসোফিলার X-ক্রোমোসোমের উপর গবেষণা ক'রে Morgan বলেন যে ক্রোমোসোমে জীনগুলি সরলরেখায় অবস্থান করে। এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে জেনেটিক গবেষণালব্ধ প্রমাণ দরকার। Sturtevant 1915 খৃষ্টাব্দে একটা পরীক্ষা

করেন যার সাহায্যে কোন ক্রোমোসোমে তৃতীয় জীনের স্থান ও এর সরলরেখায় অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এই পরীক্ষায় অন্য দুইটা জীনের সাহায্যে তৃতীয় জীনের স্থান নিরূপণ করা হয়। একসাথে তিনটা জীন নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে এই পরীক্ষাকে "তিন-বিন্দু ক্রস" (*three point cross*) বলে।

তিন-বিন্দু-পরীক্ষা বা *three point test*

ধরা যাক, একটা ক্রোমোসোমের তিনটি জীনের বিন্যাস হ'ল abc। হেটারোজাইগাস $\frac{ABc}{abc}$ র সাথে রিসেসিভ (প্রচ্ছন্ন) $\frac{abc}{abc}$ র ক্রস (*cross*) করলে যেসব উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় তা হ'ল—

ক্রসওভারবিহীন শ্রেণী (*non-crossover type*)	$\frac{ABC}{abc}$
একটা ক্রসওভারযুক্ত শ্রেণী (টাইপ 1)	$\frac{Abc}{aBC}$
একটা ক্রসওভারযুক্ত শ্রেণী (টাইপ 2)	$\frac{ABc}{abC}$
দুইটা ক্রসওভারযুক্ত শ্রেণী (*double crossover type*)	$\frac{AbC}{aBc}$

ক্রসওভারবিহীন উদ্ভিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হয়। দুইটা ক্রসওভারযুক্ত উদ্ভিদের সংখ্যা সবচেয়ে কম হয় কারণ একই সাথে দুইটা পাশাপাশি অঞ্চলে ক্রসওভারের সম্ভাবনা ঐ স্থান দুইটার যে কোন একটার ক্রসওভারের সম্ভাবনার চেয়ে কম হয়। যদি a ও b-র মধ্যে ক্রসওভারের সম্ভাবনা $\frac{1}{3}$ ও b ও c-র মধ্যে ক্রসওভারের সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$ হয় তবে a ও c-র মধ্যে দুইটা ক্রসওভারের সম্ভাবনা হ'ল $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ অর্থাৎ $\frac{1}{12}$

ভুট্টার পঞ্চম ক্রোমোসোমের তিনটা লিংকড (*linked*) জীন হ'ল— বাদামী (*broun-bm*) বা সবুজ (*Bm*) মধ্যশিরার নিয়ন্ত্রক জীন; লাল অ্যালিউরোন (*aleurone*) (*pr*) বা লালচে বেগুনী (*purple*) অ্যালিউরোনের (*Pr*) জীন; হালকা হলদে রঙের (*virescent*) চারা

(v) বা সবুজ চারার (V) জীন। Emerson, Beadle ও Fraser ভুট্টার পঞ্চম ক্রোমোসোমের এই জীনগুলি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁরা একটা হেটারোজাইগাস $\frac{Bm\ Pr\ V}{bm\ pr\ v}$ উদ্ভিদের সাথে হোমোজাইগাস রিসেসিভ $\frac{bm\ pr\ v}{bm\ pr\ v}$ উদ্ভিদের ক্রস করেন। এই ক্রসের ফলে সৃষ্ট প্রথম অপত্য বংশের উদ্ভিদগুলি হ'ল—

Bm Pr V	—	232টা	ক্রসওভারবিহীন উদ্ভিদ 42.11%
bm pr v	—	235টা	
Bm pr v	—	84টা	*bm* ও *pr*-এর মধ্যে একটা ক্রসওভারযুক্ত উদ্ভিদ 14.52%
bm Pr V	—	77টা	
Bm Pr v	—	201টা	*pr* ও *v*-র মধ্যে একটা ক্রসওভারযুক্ত উদ্ভিদ 35.62%
bm pr V	—	194টা	
Bm pr V	—	40টা	(ডাবল ক্রসওভার) *bm* ও *pr* এবং *pr* ও *v*-র মধ্যে দুইটা ক্রসওভারযুক্ত উদ্ভিদ 7.75%
bm Pr v	—	46টা	
মোট	—	1109	

যেসব উদ্ভিদ মাতা বা পিতার অনুরূপ তারা ক্রসওভারবিহীন শ্রেণীর। দুইটা ক্রসওভার শ্রেণীর উদ্ভিদে জীন *bm* ও *v*-র স্থান আগের মত থাকলেও জীন *pr* ও *Pr* স্থান বদল করে। এর থেকে জীনের সরলরেখায় অবস্থান প্রমাণিত হয়। অন্য দুই শ্রেণীর উদ্ভিদে যথাক্রমে *bm* ও *pr*-এর মধ্যে এবং *pr* ও *v*-র মধ্যে একটা করে ক্রসিং ওভার হয। এই তিনটা জীনের বিন্যাস হ'ল *bm-pr-v*।

bm ও *pr*-এর মধ্যে ব্যবধান হ'ল ঐ স্থান দুইটার মধ্যে একটা ক্রসওভারের হার ও দুইটা ক্রসওভারের হারের যোগফল অর্থাৎ $14.52 + 7.75$ বা 22.27। একই ভাবে *pr* ও *v*-র মধ্যে দূরত্ব হ'ল $35.62 + 7.75$ বা 43.37।

bm এবং *v*-র মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার হ'ল *bm* ও *pr*-এর মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার *pr* ও *v*-র মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার এবং *bm* ও *v*-র মধ্যে দুইটা ক্রসিং ওভারের (*double crossing over*) হারের যোগফল। অতএব *bm* ও *v*-র মধ্যে ব্যবধান হ'ল $[14.52 + 35.62 + 2(7.75)]$ বা 65.64 (চিত্র 152)।
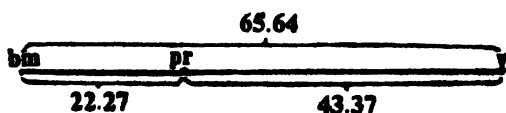
চিত্র 152

উপরের পরীক্ষায় *bm* ও *v*-র মধ্যে দুইটা ক্রসিং ওভারের হার বিবেচনা না করলে এদের মধ্যে দূরত্ব হবে $14.52 + 35.62$ অর্থাৎ 50.14। কিন্তু *bm* থেকে *pr*-এর দূরত্ব 22.27 এবং *pr* থেকে *v*-র ব্যবধান 43.37। তাহলে *bm* থেকে *v*-র দূরত্ব $(bm - pr + pr - v)$ হবে 65.64 কিন্তু সে জায়গায় এই দূরত্ব হচ্ছে মাত্র 50.14। এইজন্য দুইটা ক্রসিং ওভার হার বিবেচনা না করলে ভুল হবার সম্ভাবনা। সুতরাং দুইটা জীনের মধ্যে ব্যবধান নির্ণয় করতে হ'লে মধ্যবর্তী আরেকটা জীন নিয়ে তিন- বিন্দু পরীক্ষা বা *three point test* করা দরকার। এছাড়া কাছাকাছি জীন নিয়ে পরীক্ষা ক'রে ক্রোমোসোম মানচিত্র গঠন করা ভাল।

একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত চারটা বা তার চেয়ে বেশী সংখ্যক জীনের মানচিত্র গঠন

ড্রসোফিলার দ্বিতীয় ক্রোমোসোমে অবস্থিত পাঁচটা জীন নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই জীনগুলি হ'ল— কাল (*black body-b*) বা স্বাভাবিক দেহের (*B*) জীন, লালচে বেগুনী (*purple*) চোখ (*pr*) বা স্বাভাবিক চোখের (*Pr*) জীন, অদৃশ্যপ্রায় (*vestigial*) পাখা (*vg*) বা স্বাভাবিক পাখার (*Vg*) জীন, জালিকাকার (*plexus*) শিরা (*px*) বা স্বাভাবিক শিরার (*Px*) জীন, দাগযুক্ত (*speck*) দেহ (*sp*) বা দাগহীন দেহের (*Sp*) জীন। এইসব জীনগুলির স্থান নির্ধারণ করতে হ'লে তিনটা তিনটা জীন নিয়ে কয়েকটা পরীক্ষা করা দরকার। *pr*, *vg* ও *px* জীন নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে *pr* ও *vg*-র মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার 12.5%; *vg* ও *px*-র মধ্যে ক্রসিং ওভারের হার 33.5% এবং *pr* ও *px*-এর মধ্যে ক্রসিং ওভারের শতকরা হার হ'ল 46। সুতরাং

এই জীন তিনটার বিন্যাস হ'ল *pr-vg-px* কিম্বা *px-vg-pr* (চিত্র 153)।
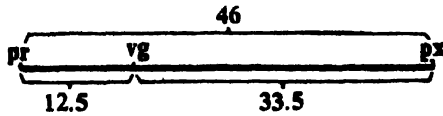
চিত্র 153

ঐ ক্রোমোসোমের অন্য আরেকটা জীন *sp*-র স্থান নির্ণয় করতে হ'লে উপরের পরীক্ষার যে কোন দুইটা জীনের সাথে *sp* জীনের পরীক্ষা করতে হবে। *sp, vg* ও *px* জীন নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা যায় যে *sp* ও *px*-এর মধ্যে ক্রসওভারের হার 6.5% এবং *vg-sp*-র মধ্যে ক্রসওভারের হার 40%। তাহলে ক্রোমোসোম মানচিত্রে *sp* জীনের স্থান চিত্র 154 অনুযায়ী হবে।
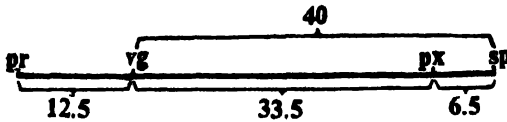
চিত্র 154

এখন জীন *c*-র স্থান নির্ণয় করবার জন্য *pr, sp* ও *c* জীন নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে *pr* ও *c*-র মধ্যে ক্রসওভারের হার 21%। *sp* ও *c*-র মধ্যে 31.5 শতাংশ ক্রসওভার হয়। তাহলে এই মানচিত্রে জীন *c*-র স্থান চিত্র 155 অনুযায়ী হবে।
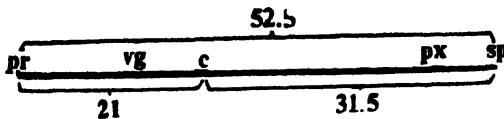
চিত্র 155

নির্বাচিত জীনগুলির (*pr, c, sp*) মধ্যে বেশ ব্যবধান থাকায় এই পরীক্ষা অনুসারে জীন *c*-র অবস্থান যথাযথ কিনা তা নির্ণয় করবার জন্য অন্য দুইটা জীন যেমন *px* ও *vg*-র সাথে জীন *c*-র পরীক্ষা করা যেতে পারে।

ড্রসোফিলার দ্বিতীয় ক্রোমোসোমে অবস্থিত আরেকটা জীন '*b*'র স্থান নিরূপণ করার জন্য *b*, *vg* ও *sp* জীন নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল *b* ও *vg*-র মধ্যে 18.5%, *vg* ও *sp*-এর মধ্যে 40% এবং *b* ও *sp*-র মধ্যে 58.5% ক্রসওভার হয়। আগেই দেখা গেছে যে *vg* ও *sp*-র মধ্যে ব্যবধান হ'ল 40 একক (*unit*)। এই মানচিত্রে জীন *b*-অবস্থান চিত্র 156-এ দেখান হয়েছে।
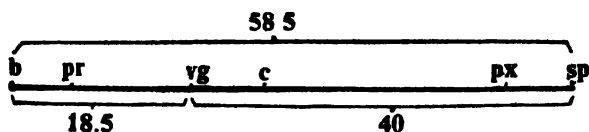
চিত্র 156

b জীন সবচেয়ে বাঁদিকে আছে। ঐ স্থানটিকে O ধরা হ'লে পরপর জীনগুলি নির্দিষ্ট দূরত্বে সাজান যায়। তবে ড্রসোফিলার দ্বিতীয় ক্রোমোসোমে ছয়টার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক জীন থাকে। নূতন জীনের স্থান নির্ণীত হ'লে ঐ জীনের জন্য ক্রোমোসোমের মানচিত্রের একটু রদবদল করতে হয়। *Drosophila*-র দ্বিতীয় ক্রোমোসোমে জীন *b*-র বাঁদিকে আরও অনেক জীন আছে। *Drosophila*-র বিভিন্ন ক্রোমোসোমের মানচিত্র চিত্র 157-এ দেখান হয়েছে।

একই ভাবে বিভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোসোমের মানচিত্র গঠন করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে ভুট্টার দশটা ক্রোমোসোমের মানচিত্র গঠন করা হয়েছে (চিত্র 158A, B)।

সাইটোলজিয় মানচিত্র

সাইটোলজিয় পদ্ধতিতে মানচিত্র গঠন করার সময় ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা যেমন ডীলীশন (ঘাটতি), ট্র্যান্সলোকেশন, ইনভারশন ইত্যাদির ব্যবহার করা হয়। এখানে মেটাফেজ অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলির উপর গবেষণা করা হয় বলে এই উপায়ে নির্মিত মানচিত্রকে অনেক সময় মেটাফেজ ক্রোমোসোমের মানচিত্র বলা হয়। কেবল লিঙ্কেজ মানচিত্র থেকে কোন ক্রোমোসোমে কোন লিঙ্কেজ গ্রুপ অবস্থিত তা বলা যায় না। তবে কখনও কখনও লিঙ্কেজ গ্রুপের আয়তন ও ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য থেকে কিছুটা ধারণা করা যায়। সাইটোলজিয় মানচিত্র গঠনের সময় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্রোমোসোমের পরীক্ষার সাথে সাথে লিঙ্কেজ
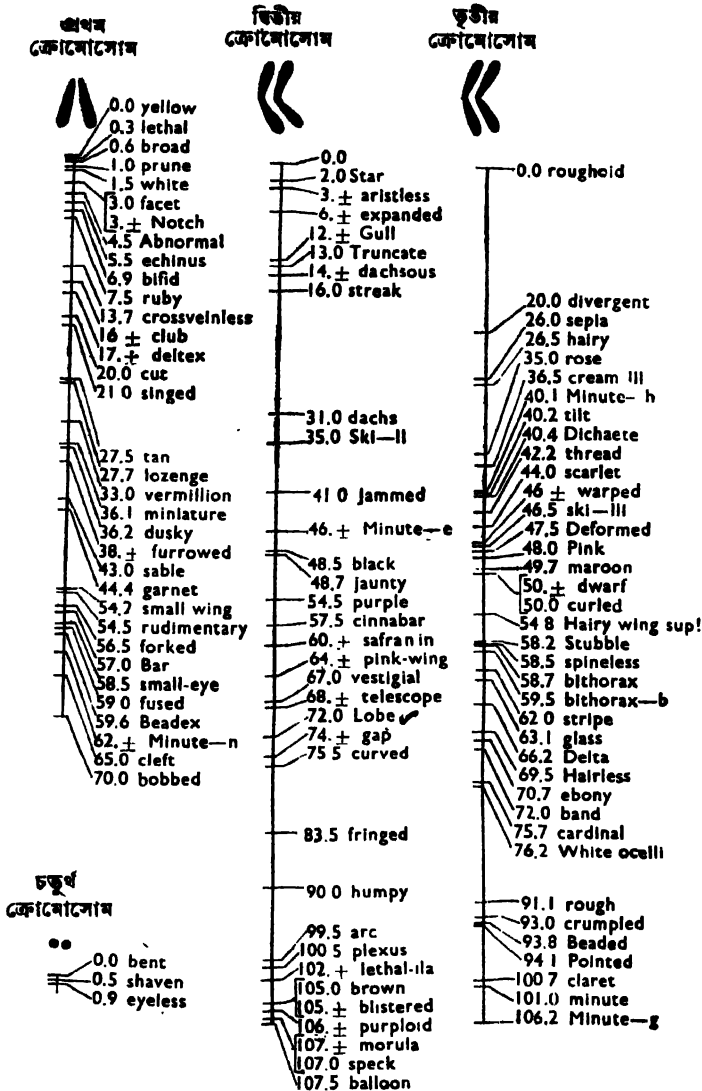
চিত্র 157

Drosophila melanogaster-এর জেনেটিক মানচিত্র। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জীনের অবস্থান দেখান হয়েছে।
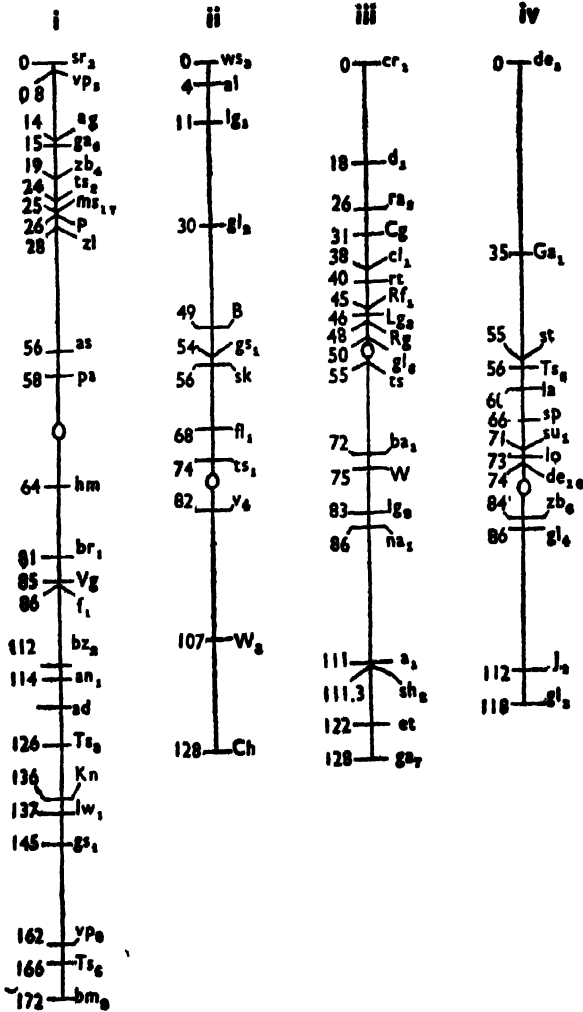
চিত্র 158A

ভুট্টার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ক্রোমোসোমের জেনেটিক মানচিত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জীনের অবস্থান দেখান হয়েছে।
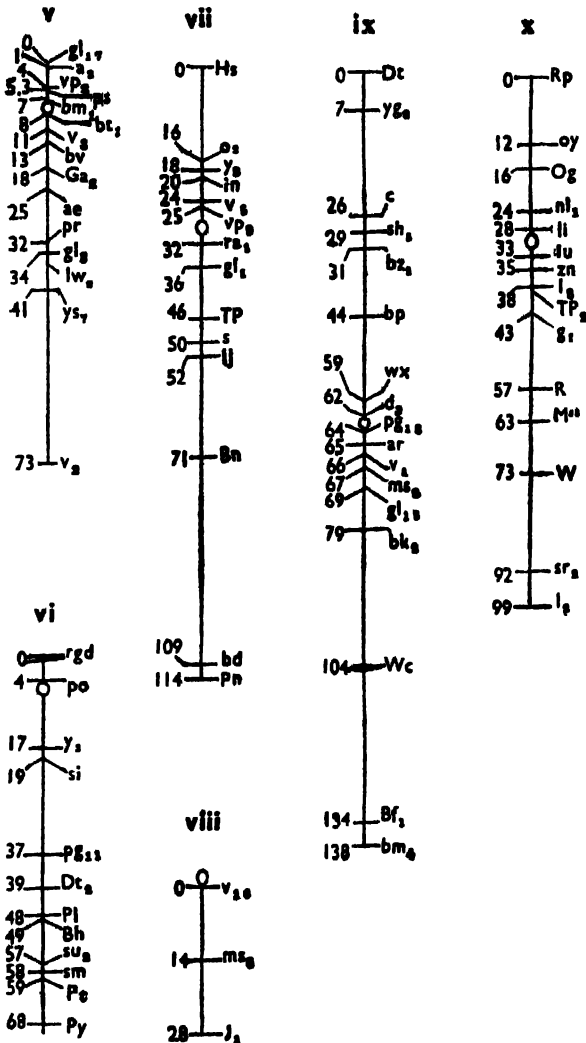
চিত্র 158B

ভুট্টার পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম ক্রোমোসোমের জেনেটিক মানচিত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জীনের অবস্থান দেখান হয়েছে।

জায়গায় ক্রোমোসোমটা ভেঙ্গেছে তা নির্ণয় করা যায়। মেটাফেজ অবস্থায় ট্র্যান্সলোকেশনযুক্ত ক্রোমোসোম পরীক্ষা ক'রে ক্রোমোসোমের কোন অংশটা ভেঙ্গেছে তা লক্ষ্য করা হয়। জেনেটিক এবং সাইটোলজিয় পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোসোমে জীনগুলির যথাযথ অবস্থান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

ড্রসোফিলায় কোন লিঙ্কেজ গ্রুপ কোন ক্রোমোসোমে অবস্থিত তা ট্র্যান্সলোকেশনের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়েছে। Dobzhansky ড্রসোফিলার তৃতীয় ক্রোমোসোমের একটা অংশ X-ক্রোমোসোমের সাথে যুক্ত
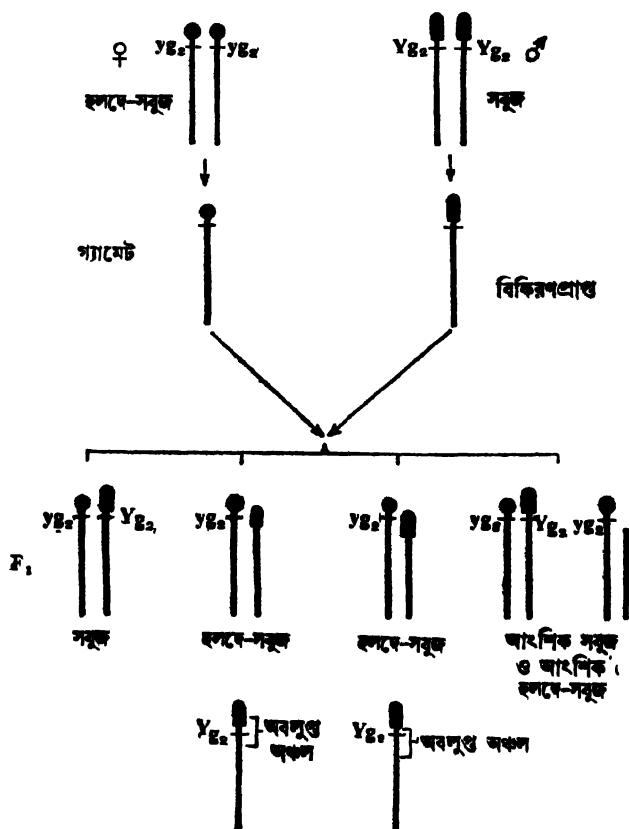
চিত্র 160

ভুট্টায় ডীলীশনের মাধ্যমে জীনের স্থান নির্ণয়ের চিত্র।

অবস্থায় পেয়েছিলেন। তৃতীয় ক্রোমোসোমটা ড্রসোফিলার ক্রোমোসোমগুলির মধ্যে সবচেয়ে লম্বা। ট্র্যান্সলোকেশনের ফলে কোন জীনগুলি লিঙ্কেজ গ্রুপ পরিবর্তন করছে তার থেকে Dobzhansky তৃতীয় ক্রোমোসোমের যথাযথ লিঙ্কেজ গ্রুপ নির্ণয় করেছিলেন। একই ভাবে ট্র্যান্সলোকেশনের সাহায্যে তিনি ড্রসোফিলার দ্বিতীয় ক্রোমোসোমের লিঙ্কেজ গ্রুপ নিরূপণ করেছিলেন। Stern-ও ট্র্যান্সলোকেশনের সাহায্যে ড্রসোফিলায় জীনের স্থান নির্ধারণ করেছিলেন। অনেকগুলি ট্র্যান্সলোকেশনের সাহায্যে কোন একটা ক্রোমোসোমে বিভিন্ন জীনের স্থান প্রায় নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

ইনভারশনের সাহায্যে জীনের স্থান নির্ণয়

ড্রসোফিলায় ইনভারশনের সাহায্যে জীনের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। ইনভারশন হেটারোজাইগোটে ইনভারশন অঞ্চলের মধ্যে সাধারণতঃ ক্রসিং ওভার হয় না কিন্তু ঐ অঞ্চলের বাইরে ক্রসিং ওভার হয়। এইজন্য লিঙ্কেজ পরীক্ষা থেকে কোন নির্দিষ্ট জীন ইনভারশন অঞ্চলের মধ্যে কিম্বা ঐ অঞ্চলের ডান বা বাঁদিকে অবস্থিত তা বোঝা যায়। ইনভারশন হেটারোজাইগোটে ইনভারশন লুপ গঠিত হয়। অনেক সময় একই ক্রোমোসোমে দুইটা ইনভারশনে আংশিকভাবে ক্রোমোসোমের একই অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত থাকে অর্থাৎ abcdefg ক্রোমোসোমে প্রথম ইনভারশন bcd অঞ্চলে ও দ্বিতীয় ইনভারশন bef অঞ্চলে হতে পারে। এর ফলে জীন bটা উভয় ইনভারশনেই (চিত্র 161) অন্তর্ভুক্ত থাকে।
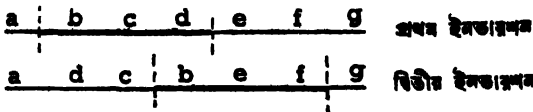
চিত্র 161
ইনভারশনের সাহায্যে জীনের স্থান নির্ণয়ের চিত্র।

এখানে জীন e প্রথম ইনভারশনের ডানদিকে ও দ্বিতীয় ইনভারশনের মধ্যে থাকে। এইভাবে প্রথম ইনভারশনের ডানদিকে এবং দ্বিতীয় ইনভারশনের মধ্যে কোন জীনের (যেমন জীন e) স্থান নির্ণয় করা যায়। দ্বিতীয় ইনভারশনের বাঁদিকে এবং প্রথম ইনভারশনের মধ্যে (জীন c) কোন জীনের স্থান একই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়।

Drosophila-র স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোম থেকে সাইটোলজিয় মানচিত্র গঠন করা যায়। কোন জীনের স্থান নির্ণয় করবার জন্য স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের স্বাভাবিক ক্রোমোসোমের মানচিত্রের সাথে অস্বাভাবিক ক্রোমোসোমযুক্ত মানচিত্রের তুলনা করা হয়। কোন ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিকতার (যেমন ট্র্যান্সলোকেশন, ইনভারশন কিম্বা ডীলীশন) ফলে ফেনোটাইপের কি পরিবর্তন হয়েছে তা লক্ষ্য করা হয়। এর পর ঐ স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের কোন ব্যান্ড পরিবর্তিত হয়েছে তার থেকে কোন জীন ঐ স্থানে অবস্থিত তা নির্ণয় করা যায়। ক্রোমোসোমের মাঝখানের কোন অংশ বাদ গেলে (*deletion*) ঐ ক্রোমোসোমটা যখন হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের সাথে যুগ্ম অবস্থান করে তখন স্বাভাবিক সদস্যের যে অংশটা অবলুপ্ত অংশের অনুরূপ সেটা পাশের দিকে একটা লুপ (*loop*) বা ফাঁস গঠন করে। সাদা চোখের জীন 'w'-র অবস্থান চিত্র 159 অনুসারে ডীলীশনের মাধ্যমে সহজেই নির্ধারণ করা যায়। লিঙ্কেজ পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে কোন জীন অবলুপ্ত (*deleted*) অংশে অবস্থিত তা বোঝা যায়।

ভুট্টার পরাগরেণু মাতৃকোষের প্যাকিটিন অবস্থায় ক্রোমোসোমগুলি খুব সম্প্রসারিত থাকে। এইসময় ক্রোমোসোমগুলির সূক্ষ্ম গঠন দেখা যায়। প্যাকিটিনে ক্রোমোসোমগুলি যুগ্ম অবস্থায় থাকে বলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলির সব অংশের তুলনা করা যায়।

কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর ক্রোমোসোমের জেনেটিক মানচিত্রের সাথে সাইটোলজিয় মানচিত্রের তুলনা করলে দেখা যায় যে দুইটা মানচিত্রে জীনের বিন্যাস একই রকম হলেও এই দুই মানচিত্রের বিভিন্ন জীনের ব্যবধানের মধ্যে পার্থক্য (চিত্র 162) হয়। সাইটোলজিয় মানচিত্রে সেন্ট্রোমিয়ারের কাছের অঞ্চলে জীনের অবস্থান লিঙ্কেজ (জেনেটিক) মানচিত্রের তুলনায় অনেক দূরে দূরে থাকে। Dobzhansky ড্রসোফিলার বিভিন্ন ক্রোমোসোমের সাইটোলজিয় ও জেনেটিক মানচিত্রের মধ্যে এইরকমের তফাৎ (চিত্র 163) দেখতে পেয়েছিলেন। কোন ক্রোমোসোমের বাহুর মাঝামাঝি জায়গার জীনগুলি সাইটোলজিয় মানচিত্রের তুলনায় জেনেটিক মানচিত্রে বেশী ব্যবধানে থাকে। দুই মানচিত্রের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ হ'ল যে ক্রোমোসোমের সব অংশে সমান ক্রসিং ওভার হয় এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই লিঙ্কেজ মানচিত্র (*linkage map*) গঠন করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে ক্রোমোসোমের সব অঞ্চলে একই হারে ক্রসিং ওভার হয় না। ক্রোমোসোমের কোন স্থানে ক্রসিং ওভারের হার খুব বেশী হ'লে ঐ জায়গার লিঙ্কেজ মানচিত্র অতিরিক্ত দীর্ঘ হবে। আবার ক্রোমোসোমের কোন
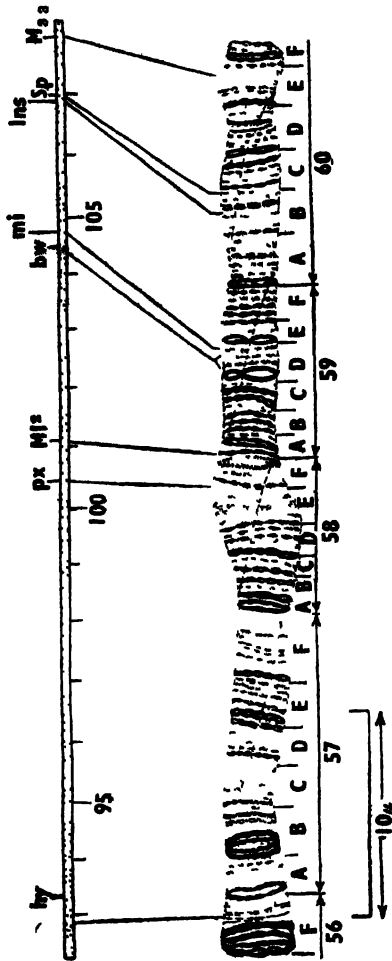
চিত্র 162
Drosophila melanogaster-এর দ্বিতীয় ক্রোমোসোমের ডান বাহুর প্রান্তের জেনেটিক মানচিত্রের সাথে স্যালিভারী গ্ল্যান্ড ক্রোমোসোমের মানচিত্রের তুলনা।

জায়গায় ক্রসিং ওভারের হার খুব কম হ'লে কিম্বা ক্রসিং ওভার না হ'লে ঐ অঞ্চলের লিঙ্কেজ মানচিত্র খুব ছোট হবে।
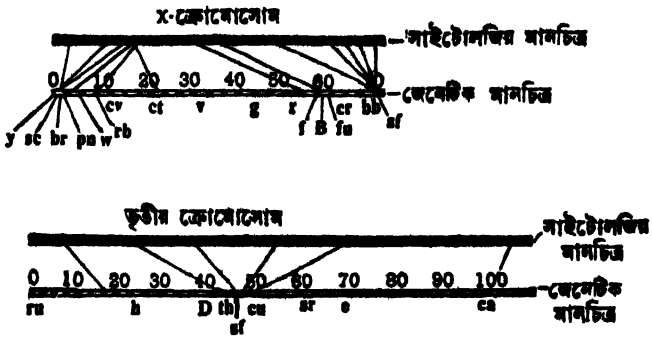
চিত্র 163
Drosophila melanogaster-এর জেনেটিক ও সাইটোলজিয় মানচিত্রের তুলনা।

এইজন্য ক্রোমোসোমের সঠিক মানচিত্র গঠন করতে হ'লে জেনেটিক ও সাইটোলজিয় উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা উচিত।

পরিভাষা

aberration—ত্রুটি, অস্বাভাবিকতা
acentric—সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন
achromatic—বর্ণহীন
acidic—অম্লধর্মী, আম্লিক
activator—সক্রিয়কারী
agametic complex—অ্যাগ্যামির গোষ্ঠী
algae—শৈবাল
alkaloid—উপক্ষার
alternation of generations—জনুঃক্রম
analyser—বিশ্লেষক
angiosperm—গুপ্তবীজী উদ্ভিদ
anther—পরাগধানী
antipodal cell—প্রতিপাদ কোষ
aperture—রন্ধ্র, ছিদ্র
aqueous—জলীয়
arm—বাহু
asexual reproduction—অযৌন জনন
auxochrome—অক্সোক্রোম, বর্ণকারী অংশ
balanced gamete—সুষম বা সমতা-যুক্ত গ্যামেট
basic—ক্ষারধর্মী, বেসিক
basic number—মূল সংখ্যা, বেসিক সংখ্যা
bright field microscope—দৃশ্যমান আলোক ব্যবহৃত অনুবীক্ষণ যন্ত্র, উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র
budding—মুকুলোদ্গম, বাডিং
by-product—উপজাত
carbohydrate—শর্করা, কার্বোহাইড্রেট
cell—কোষ
cell division—কোষ বিভাগ
cell plate—কোষ পর্দা
cell sap—কোষ রস
chalaza—ডিম্বক মূল
chromatic aberration—বর্ণগত ত্রুটি
chromatid bridge—ক্রোমাটিড সেতু
chromatin—ক্রোমাটিন
chromatophore—ক্রোমাটোফোর, বর্ণযুক্ত অংশ
chromosomal theory—ক্রোমোসোমীয় মতবাদ
chromosome—ক্রোমোসোম
circulation—আবর্তন গতি
class—শ্রেণী
classification—শ্রেণীবিভাগ
coil—কুণ্ডল, পেঁচ
coiled—কুণ্ডলিত, পেঁচান
coiling—কুণ্ডলীকরণ
coincidence—সমস্থানিকতা
compound microscope—যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র
condensed—ঘনীভূত
condenser—কনডেন্সার, আলোক কেন্দ্রীভূতকারী লেন্স
corolla—দলমণ্ডল
cotyledon—বীজপত্র
crossing-over—ক্রসিং ওভার
crystal—কেলাস
cylindrical—বেলনাকার
cytogenetics—কোষ-জীনতত্ত্ব, সাইটোজেনেটিক্স
cytokinesis—সাইটোপ্লাজমের বিভাগ
cytology—কোষতত্ত্ব, সাইটোলজি
dark field microscope—অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র

daughter cell—অপত্য কোষ
deficiency—ঘাটতি
dehydrate—জলহীন করা
despiralization—বিকুণ্ডলীকরণ
development—পরিণতি
dicentric—দ্বিসেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত
differential—পার্থক্যমূলক
diffused centromere—পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার
displaced duplication—স্থানান্তরিত দ্বিগুণতা
distilled—পরিশুদ্ধ
distortion—বিকৃতি
dividing—বিভাজনশীল
dominant—প্রবল
dormant—সুপ্ত
double fertilization—দ্বি-নিষেক
duplication—দ্বিগুণতা
ecology—বাস্তু সংস্থান
egg—ডিম্বাণু
elastic—স্থিতিস্থাপক
elemination—বর্জন
embed—নিহিত করা
embryo—ভ্রূণ
embryology—ভ্রূণতত্ত্ব
embryo sac—ভ্রূণস্থলী
endosperm—সস্য
enlarge—বিবর্ধন
enlarged—বিবর্ধিত
equational division—সমবিভাগ
equator—নিরক্ষ রেখা
evolution—বিবর্তন, ক্রমবিকাশ
excretory substance—বর্জ্য পদার্থ
extract—নির্যাস
family—গোত্র
fat—স্নেহপদার্থ
fertilization—নিষেক, ফার্টিলাইজেশন
fertilized—নিষিক্ত
fibre—তন্তু, আঁশ
filter—পরিস্রুত
fixation—স্থায়ীকরণ, ফিক্সেশন
flowering plant—সপুষ্পক উদ্ভিদ
fluorescent—প্রতিপ্রভ
free nuclear stage—মুক্ত নিউক্লীয় অবস্থা
fungus—ছত্রাক
fusion—মিলন, সংযোগ
gametophyte—লিঙ্গধর উদ্ভিদ
generation - বংশ
generative cell—জনন কোষ
generative nucleus—জনন নিউক্লীয়াস
genetics—জীনতত্ত্ব
gland—গ্রন্থি
granule—দানা
guard cell—রক্ষী কোষ
gymnosperm—ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ
herb—বীরুৎ
hereditary—বংশগত
heredity—বংশধারা
homologous—হোমোলোগাস, অনুরূপ, সমসংস্থ
hybrid—সংকর
hybridization—সংকরণ
image—প্রতিবিম্ব
included inversion—অন্তর্ভুক্ত ইনভারশন
infra red ray—অতি লোহিত রশ্মি
inheritance—উত্তরাধিকার
inorganic—অজৈব
insoluble—অদ্রবনীয়
integument—ডিম্বকত্বক
intercalary—মধ্যবর্তী

interference—প্রতিবন্ধক
interzonal fibre—মধ্যাঞ্চলের তন্তু
irretability—উত্তেজনা
kinetic energy—গতি শক্তি
lagging—মন্থর গতিশীলতা, ল্যাগিং
lethal—প্রাণনাশক
life cycle—জীবন চক্র
linkage—লিঙ্কেজ, সংযুক্ততা
linked—লিংকড, সংযুক্ত
localized—স্থানিক
magnify—বিবর্ধিত করা
magnifying glass—আতস কাঁচ
major coil—মুখ্য কুণ্ডল
map unit—মানচিত্রের একক
maternal inheritance—মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার
medium—মাধ্যম
megaspore—স্ত্রীরেণু, ডিম্বক
membrane—পর্দা
meristematic cell—ভাজক কোষ
meristematic tissue—ভাজক কলা
messenger R.N.A. (m-RNA)—বার্তাবহ আর. এন. এ.
micropyle—ডিম্বক রন্ধ্র
microscope—অণুবীক্ষণ যন্ত্র
middle lamella—মধ্য পর্দা
minor coil—গৌন কুণ্ডল, মাইনর কয়েল
mis-copy—ভ্রান্ত প্রতিলিপি
mis-division—ভ্রান্ত বিভাগ, অপবিভাগ
molecular weight—আনবিক ওজন
molecule—অণু
mother cell—মাতৃকোষ
movement—সঞ্চলন, চলন
multicellular—বহুকোষী
negative (-)—ঋণাত্মক
non-cross-over type—ক্রসওভার-বিহীন শ্রেণী
non-disjunction—ননডিসজাংশন, অপৃথকতা
nucellus—ভ্রূণ পোষক
nuclear membrane—নিউক্লীও পর্দা
nuclear reticulum—নিউক্লীও জালিকা
nucleolar organizer—নিউক্লীওলাস গঠনকারী অঞ্চল
nucleolus—নিউক্লীওলাস
nucleus—নিউক্লীয়াস
organic—জৈব
overlapping inversion—উপরিপন্ন ইনভারশন
ovule—ডিম্বক
oxidation—জারণ
paraffin block—মোম খণ্ড
pericarp—ফলত্বক
photosynthesis—সালোকসংশ্লেষ
physiology—শরীরতত্ত্ব
polarized—মেরু অভিমুখী
polarizer—মেরু অভিমুখীকারক
pole—মেরু
pollen—পরাগরেণু
pollination—পরাগযোগ
polycentric—বহুসেণ্ট্রোমিয়ারযুক্ত
positive (+)—ধনাত্মক
preserve—সংরক্ষণ
primary cell wall—প্রাথমিক কোষ প্রাচীর
pro-centric—প্রাক্-কেন্দ্রীয়
process—প্রক্রিয়া
pro-terminal—প্রাক্-প্রান্তীয়
radiation—বিকিরণ
radioactive—তেজস্ক্রিয়
reaction—বিক্রিয়া

recessive—প্রচ্ছন্ন, রিসেসিভ
recombination—রিকমবিনেশন, জীনের নূতন সংযোগ
reduction division—সংখ্যা হ্রাসকারী বিভাগ
refract—প্রতিসরিত
refractive index—প্রতিসরাঙ্ক
relic coil—স্মারক কুণ্ডল
reproduction—জনন
reproductive cell—জনন কোষ
residual protein—অবশিষ্ট প্রোটীন
resolving power—বিশ্লেষণ ক্ষমতা
resting stage—বিশ্রাম অবস্থা
ribose-nucleic acid (R. N. A)—রাইবোজ নিউক্লীক অ্যাসিড (আর. এন. এ.)
ribosomal R. N. A (r-RNA)—রাইবোসোমীয় আর. এন. এ.
ring—বলয়াকার
rotation—প্রবাহগতি
saturated—সংপৃক্ত
secretion—ক্ষরণ
secretory substance—ক্ষরিত পদার্থ
section—ছেদ
sectioning—সেকশন কাটা, ছেদন
seed coat—বীজত্বক
segmental allopolyploid—আংশিক অ্যালোপলিপ্লয়েড
self-duplication—স্ব-দ্বিগুণতা
self-reproducing—স্ব-জননশীল
semi-conservative—আংশিক রক্ষণশীল
semi-permeable—আংশিক ভেদ্য
sensitive—সংবেদনা
sexual reproduction—যৌন জনন
solution—দ্রবণ
somatic cell—দেহ কোষ
species—প্রজাতি
specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব
sperm—শুক্রাণু
spore—রেণু
sporophyte – রেণুধর উদ্ভিদ
stain—রঞ্জক পদার্থ, বর্ণ
staining—রঞ্জিতকরণ
stigma—গর্ভমুণ্ড
stomata—পত্ররন্ধ্র
supporting fibre—সহযোগী তন্তু
synapsis—সাইন্যাপসিস, যুগ্মতা
synergid—সাইনারজিড, সহকারী কোষ
taxonomy—শ্রেণীতত্ত্ব, ট্যাক্সোনমী
terminalization—প্রান্তিকরণ
theory—মতবাদ
tissue—টিসু, কলা
tractile fibre—আকর্ষ তন্তু
transfer R N A (t-RNA)—পরিবহক আর. এন. এ.
transformation—রূপান্তর
translocation—ট্র্যান্সলোকেশন (স্থান বদল)
tube nucleus—নালী নিউক্লীয়াস
turgour—রস স্ফীতি
ultra violet ray—অতি বেগুণী রশ্মি
unbalanced gamete—সমতাবিহীন গ্যামেট
unicellular—এককোষী
unit—একক
variability—বিভিন্নতা, প্রকরণ
vegetative—অঙ্গজ
vegetative reproduction—অঙ্গজ জনন
wave length—তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
x-ray—রঞ্জন রশ্মি

অঙ্গজ—vegetative
অঙ্গজ জনন—vegetative reproduction
অজৈব—inorganic
অণু—molecule
অণুবীক্ষণ যন্ত্র—microscope
অতি বেগুণী রশ্মি—ultra violet ray
অতি লোহিত রশ্মি—infra red ray
অদ্রবণীয়—insoluble
অন্তর্ভুক্ত ইনভারশন—included inversion
অন্ধকার ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র—dark field microscope
অপত্য কোষ—daughter cell
অপবিভাগ—mis-division
অপৃথকতা—non-disjunction
অবশিষ্ট প্রোটিন—residual protein
অম্লধর্মী—acidic
অযৌন জনন—asexual reproduction
আংশিক অ্যালোপলিপ্লয়েড—segmental allopolyploid
আংশিক ভেদ্য—semipermeable
আকর্ষ তন্তু—tractile fibre
আতস কাঁচ—magnifying glass
আনবিক ওজন—molecular weight
আপেক্ষিক গুরুত্ব—specific gravity
আবর্তন গতি—circulation
আলোক কেন্দ্রীভূতকারী লেন্স—condenser
আঁশ—fibre
উজ্জ্বল ক্ষেত্রযুক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র—bright field microscope
উত্তরাধিকার—inheritance
উপক্ষার—alkaloid
উপজাত—by-product
উপরিশায়ী ইনভারশন—overlapping inversion
ঋণাত্মক বিদ্যুৎ—negative charge
একক—unit
এককোষী—unicellular
কলা—tissue
কুণ্ডল—coil
কুণ্ডলিত—coiled
কুণ্ডলীকরণ—coiling
কেলাস—crystal
কোষ—cell
কোষ-জীনতত্ত্ব—cytogenetics
কোষ-পর্দা—cell plate
কোষ-বিভাগ—cell division
কোষ-রস—cell sap
ক্রমবিকাশ—evolution
ক্রসওভার শ্রেণী—crossover type
ক্রসওভারবিহীন শ্রেণী—non-crossover type
ক্রসিং ওভার—crossing-over
ক্রোমাটিড সেতু—chromatid bridge
ক্রোমোসোমীয় মতবাদ—chromosomal theory
ক্ষরণ—secretion
ক্ষরিত পদার্থ—secretory substance
ক্ষারধর্মী—basic, alkaline
গর্ভমুণ্ড—stigma
গোত্র—family
গৌন কুণ্ডল—minor coil
গুপ্তবীজী উদ্ভিদ—angiosperm
গ্রন্থি—gland
ঘনীভূত—condensed
ঘাটতি—deficiency
চলন—movement
ছত্রাক—fungus
জনন—reproduction

জনন কোষ—generative cell
জনন নিউক্লীয়াস—generative nucleus
জনুক্রম—alternation of generations
জলীয়—aqueous
জারণ—oxidation
জীনতত্ত্ব—genetics
জীবন চক্র—life cycle
জৈব—organic
ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লীক অ্যাসিড } deoxyribose nucleic acid (D.N.A.)
ডিম্বক—ovule
ডিম্বক ত্বক—integument
ডিম্বক মূল—chalaza
ডিম্বক রন্ধ্র—micropyle
ডিম্বাণু—egg
তন্তু—fibre
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য—wave length
তেজস্ক্রিয়—radioactive
দলমণ্ডল—corolla
দানা—granule
দেহ কোষ—somatic cell
দ্বিগুণতা—duplication
দ্বি-নিষেক—double fertilization
দ্বিসেণ্ট্রোমিয়ারযুক্ত—dicentric
দ্রবণ—solution
ধনাত্মক বিদ্যুৎ—positive charge
নালী নিউক্লীয়াস—tube nucleus
নিউক্লীও জালিকা—nuclear reticulum
নিউক্লীও পর্দা—nuclear membrane
নিউক্লীওলাস গঠনকারী অঞ্চল—nucleolar organizer
নির্য্যাস—extract
নিরক্ষরেখা—equator
নিষিক্ত—fertilized
নিষেক—fertilization
পত্ররন্ধ্র – stomata
পর্দা—membrane
পরাগধানী—anther
পরাগযোগ—pollination
পরাগরেণু—pollen
পরিপূরক—complementary
পরিবহক আর. এন. এ.—transfer R. N. A.
পরিব্যাপ্ত সেণ্ট্রোমিয়ার—diffused centromere
পরিশুদ্ধ—distilled
পরিস্রুত—filtered
পার্থক্যমূলক—differential
পেঁচ—coil
পেঁচান—coiled
প্রক্রিয়া—process
প্রচ্ছন্ন—recessive
প্রজাতি—species
প্রতিপাদ কোষ—antipodal cell
প্রতিপ্রভ—fluorescent
প্রতিপ্রভা—fluorescence
প্রতিবন্ধক—interference
প্রতিবিম্ব—image
প্রতিসরাঙ্ক—refractive index
প্রতিসরিত—refract
প্রবল—dominant
প্রবাহগতি—rotation
প্রাক-কেন্দ্রীয়—pro-centric
প্রাক-প্রান্তীয়—pro-terminal
প্রাণনাশক মিউটেশন lethal mutation
প্রাথমিক কোষ প্রাচীর primary cell wall
প্রান্তীয় terminal
ফলত্বক pericarp

বংশ generation
বংশগত hereditary
বংশধারা heredity
বর্জন elemination
বর্জ্য পদার্থ excretory substance
বর্ণগত ত্রুটি chromatic aberration
বলয়াকার ring
বহুকোষী multicellular
বহুসেণ্ট্রোমিয়ারযুক্ত polycentric
বার্তাবহ আর. এন. এ. messenger R. N. A.
বাস্তু সংস্থান ecology
বাহু arm
বিকিরণ radiation
বিক্রিয়া reaction
বিকুণ্ডলীকরণ despiralization
বিবর্তন evolution
বিবর্ধন enlarge, magnify
বিবর্ধিত enlarged, magnified
বিভাজনশীল dividing
বিভিন্নতা variation
বিশ্রাম অবস্থা resting stage
বিশ্লেষক analyzer
বিশ্লেষণ ক্ষমতা resolving power
বীজত্বক seed coat
বীজপত্র cotyledon
বীরুৎ herb
বেলনাকার cylindrical
ভাজক কলা meristematic tissue
ভাজক কোষ meristematic cell
ভ্রান্ত প্রতিলিপি mis-copy
ভ্রান্ত বিভাগ mis-division
ভ্রূণ embryo
ভ্রূণতত্ত্ব embryology
ভ্রূণপোষক nucellus
ভ্রূণস্থলী embryo sac
মতবাদ theory
মধ্যপর্দা middle lamella
মধ্যবর্তী intercalary
মধ্যাঞ্চলের তন্তু interzonal fibre
মন্থরগতিশীলতা lagging
মাতৃকোষ mother cell
মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার maternal inheritance
মাধ্যম medium
মানচিত্রের একক map unit
মুকুলোদ্গম budding
মুক্ত নিউক্লীয় অবস্থা free nuclear stage
মুখ্য কুণ্ডল major coil
মূল সংখ্যা basic number
মেরু pole
মেরু অভিমুখী polarized
মেরু অভিমুখীকারক polarizer
মোমখণ্ড paraffin block
যুগ্মতা synapsis
যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র compound microscope
যৌন জনন sexual reproduction
রক্ষী কোষ guard cell
রঞ্জক পদার্থ stain
রঞ্জন রশ্মি x-ray
রঞ্জিতকরণ staining
রন্ধ্র aperture
রসস্ফীতি turgour
রাইবোজ নিউক্লীক অ্যাসিড ribose nucleic acid
রাইবোসোমীয় আর-এন-এ ribosomal R. N. A.
রূপান্তর transformation
রেণু spore
রেণুধর উদ্ভিদ sporophyte

লিঙ্গধর উদ্ভিদ gametophyte
শর্করা carbohydrate
শরীরতত্ত্ব physiology
শুক্রাণু sperm, antherozoid
শ্রেণী class
শ্রেণীতত্ত্ব taxonomy
শ্রেণী বিভাগ classification
শৈবাল algae
সংকর hybrid
সংকরণ hybridization
সংপৃক্ত saturated
সংবেদনশীল sensitive
সংযুক্ত linked
সংযুক্ততা linkage
সংযোগ fusion
সংরক্ষণ preserve
সক্রিয়কারী activator
সঞ্চলন movement
সপুষ্পক উদ্ভিদ flowering plant
সমতাবিহীন গ্যামেট unbalanced gamete
সমবিভাগ equational division
সমস্থানিকতা coincidence
সস্য endosperm
সহকারী কোষ synergid
সহযোগী তন্তু supporting fibre
সাইটোপ্লাজমের বিভাগ cytokinesis
সুপ্ত dormant
সুষম গ্যামেট balanced gamete
সেণ্ট্রোমিয়ারবিহীন acentric
স্ত্রীরেণু megaspore
স্থানান্তরিত দ্বিগুণতা displaced duplication
স্থানিক localized
স্থায়ীকরণ fixation
স্থিতিস্থাপক elastic
স্নেহ পদার্থ fat
স্ব-দ্বিগুণতা self duplication
স্মারক কুণ্ডল relic coil

বিষয় সূচী